স্বামী অখণ্ডানন্দকে যেরূপ দেখিয়াছি

সংকলক

স্বামী চেতনানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলিকাতা

ঌ প্রকাশকের নিবেদন ঌ

অবতারবরিষ্ঠ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে নানাভাবে ভক্তজনকে কৃপা করেছেন। তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন অসাধারণ সব সর্বত্যাগী সন্তানদের। যারা নিজেরাই মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির সাড়া জাগানো ইতিহাস তৈরিতে সক্ষম। এইরকম একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। স্বামীজীর 'গ্যাঞ্জেস' বলে পরিচিত এই প্রেমিক পুরুষই সর্বপ্রথম "শিবজ্ঞানে জীবসেবার" বাস্তব রূপায়ণের পথিকৃৎ হিসাবে রামকৃষ্ণ লোকে চির অমর হয়ে আছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম প্রকাশ্য সেবাকার্যের কাণ্ডারী হয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসিসঙ্ঘের কাছে তো তিনি এক আলোকবর্তিকা। বর্তমানে প্রায় সমস্ত সাধুসমাজ ও সম্প্রদায় দ্বিধাহীনকণ্ঠে এই সেবাকার্যের নিশান স্বহস্তে গ্রহণ করে সেই ঐতিহাসিক কর্মবীরকেই প্রকারান্তরে সম্মান জানাচ্ছে।

সেই সত্যনিষ্ঠ প্রেমিকপুরুষের জীবনগাথার এক অপূর্ব সম্ভার সাজিয়েছেন আমেরিকার সেন্ট লুই বেদান্ত সোসাইটির স্বামী চেতনানন্দ। বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তক থেকে সংকলিত করে এক অভূতপূর্ব লীলাকথা তিনি পাঠকবর্গকে উপহার দিয়েছেন। এইজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। রামকৃষ্ণভাবানুরাগীরা এই মহৎজীবন কথা পড়ে বিন্দুমাত্র উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

ভূমিকা

মহাপুরুষদের জীবন ও কার্যাবলী নিয়ে গঠিত হয় মানবজাতির ইতিহাস। কেউ নিজেই নিজের জীবনকাহিনী লেখেন, কেউ বা বিভিন্ন সময়ে অপরের কাছে ঐ সব কথা ব্যক্ত করেন এবং তারা লিপিবদ্ধ করেন। এই সব কথা জড়ো করে রচিত হয় ঐ ব্যক্তির ইতিবৃত্ত। স্বামী অখণ্ডানন্দ নিজে তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের স্মৃতি ও অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে সাধু-ভক্তদের কাছে ঐ সব মূল্যবান স্মৃতির পুনরাবৃত্তি করেছেন। বর্তমান গ্রন্থ "স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি-সঞ্চয়ন" বিভিন্ন সাধু-ভক্তদের দ্বারা রক্ষিত স্মৃতিকথার সংকলন।

এই স্মৃতি-সঞ্চয়নের মধ্যে রয়েছে স্বামী অখণ্ডানন্দ কথিত শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ, স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য জীবনের বিভিন্ন কথা ও কাহিনী, তাঁর নিজের জীবনের সংগ্রাম ও সিদ্ধি, দুঃসাহসিক ভ্রমণ বিবরণ, বিভিন্ন সাধুমহাত্মার চরিত কথা। এ গ্রন্থে আছে চরিত্র গঠনের প্রতি অনুপ্রেরণা, কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ, অধ্যাত্মজীবনের ইঙ্গিত ও মানুষ ভগবানের পূজা পদ্ধতি। সর্বোপরি এ গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাস।

এই হৃদয়বান কপর্দকহীন সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মিশনের অগ্রগামী দূত। পরিব্রাজকজীবন থেকেই তিনি শুরু করেন সেবাব্রত। তারপর স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন শুরু করেন ১মে ১৮৯৭। ১৫ মে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদের কেদারমাটি-মহুলায় মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের চণ্ডীমণ্ডপে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য সাহায্য কেন্দ্র খোলেন। চাউল তখন দুষ্প্রাপ্য। লোকের সাহায্যে অতি কষ্টে কিছু চাউল যোগাড় করে, নিজ হাতে দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করে তিনি সমভাবে চাউল বিতরণ করেন গরীবদের মধ্যে। প্রকাশ্যভাবে ইহাই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-শিষ্য অখণ্ডানন্দ হয়ে উঠলেন গরীবের "বাবা", "দণ্ডীঠাকুর"। স্বামী অভেদানন্দের ভাষায় "patriot, statesman and philanthropist." এই সরল, সর্বত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ, পবিত্র, প্রেমিক, পণ্ডিত, আদর্শবান সন্ন্যাসীর কথা শুনলে অসাড় প্রাণে জাগে সাড়া, দুর্বল মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার হয়, আত্মশক্তির উন্মোচন হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রাণের কথা শাস্ত্রের এই শ্লোকটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ঃ

কো নু ন স্যাদুপায়োঽত্র যেনাহং সর্বদেহিনাম্।
অন্তঃ প্রবিশ্য সততং ভবেয়ং দুঃখভারভাক্॥

অর্থাৎ, এই সংসারে এমন কি উপায় আছে, যার দ্বারা আমি সকল দুঃখী প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে তাদের দুঃখ নিজেই সতত ভোগ করতে পারি।

নূতন শতাব্দীর প্রাক্‌লগ্নে স্বামী অখণ্ডানন্দের এই স্মৃতি-সঞ্চয়ন স্বামী অখণ্ডানন্দকে যেরূপ দেখিয়াছি নামে প্রকাশিত হলো এবং প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উৎসও দেওয়া হলো। আশাকরি এই গ্রন্থপাঠে জনগণ উপকৃত হবেন।

সেন্ট লুইস
১ বৈশাখ ১৪০৫ চেতনানন্দ
(১৫ এপ্রিল, ১৯৯৮)

সূচীপত্র

স্বামী অখণ্ডানন্দ

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

১৮৬৪ সালের এক পুণ্য দিনে কলিকাতা মহানগরীর আহিরীটোলা অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত ঘটক বংশে গঙ্গাধরের (স্বামী অখণ্ডানন্দের) জন্ম হয়। সাধারণ দশজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে নবজাত শিশু যতটুকু আনন্দ অভ্যর্থনার মধ্য দিয়া পৃথিবীর আলোক প্রথম দর্শন করে, গঙ্গাধর মহারাজ তদপেক্ষা অধিক কিছু লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। উত্তরকালে তাঁহার দেহমন অবলম্বন করিয়া যে অনুপম আধ্যাত্মিক শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল, সেদিন তাহার কোন আভাস যে কেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল এমন কথাও আমরা জ্ঞাত নহি। আমরা শুনিয়াছি, সাধারণ নিয়মানুসারেই দিনে দিনে বালক বর্ধিত হইয়াছিল এবং সাধারণ দশজনেরই মতো হাসি, খেলা ও আনন্দের মধ্য দিয়া সে তাহার প্রথম শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিল। হয়ত অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রেরণা এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সচকিত করিত, হয়ত রৌদ্রতপ্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে অনন্ত প্রসারিত দিক চক্ররেখার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বালকের মন অকারণে কখনো কখনো এ জগতের সীমাবন্ধন বিস্মৃত হইত; এ সংসারকে তাঁহার বিদেশ বলিয়া মনে হইত। কিংবা প্রশান্ত রজনীর ধ্যান গম্ভীর বায়ুমণ্ডলী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অতিক্রম করিয়া দৈবাৎ কোন দেবশিশু ঘুমন্ত বালকের কানের কাছে হয়ত অতীন্দ্রিয় রাজ্যের আহ্বানধ্বনি পৌঁছাইয়া দিয়া যাইত—বালক তাহাতে অকস্মাৎ ঘুম ছাড়িয়া উঠিয়া বসিত। অথবা হয়তো এসবের কিছুই হইত না—এসব আমাদেরই নিরর্থক কষ্টকল্পনা! বস্তুত, সাধারণের মাপকাঠিতে অসাধারণকে ধরিতে বুঝিতে যাওয়া অনেক সময়ই নিরাপদ হয় না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ পরিবারের আনুষ্ঠানিক প্রভাব এবং নিজের যুগ-যুগ অর্জিত দৃঢ় সংস্কার বালক গঙ্গাধরকে ত্রিসন্ধ্যা স্নান, পূজা, জপ প্রভৃতিতে বিশেষভাবে অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিল। নিষ্পাপ সরলতা শিশুমাত্রেরই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে আমরা দেখিতে পাই সত্য কিন্তু গঙ্গাধর ছিলেন 'মূর্তিমান সরলতা' ও 'মূর্তিমান শৈশব'। আর সে শৈশব-সরলতার অনুপম মাধুর্য চিরকাল তাঁহার চরিত্রের অন্যতম প্রধান ভূষণ ছিল। জীবনের সকল কর্ম ও সকল চিন্তার মধ্য দিয়া সে সহজ সারল্যের অপূর্ব প্রকাশ চিরদিন তাঁহাকে প্রত্যেকেরই নিকট বিশেষভাবে প্রিয় ও শ্রদ্ধার্হ করিয়া রাখিয়াছিল।

চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দৈবনির্দেশে বালক গঙ্গাধর বাগবাজারের বিখ্যাত এটর্নি দীননাথ বসু মহাশয়ের গৃহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যদর্শন প্রথম লাভ করিয়াছিলেন। শৈশবের অন্তরঙ্গ বন্ধু হরিনাথ (যিনি পরবর্তী কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন) সে দিন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সেই প্রথম দর্শনের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ এই অপাপবিদ্ধ বালককে

কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিজ স্বাভাবিক স্নেহ-স্পর্শ ভিন্ন অন্য বিশেষ কোন ভাবে তাঁহাকে আপ্লুত করিয়াছিলেন কিনা—এত দীর্ঘকাল পরে তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার আমাদের কোন উপায় নাই। কেবল পরবর্তী কালের ঘটনাবলী সেদিনের দর্শন—পরস্পরের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করিতে আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর স্বাভাবিক অনুপ্রাস প্রীতি 'গদাধর' ও 'গঙ্গাধর'—এই দুইটি নামের মধ্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত খুঁজিয়া বাহির করিতেও যেন আমাদের মধ্যে একটু ঔৎসুক্য জাগাইয়া দেয়।

সে যাহা হউক, লোকোত্তর গুরু এবং তাঁহার চিহ্নিত এই সন্তানটির মধ্যে প্রথম মিলন এইরূপে কোন মন্দির দেউলে না ঘটিয়া এক সাধারণ ভক্ত গৃহস্থের বাটীতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, এই দর্শনের প্রায় দুইবৎসর পরে একদা এক পশ্চিমদেশাগত সন্ন্যাসীর সহিত গঙ্গাধর অত্যন্ত গোপনে গৃহত্যাগ করেন। অবশ্য সে অল্পদিনের জন্য মাত্র। বাঙলার জলবায়ু ও পিতামাতার স্নেহাকর্ষণ অনতিকালমধ্যেই আবার তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনে এবং এই সময় হইতেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট তাঁহার যাতায়াত বর্ধিত হইতে থাকে। দিনে দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক স্নেহ ভালবাসা এবং তাঁহার অপূর্ব, ত্যাগপূত, সমাধিসিদ্ধ জীবন—এই সরল বালকের হৃদয়টিকে অধিকার করিয়া লয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই উপদেশানুসারে তিনি এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত হন। ঠাকুর বলিতেন, "কোন্ হাঁড়ির মুখে কোন্ সরাটি বসাতে হয়—বাড়ির গিন্নী সে সংবাদ রাখে।" তাই দেখা যায়, বালক ভক্তদের মধ্যে কাহার সহিত কাহার ভাবের মিল আছে—তাহা সজাগ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া তিনি সর্বদা তাহাদিগের মধ্যে পরিচয় ও মিলন সাধন করাইয়া দিতে তৎপর থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইয়া গঙ্গাধর মহারাজ জীবনে এক পরম সম্পদ লাভ হইল বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জীবনের আরাধ্য দেবতা ও ইষ্টরূপে গ্রহণ করিলেও—কর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার দুর্গম ক্ষুরধার পথে স্বামীজীই গঙ্গাধর মহারাজের যথার্থ পথপ্রদর্শক ও সহায়ক ছিলেন। একাধারে অনুগত শিষ্য, সেবক, বন্ধু ও ভ্রাতারূপে স্বামীজীর পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিয়া চলাই তাঁহার জীবনের আনন্দ এবং ব্রত ছিল।

পরিচয়-হীন, দীন পরিব্রাজক বেশে স্বামীজী যখন ভারতের তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, যখন গুরুভ্রাতাদিগের নিকট হইতে পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া ভারতের বিশাল জনারণ্য-মধ্যে তিনি নিজেকে এককালে বিলুপ্ত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখনও বহুকাল পর্যন্ত গঙ্গাধর মহারাজকে তিনি সঙ্গ ছাড়া করিতে পারেন নাই। স্বামীজী নিজেই বলিতেন, "সবাইকে কাছ ছাড়া করতে পেরেছি, কেবল গঙ্গাধরকে কাছ ছাড়া করতে পাচ্ছি না।" নিজে ভিক্ষা করিয়া স্বামীজীকে আহার করান, লাইব্রেরী হইতে বই বহিয়া আনিয়া স্বামীজীর পাঠের সুবিধা করিয়া দেওয়া এবং যথাসম্ভব তাঁহার একটু সেবাযত্ন করাই গঙ্গাধর

মহারাজের এই সময়কার জীবনের চরম আনন্দ ও পরম তৃপ্তির ব্যাপার ছিল। বোধকরি, তাঁহার বালক বয়সের সজাগ ও গ্রহণোৎসুক মনের সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেদিন তাঁহার দুর্লভ স্নেহময় মূর্তিটি লইয়া প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেদিন হৃদয়ের রত্নসিংহাসনে নিজের অজ্ঞাতসারেই গঙ্গাধর মহারাজ যেমন সেই মহাপুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও সেই সিংহাসনেরই একাংশে তিনি পরম আগ্রহে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাই, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের যুগ্মজীবন একইরূপ নিষ্ঠায় অন্তরে ধারণ করিয়া তাঁহাদের উভয়েরই বৈশিষ্ট্যধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে এই পুরুষপ্রবরের আজীবন প্রয়াস ছিল। একদিকে স্বামীজী প্রবর্তিত সেবাধর্মের আদর্শে গণদেবতার পূজায় সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করিয়া ইহজীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যেমন সেই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি নিযুক্ত ছিলেন—অন্যদিকে আবার তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাতে আপনি ডুবিয়া থাকিবার মানসে বাংলার এক অখ্যাত নিভৃত পল্লীতেই তিনি তাঁহার স্থায়ী আবাস নির্মাণ করিয়াছিলেন। ধর্ম জীবনের নির্জন নীরবতা শান্ত আবহাওয়া একদিকে যেমন তাঁহার সমগ্র চেতনাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিত—পিতৃমাতৃহীন গৃহহারা দরিদ্র বালকদের সহিত সহানুভূতিতে এক হইয়া অবস্থান করিতেও তেমনি তাঁহার দরদী প্রাণ নিয়ত ব্যাকুল হইয়া থাকিত। আমরা জানি, সারগাছির পল্লী আশ্রম ত্যাগ করিয়া বেলুড় মঠে আসিয়া বাস করিবার জন্য ইদানীং তাঁহাকে অনেকেই অনুরোধ করিতেন কিন্তু সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। সারগাছি অনাথ আশ্রমের অসহায় বালকগুলির সহিত তাঁহার যে গভীর স্নেহসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল সেটি ছিন্ন করিয়া চলিয়া আসা বোধকরি তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। ফলকথা, ধর্ম ও কর্ম সাধনা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনধারা গঙ্গাধর মহারাজের দেহ-মনাবলম্বনে সত্যই একটা সর্বাঙ্গসুন্দর সামঞ্জস্যলাভ করিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাতের কিছুকাল পরেই গঙ্গাধর মহারাজ বিদ্যালয়ের পাঠ এককালে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূতসঙ্গ এবং আশীর্বাদ তাঁহাকে সংসারের সব কিছুরই উপর উদাসীন করিয়া তুলিয়াছিল। আর সেই ঔদাসীন্যের উপর নরেন্দ্রনাথের তেজোদীপ্ত বাণী অব্যর্থভাবে আঘাত করিয়া গঙ্গাধর মহারাজের মধ্যে নিত্য নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত এবং তাঁহাকে ঈশ্বরার্থে সর্বস্ব ত্যাগরূপ মহাব্রত গ্রহণে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছিল।

কিশোর বয়সের উৎসাহ আনন্দের সুখময় কতকগুলি দিন এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর কাশীপুর বাগান বাটীতে বড় দুঃখের দিন সমাগত হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র প্রমুখ যুবক ও কিশোর ভক্তদিগকে একটা মহান জীবনের আদর্শ দেখাইয়া এবং সে জীবন লাভের জন্য দেহ, মন ও প্রাণের সর্বশক্তি অকুতোভয়ে নিয়োগ করিতে একটা অকৃত্রিম প্রেরণা প্রদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন সহসা লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়া গেলেন। তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে আশ্রয়হীন ও সহায়-সম্পদহীন এই সব যুবক দল কিভাবে প্রথমে বরাহনগরে ভূতের বাড়িতে এবং পরে আলমবাজারে সাধনার গগনস্পর্শী হোমানলশিখা প্রজ্বলিত করিয়া

নিজেদের সব কিছু তাহাতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, কি ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনাহার, অর্ধাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি অসহনীয় শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মধ্য দিয়া—জ্ঞান, শান্তি ও মহদুদার আনন্দের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং কিভাবে পুঁথিগত ও সম্প্রদায়গত অনুদারতার ও সঙ্কীর্ণতার কারাপ্রাচীর হইতে ধর্মকে মুক্ত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বভৌমিক জীবনালোকে তাহাকে নূতন রূপ ও নূতন জীবনীশক্তি প্রদানে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজ তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা উহার পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না। আমরা এস্থানে শুধু এইটুকুই বলিতে চাহি যে, যেদিন নরেন্দ্রনাথ রাখালচন্দ্র প্রমুখ দুর্দম সাহসসম্পন্ন যুবকদল আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি সকলের হিতোপদেশ তুচ্ছ করিয়া এক সম্পূর্ণ অজানা ও অদৃশ্যরাজ্যের অলৌকিক রত্নরাজি আহরণ করিবার জন্য একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনস্মৃতিরূপ অক্ষয়পেটিকা বুকে ধরিয়া সাধনসমুদ্রের তলদেশ অভিমুখে ডুব দিয়াছিলেন, যেদিন বরাহনগরে ভূতের বাটীতে ইঁহাদের অদৃষ্টপূর্ব ত্যাগ তপস্যার যজ্ঞাগ্নিতে ভবিষ্যৎ ভারতের জাগরণমন্ত্র সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল, সেদিন কিশোরবয়স্ক সরল গঙ্গাধরও ইঁহাদের সহিত ঐকান্তিক নিষ্ঠায় যোগদান করিয়া সে নবযুগ উদ্বোধন-যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে সর্বতোভাবে নিযুক্ত ছিলেন। অহোরাত্র ধ্যানজপ, শাস্ত্রালোচনা—ভজন, কীর্তন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে স্বামীজী প্রমুখ সকলের দিন তখন যে কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইত, গঙ্গাধর মহারাজেরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি—এই সময়ে একবার কিছুদিন মঠে অবিরত বৌদ্ধশাস্ত্রাদির আলোচনা হইতে থাকে। স্বামীজীর জ্বলন্ত ভাষায় ঐসব আলোচনা শুনিতে শুনিতে গঙ্গাধর মহারাজের উৎসুক মনে তিব্বতে যাইবার বাসনা প্রবল হয় এবং একদিন নগ্নপদে, পরিব্রাজকবেশে যুবকসন্ন্যাসী গঙ্গাধর সেই সুন্দর অজানা লামার রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। তখনো তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতিবর্ষ পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার পূর্বে কিশোরবয়সে এক রাজা রামমোহন রায়ই বোধ হয় তিব্বত পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন।* তিব্বতীদের দেশে প্রায় তিন বৎসরকাল গঙ্গাধর মহারাজ অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহাদের ভাষা, ধর্ম, আচারব্যবহার প্রভৃতির সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিচিত হইতে তিনি তখন বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার এই তিন বৎসরের মূল্যবান অভিজ্ঞতা—"তিব্বতে তিন বৎসর" শীর্ষক ধারাবাহিকপ্রবন্ধে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাষার মাধুর্যে ও শুচিতায়, ঘটনার বৈচিত্র্যে এবং ভূয়োদর্শনের প্রকাশে—ঐ প্রবন্ধগুলি পাঠক মাত্রকেই তখন আকর্ষণ করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রবন্ধগুলি অসমাপ্ত রাখিয়াই লেখক লেখনী ত্যাগ করেন এবং যে প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছিল সেগুলিও

---

* রাজা রামমোহন বিংশতিবর্ষ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে তিব্বতভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়াছি। কিন্তু আধুনিক অনেক সমালোচক এ-বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। রাজা রামমোহন কোন দিনই তিব্বত গমন করেন নাই—এইরূপ মত কোন কোন বিশিষ্ট লেখকের প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। [বর্তমানে 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে' নামে ঐ পুস্তক উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হইয়াছে।]

দীর্ঘ তিন বৎসরকাল তিব্বত ও তৎসন্নিকট অঞ্চলসমূহে অতিবাহিত করিয়া সহসা একদিন গঙ্গাধর মহারাজ বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন এবং কিছুদিন মঠে থাকিয়া আবার পরিব্রাজকবেশে বাহির হইয়া পড়েন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের অনেক সময়েই গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। রাজপুতানার মরুপ্রান্তর, হিমাচলের দুর্গম প্রদেশ, বিন্ধ্যারণ্যের জনশূন্যবর্ত্ম, গুজরাট, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অংশে পায়ে হাঁটিয়া হাঁটিয়া গঙ্গাধর মহারাজ—পূর্বাপর ভারতীয় সাধকমণ্ডলীর প্রদর্শিত পথে এই বিরাট দেশ ও তাহার সংস্কৃতিধারার সহিত পরিচিত হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সব ভ্রমণকালের প্রত্যেকটি দিন একদিকে যেমন অপূর্ব অভিজ্ঞতা দানে ইঁহাদের প্রত্যেকের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি নিদারুণ দুঃখকষ্টের অসহ্য উত্তাপ প্রদান করিয়া জগতের সর্ববিধ ঘাতপ্রতিঘাতে অবিচলিত থাকিবার কঠোর শিক্ষাও প্রদান করিয়াছিল। গুজরাট অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ে একবার জনৈক স্ত্রীলোক গঙ্গাধর মহারাজকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। দৈবানুগ্রহে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। ঐ প্রদেশেরই মরুপ্রান্তরে আর একবার মন্বন্তর-পীড়িত এক গ্রামের পার্শ্ব দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দস্যুহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। এক বৃক্ষের সহিত হস্তপদ বদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে সেবার সমস্তদিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। পরে সন্ধ্যায় দস্যুসর্দার দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া যায়।

খেতড়িতেও তিনি অনেককাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজপুতানার 'গোল' বা 'গোলাম' শ্রেণীর দাস ও পতিত লোকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পরিব্রাজক জীবনেই তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু বংশানুক্রমিক সুবিধাভোগী আভিজাত্যপুষ্ট রাজন্যকুলের বিরোধিতায় তাঁহার সে উদ্যম ফলবান হয় নাই। উদয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলেও দীন দুঃখীদের পতিত ও দুঃস্থ অবস্থা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। বস্তুত সমাজের চির-উপেক্ষিত যাহারা তাহাদের জন্য অনুপম সহানুভূতিবোধ তাঁহার জীবনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেরই ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। তাই বোধকরি স্বামীজীর সেবাধর্মের প্রথম ঋত্বিক হইতে পারা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল এবং মুর্শিদাবাদের বিজন পল্লীতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি নিরাশ্রয় বালকের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য জীবনের সমগ্রশক্তি কেন্দ্রীভূত করা তাঁহার নিকট পরম শ্রেয়স্কর বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা পরিব্রাজক জীবনের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারা শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তান কাহারও বেলায়ই যেমন আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, গঙ্গাধর মহারাজের বেলায়ও ঠিক তেমনি হইয়াছে। ক্বচিৎ কখনো কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ পরস্পর সম্বন্ধে ২/১টি ঘটনা যাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন তাহাই শুধু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু

গঙ্গাধর মহারাজের মধ্যে পরিব্রাজক জীবনের আকর্ষণ যে শেষ বয়স পর্যন্ত ক্রিয়া করিত তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের ন্যায় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যুবকদল যখন তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছে তখন তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে বৃদ্ধ। সে বৃদ্ধাবস্থায় অনেক সময় সমীপাগত যুবকদিগকে ভারতের বিশালক্ষেত্রে পরিব্রাজকবেশে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য তিনি উৎসাহিত করিতেন। বলিতেন "পরিব্রাজকবেশে দেশে দেশে, পাহাড়ে পাহাড়ে যখন ঘুরে বেড়াতুম তখন মনের কি অপূর্ব অবস্থাই না ছিল। সতেজ, অনাসক্ত মন নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা লাভে তন্ময় হয়ে থাকত। শরীরের দুঃখকষ্ট গ্রাহ্যের ভিতরই আসত না। এখন তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি তবু সেই অতীত জীবনের জন্য মনটা চঞ্চল হয়। আমার ইচ্ছা হয়, তোমরা সব বেরিয়ে পড়। একবার যদি ভারতবর্ষের সবটা ঘুরে দেখে আসতে পার তবে বহু বৎসরের বহু পুঁথিপুস্তক পাঠের চাইতে বেশি জ্ঞান লাভ হবে। বয়স বেশি হয়ে গেলে রক্তের তেজ কমে যায়, তখন আর দেশ ভ্রমণ সম্ভব হয় না। সুতরাং শক্তি থাকতে থাকতে এই সময় ঘুরে এস গে।"

গঙ্গাধর মহারাজের জীবন সহজ, সরল ও একান্তভাবে অনাড়ম্বর ছিল এবং চিরদিন একই ভাবে শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পথে নিঃশব্দে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। শান্তি ও আনন্দ তাঁহার দেহমন হইতে নিত্য বিচ্ছুরিত হইত। তাঁহার পুণ্য-দর্শন লাভ যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে তাহারাই একথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে যে, অন্তরের প্রগাঢ় শান্তির অক্ষয় উৎস হইতে উৎসারিত আনন্দহিল্লোল স্বভাবগত সরল পথে প্রবাহিত হইয়া কেবল তাঁহাকেই যে নিয়ত নিমজ্জিত করিয়া রাখিত তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার প্রভাব চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রত্যেককেই প্লাবিত করিয়া ফেলিত। উন্মুক্ত প্রান্তর-মধ্যদিয়া প্রবহমান-জলধারার অবারিত বক্ষ হইতে নবোদিত সূর্যের স্বর্ণকিরণ সহস্রধারে প্রতিফলিত হইয়া যেমন ঐ জলরাশির একান্ত স্বচ্ছতার সাক্ষ্য প্রদান করে, বাহ্য-ঘটনানিচয়ের সংঘাতে হাস্যোদ্ভাসিত এই মহাপুরুষের বদনমণ্ডলও ঠিক তেমনি তাঁহার বালসুলভ সরল অন্তঃকরণের অনুপম স্নিগ্ধতা ও নির্মলতাই পরিচয় প্রদান করিত। জীবনের মধ্যাহ্নে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি অঞ্চলে উপনীত হইয়া তথাকার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীর দুঃখে বিচলিত হইয়া সেই যে সেখানে তিনি সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সেই ব্রতই উদ্‌যাপিত করিয়া গেলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে শান্ত সমাহিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং পরের চোখের জল মুছাইতে সর্বদা সর্বাবস্থায় তৎপর থাকাই সর্বকর্ম প্রচেষ্টার মূলনীতি রূপে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক কর্মোদ্যমকে স্বামী বিবেকানন্দ ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপ আমেরিকা হইতে লিখিত স্বামীজীর পত্রাবলীর অনেকগুলিই গঙ্গাধর মহারাজের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল।

গুরুভ্রাতাদিগের প্রত্যেকের জন্য গঙ্গাধর মহারাজের ঐকান্তিক ভালবাসা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল। পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের যখন দেহত্যাগ হয়, তখনকার সেই বিষাদময় দিনে আত্মভোলা এই সন্ন্যাসীর একান্ত বিহ্বলভাব ও সকরুণ চাহনি যে-ই প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহারই স্মৃতির পটে উহা উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ধর্মজগতের ইতিবৃত্তে

একই গুরুর বিভিন্ন শিষ্যদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিরোধের দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কিন্তু সে পাপের কৃষ্ণছায়া গঙ্গাধর মহারাজকে কখনো স্পর্শ করিতে পারে নাই। নিজের অন্তর্নিহিত আনন্দের অনুপম স্নিগ্ধতায়ই তিনি সর্বদা ভরপুর থাকিতেন, অন্যের দোষ ত্রুটি দেখিবার মতো অবসরই তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না। বস্তুত, সরলতার মূর্তবিগ্রহ এই মহাপুরুষ কোন বিষয়ে নিজেকে অন্য কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে অক্ষম ছিলেন। তাই অন্যকে হেয়জ্ঞানে তুচ্ছ করা যেমন তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ছিল, তেমনি গুরুগিরি করা কিংবা আচার্যপদ গ্রহণ করাও তাঁহার স্বভাব ও ইচ্ছার বিরুদ্ধ ব্যাপার ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষপদে যখন তিনি সমাসীন ছিলেন, সেই সময় অনেক নর-নারী তাঁহার নিকট আনুষ্ঠানিক দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, শুধু অবস্থার চাপে পড়িয়াই গঙ্গাধর মহারাজ ঐরূপ দীক্ষাদি প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, নতুবা ব্যক্তিগতভাবে দীক্ষাদানে সর্বদাই তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন।

দিনে দিনে জগতের চিন্তাধারা পরিবর্তনের বিশাল খাদে দুর্জয় গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্যের এক প্রান্ত হইতে প্রাচীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বদেশে সর্বজাতির উপর দিয়া নিত্য নূতন চিন্তার প্লাবন চলিয়া যাইতেছে। ধর্ম ও ধর্ম-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে আজ বিংশ শতাব্দীর বহু জাতি তাহাদের চরম সিদ্ধান্ত স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছে। ভারতবর্ষেও যে সে চিন্তার ঢেউ আসিয়া আঘাত করে নাই এমন নহে কিন্তু তথাপি ভারত আজ পর্যন্ত জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ধর্মকেই তাহার জাতীয় জীবনের শাশ্বত ভিত্তি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়া চলিতে সচেষ্ট রহিয়াছে। বিপরীত মত মস্তকোত্তোলন করিতেছে সত্য কিন্তু এখনো উহা তেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। অনাগত ভাবীকালে এই সব চিন্তাধারার কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইবে এবং ভারতবর্ষই বা কিভাবে নিজের বহুকালের দৃঢ়বদ্ধ ধারণার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করিয়া নূতন যুগের যাত্রাপথে পা বাড়াইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা সুকঠিন। আমরা সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে এস্থলে ইচ্ছুকও নহি, শুধু এইটুকুই উপসংহারে বলিয়া রাখি যে, যুগের হাওয়া যে পথেই প্রবাহিত হউক না কেন, ধর্মের নির্দেশ ও সংজ্ঞা যেভাবেই পরিবর্তিত হউক না কেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান যাঁহারা, যাঁহারা "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়" ব্যক্তিগত সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অক্লেশে বলি দিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে হৃদয়ের স্বতঃউচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধাঞ্জলি জাতি চিরদিনই প্রদান করিবে, মত বা পথের অনৈক্য তাহাতে কখনো বাধা জন্মাইবে না। কারণ, পরার্থে উৎসর্গীকৃত মহাপ্রাণ মনীষিগণের জীবনালোকেই জাতি অন্ধতমোময় ভবিষ্যতের মধ্য হইতে নিজের অগ্রগতির পথ চিরদিন খুঁজিয়া বাহির করে এবং ইঁহাদের অস্থি সহায়েই বিরুদ্ধ আসুরী শক্তি ধ্বংস করিবার মহাবজ্র সে নির্মাণ করিয়া লয়।

(উদ্বোধন ঃ ৩৯ বর্ষ ৮ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি

স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ

তিব্বতে স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দ—(ভক্ত ও ব্রহ্মচারীদের প্রতি) "এই মহাপুরুষের কথা শুনে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ল, শোন—

"আমি উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি। টিবেট টিবেট ঘুরছি। দু তিন বছর এঁদের (মহারাজদের দেখাইয়া) কোনও চিঠি লিখি নি। ওঁরা আমার জন্য খুব ভাবতেন, কখনো মনে করতেন, বুঝি পাহাড় থেকে পড়ে গেছি, বা বাঘে টাঘে আমায় খেয়ে ফেলেছে। তারপর গঙ্গোত্তরীতে যাই। গঙ্গোত্তরীর জল মঠে ঠাকুরের জন্য পাঠাই। তাইতে এঁরা আমার একটু আভাস পেয়েছিলেন। তারপর ঠাকুরের ভক্ত কোন্নগরের নবাই চৈতন্যর সঙ্গে দেবপ্রয়াগে দেখা হয়। সে আমাকে দেখে খুব খুশি। সেই বরাহনগরে, আর কয়েক বৎসর পরে এই দেবপ্রয়াগে দেখা। যাক। তারপর আমি ভূস্বর্গ কাশ্মীর যাই। সেখান থেকে স্বামীজীকে চিঠি লিখি। তখন তিনি গাজীপুরে।"

স্বামী অখণ্ডানন্দ ও গুপ্তচর কথা

"আমার তখন খুব ইচ্ছা ছিল তুর্কী, মধ্য এশিয়া ঘুরে আসি। ইংরাজ গভর্মেন্টের রেসিডেন্ট ঐসব দেশ ঘুরে তাদের জানাবার জন্য বড় spy এর post (গুপ্তচরের পদ) আমাকে দিতে এসেছিল। আমি তাতে গ্রাহ্য করলুম না। ঐ পদ গ্রহণে সম্পূর্ণ ঘৃণার সহিত অস্বীকার করলুম। যাক, সে কথা। তারপর স্বামীজী গাজীপুর হতে আমাকে বারংবার কাশ্মীরে চিঠি লিখলেন, গঙ্গা, 'তোমাকে অনেক দিন দেখি নি, দেখবার বড় ইচ্ছা হয়েছে, তুমি চলে এস।' তিনি আরও লিখলেন, 'তুমি উত্তরাখণ্ড অনেক ঘুরেছ, তোমার অনেক নির্জন পাহাড় জানা আছে। আমার ইচ্ছা, মাঝে কোথাও না ঘুরে তোমার সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের কোনও পাহাড়ে গিয়ে একেবারে তপস্যায় মগ্ন হয়ে যাই। তপস্যার চেয়ে শান্তি আর নাই। তুমিও আমার সঙ্গে থেকে তপস্যা করবে। শীঘ্র নেমে এস।' "

রসদদার সুরেশ মিত্রের পরলোক গমন

"স্বামীজীর সঙ্গে অনেকদিন আমার দেখা হয় নি। আর তাঁর ঐরকম পত্র একাধিকবার

পেয়ে আমি তুর্কীর দিকে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করে গাজীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলুম। গাজীপুরে পৌঁছে শুনলুম, তিনি কলিকাতায় ঠাকুরের ভক্ত ও রসদদার শ্রীমান সুরেশবাবুকে দেখতে গেছেন। তিনি অতিশয় পীড়িত। আমিও গাজীপুর থেকে কলিকাতায় এসে স্বামীজীর সহিত মিলিত হলুম।"

স্বামীজীর সুড়ঙ্গ দেখিবার ইচ্ছা

"সুরেশ বাবুর[১] দেহান্তে স্বামীজী ও আমি উত্তরাখণ্ডে যাবার জন্য প্রস্তুত। তিনি আমায় বললেন, 'দ্যাখ, গ্যাঞ্জেস[২] (Ganges) কোথাও আর নাবা টাবা হবে না ; একেবারে উত্তরাখণ্ডে যেতে হবে।' স্বামীজীর টানেল দেখবার ইচ্ছা। তাই আমরা ঘুরে লুপ লাইন দিয়ে ভাগলপুর হয়ে লক্ষ্মীসরাইতে এলুম। পূর্বে আমার ৺বৈদ্যনাথ দর্শন হয় নাই। ৺বাবাকে দর্শন করবার জন্য স্বামীজীকে অনেক অনুনয়, পীড়াপীড়ি করে ৺বৈদ্যনাথে নিয়ে এলুম। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন বলে আমার অনুরোধে লক্ষ্মীসরাই থেকে ফিরে এসে বাবা ৺বৈদ্যনাথ দর্শন করে উভয়ে ৺কাশীধামে প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে উঠলুম।

স্বামী বিবেকানন্দ ও অখণ্ডানন্দের অযোধ্যায় সীতারামজীর মন্দিরে গমন

"স্বামীজীর ইচ্ছা, পথে আর কোথাও না নেমে ৺কাশীধাম থেকে বরাবর উত্তরাখণ্ডে যাই। অযোধ্যায় সীতারামজীর এক মন্দির আছে। সেই মন্দিরের মোহান্ত খুব ত্যাগী ও প্রেমিক সাধু। সেই প্রেমিক সাধু দর্শনান্তে উত্তরাখণ্ডে যাবার জন্য স্বামীজীকে বিশেষ অনুরোধ করলুম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি নন, বরাবর হিমালয়ে যেতে চান। আমাকে গালাগাল দিয়ে বলতে লাগলেন, 'বাবুরামের সঙ্গে গেলি নি কেন? যত নোড়া, নুড়ি, ঠাকুর, মন্দির দেখবে, বাবুরাম সেখানে ঢুকে গড়াগড়ি দেবে।' এই রকম করে বাবুরামকেও উদ্দেশ্য করে খানিক গালাগাল দিলেন। তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন বলে ঐ রকম গালাগাল দিতেন। তাঁর ঐ রকম গালাগাল খেয়েও আমি দুখানা অযোধ্যার রেলওয়ে টিকিট কিনলুম। তাইতে স্বামীজী মুখ গম্ভীর করে গাড়িতে উঠলেন বটে কিন্তু আমার সঙ্গে একেবারে কথা বন্ধ করে দিলেন। যথা সময়ে ট্রেন অযোধ্যা স্টেশনে এসে পৌঁছল, আমরা দুজনে ট্রেন থেকে নামলুম। আমি স্বামীজীর জন্য হুঁকা কলকে নিয়ে এক্কায় চড়ছি—সেই কাশী স্টেশন থেকে এখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে স্বামীজীর কোনও কথা নেই—তিনি হুঁকা কলকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন; এমনি আমার উপর রেগে গেছলেন। যাহা হউক, আমরা এক্কা করে সরযূতীরে বিখ্যাত লছমন ঘাটের কাছে সীতারামের মন্দিরে

---

১ সেই সময়েই সুরেশবাবু দেহত্যাগ করেন।

২ পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজকে তিনি আদরপূর্বক ঐ নামে ডাকিতেন।

উঠলুম। রাত্রে প্রসাদ পেয়ে শুয়ে পড়লুম। সে রাত্রে আর মোহান্ত মহারাজের সঙ্গে বড় কথাবার্তা হলো না। তখনও পর্যন্ত আমার সঙ্গে স্বামীজীর কথা বন্ধ। আমার মন যা হতে লাগল, সে আর কি বলব।"

সাধু জানকীবল শরণ সঙ্গে

"মোহান্ত মহারাজ হচ্ছেন যুগল বল শরণের শিষ্য জানকী বল শরণ। খুব লম্বা দাড়ি, বৈষ্ণব হলেও গায়ে তিলক টিলক বাহ্যিক চিহ্ন কিছুই নেই। খুব বড় মোহান্ত—আয় (income) অনেক। তিনি ইচ্ছা করলে সোনার থালে খেতে পারেন, কিন্তু খুব ত্যাগী, প্রেমিক ও বৈরাগ্যবান। থালায় না খেয়ে অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে এক শালপাতাতেই প্রসাদ পান। তাঁর একজন নাগা সহকারী আছেন, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, খুব জোয়ান, হাতে একগাছি মোটা লাঠি। মোহান্তজী জানকী বল শরণ তাঁর হাতে বৈষয়িক ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে নিজে সাধন ভজনে কাল কাটান।

"ইতিপূর্বে আমি একবার এখানে এসেছিলুম। মোহান্তজীর ত্যাগ বৈরাগ্য প্রেম দেখে এবার স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তাঁকে জোর করে এখানে আনি। পরদিন প্রাতে আমি মোহান্তজীর সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দিলুম। ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম সম্বন্ধে উভয়ের অনেক কথাবার্তার পর প্রেমিক কবি হাফেজের একনিষ্ঠার কথাও হলো।

"স্বামীজী আমার প্রতি এত রেগেছিলেন যে, সেই থেকে গত রাত্রি পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা কননি। কিন্তু মোহান্তজীর সঙ্গে আলাপের পর আমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর সেই পদ্মপলাশের মতন বড় বড় চোখ দুটো জলে ভরে গেল এবং আমার উপর খুব খুশি হয়ে মোহান্তজীর যথেষ্ট প্রশংসা করতে লাগলেন। প্রেমিক মোহান্তজীও আমার কাছে তাঁর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হলেন এবং তাঁকে জোর করে ঐখানে আনায় তিনিও আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।"

প্রেমিক কবি হাফেজের একনিষ্ঠা

পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ হাফেজের[১] গল্পটি বলিতে লাগিলেন—

"হাফেজ একজন অতি দরিদ্র মুসলমান ভিক্ষুক। সে ভিক্ষা করে অতি কষ্টে কোনরূপে দিন গুজরান করত। একদিন হাফেজ গ্রামের এক অল্প বয়স্কা বেশ্যার বাড়িতে ভিক্ষা করতে

---

১. পারস্যদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি মহম্মদ শামসুদ্দিন হাফেজ।

প্রবেশ করেছে। বারবনিতাটি ছিল পরমা সুন্দরী। পর্দার আড়াল থেকে সেই স্ত্রীলোকটি ভিক্ষা দিতে গেলে হঠাৎ তার সুন্দর রূপ, যৌবন হাফেজের চোখে পড়ে এবং তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। কামাতুর ভিখারি ভাবতে লাগল, আমি নিতান্ত গরীব, পথের কাঙালী, আর ঐ স্ত্রীলোক ধনলোভী বেশ্যা। কি করে তাকে লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভব? এ যে বামন হয়ে চাঁদ ধরবার প্রয়াস! শহরের বড় বড় ধনী যুবক যার জন্য লালায়িত, কপর্দকশূন্য ভিখারি হাফেজ তাকে কি করে পাবে? তার ঐ বাসনা বড় কম নয়! যাহা হউক, সে স্থির করলে কিছু অর্থ জমাতে পারলেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

"পরদিন থেকে হাফেজ রোজ যা ভিক্ষা পায় তাতে তার নিজেরই পেট না ভরলেও তা থেকে অর্ধেক রেখে দেয়। সেই অর্ধেক ভিক্ষান্ন এবং গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বিক্রি করে যা পয়সা হয়, রোজ জমাতে থাকে। আশা—এইভাবে কিছু কিছু পয়সা জমিয়ে কিছু টাকা হলে তাকে লাভ করতে পারবে।

"অর্ধাশনক্লিষ্ট হাফেজ আর একটি বড় মজার কাজ করত। সে রোজ শেষ রাত্রে সেই বারবনিতার বাড়ির কাজ কর্ম—ঘর-ঝাঁট, বাসন-মাজা, জল-তোলা প্রভৃতি সকলের অজ্ঞাতে সেরে পালিয়ে যেত। ঝিয়েরা সকালে উঠে তাদের কাজ করবার কিছুই নেই দেখে আশ্চর্য হয়ে ভাবত, কে এসব কাজ করে চলে যায়? কয়েকদিন ঐ ভাবে কেটে গেল, গৃহকর্ত্রী মনে মনে ভাবতে লাগল, যে ব্যক্তি লুকিয়ে আমার গৃহকর্ম করে দিয়ে যায় সে তো চোর নয়। নিশ্চয় তার কোন উদ্দেশ্য আছে। যাই হোক, দেখতে হবে কে সে। মনে মনে এইরূপ স্থির করে একদিন গৃহস্বামিনী পরিচারিকাদের হুকুম দিল, 'আজ তোমরা রাত্রে নিদ্রার ভাণ করে পড়ে থাক, আমিও জেগে থাকব, কে আসে ধরতে হবে।' স্ত্রীলোকটি আরও বললে, 'আগে তাকে ধরো না, কাজকর্ম করে যখন পালাবে, সেই সময় ধরে আমাকে ডাকবে। কিন্তু সাবধান তার প্রতি যেন কোনও নিষ্ঠুর আচরণ করা না হয়।'

"ঐ মজার চোরকে ধরবার জন্য সকলেই রাত্রে আড়ি পেতে রইল, কখন সেই নিষ্কাম পরহিতব্রতী চোরটি আসেন। যথা সময়ে বেশ্যা-প্রেমোন্মত্ত চোর মহাশয় এসে তার যাবতীয় কাজকর্ম সেরে ভোরের বেলায় যখন পালাবে, এমন সময় যার জন্য সে দিনান্তে আধ-পেটা খেয়ে বাকি অর্ধেক সঞ্চয় করছিল, যাকে সে নিজের প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসত, সেই স্ত্রীলোক তার সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে হাফেজ একেবারে নিশ্চল।

"সেই পরোপকারী ভিক্ষুকের রুক্ষ কেশ, ছিন্ন মলিন বসন দেখে গৃহস্বামিনী দয়াপরবশ হয়ে তার দাসদাসীদের হুকুম দিল, তাকে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে স্নান, ছিন্ন মলিন বসন ছাড়িয়ে নূতন বস্ত্র পরিধান ও উত্তম ভোজ্যে সৎকারান্তে তার ঘরে নিয়ে যেতে। অনশন-ক্লিষ্ট চির বুভুক্ষু ভিখারি হাফেজ জীবনে যা কখন ভোগ করেনি এমন সব বস্তু আস্বাদন করে সে আজ আনন্দে আটখানা।

স্নান-আহারান্তে যথা সময়ে প্রেমিক হাফেজকে তার প্রেমাস্পদের ঘরে উত্তম পালঙ্কে বসান হইলে গৃহকর্ত্রী এসে তাকে বললে, 'তুমি কেন রোজ আমার গৃহকর্ম লুকিয়ে করে যেতে, এ বিষয়ে এবং তোমার পরিচয় আমি সন্ধ্যার পর এসে নেব। এখন তুমি এই ঘরে সুখে বিশ্রাম কর।'

''আজ সন্ধ্যায় হাফেজের চির অভীপ্সিত মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এই আনন্দে সে ভরপুর। একাকী ঘরে বসে কত রকম ভাবছে, আর মাঝে মাঝে বেলার দিকে চেয়ে দেখছে। দিনটা আজ তার অতিশয় দীর্ঘ মনে হচ্ছে। কখন সন্ধ্যা হবে, কখন সন্ধ্যা হবে, এই ভাবনায় তার চিত্ত ব্যাকুল। পোড়া সন্ধ্যা আর হয় না, সূর্য আর ডোবে না। বৈকাল হতে না হতে সে বারবার ঘরের বাইরে গিয়ে পশ্চিমাকাশের দিকে দ্যাখে তপন ডুবতে আর বিলম্ব কত। এক মুহূর্ত তার এক যুগ মনে হচ্ছে। দেখতে দেখতে যথাসময়ে জীবের শুভাশুভ কর্মের সাক্ষী সূর্যদেব অস্তাচলে গেলেন। হাফেজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেই শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা কচ্ছে, কখন তাহার আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়িনী আসবে। এমন সময় এক দাসী হাফেজের ঘরে প্রদীপ জ্বেলে দিতে এল। পরিচারিকাকে প্রদীপ জ্বালাতে দেখে একনিষ্ঠ হাফেজের মনে পড়ল, সন্ধ্যা হয়েছে, তাকেও যে পীরের দরগায় চিরাগ (প্রদীপ) দিতে হবে। সে যে বহুবৎসর ধরে নিত্য নিষ্ঠার সহিত পীরের কাছে প্রতি সন্ধ্যায় চিরাগ দিয়ে আসছে। আজ কি তার ব্যতিক্রম হবে? না, কখনই না। এই কথা স্মরণমাত্র শ্রদ্ধাপরায়ণ একনিষ্ঠ পীরভক্ত হাফেজ তৎক্ষণাৎ তার সেই ইষ্ট-বস্তু, ভোগ্য-বস্তু, যার জন্য সে এতদিন লালায়িত, যার জন্য সে আধ পেটা খেয়ে পয়সা জমাত, সব ফেলে ছুটে পালাল পীরের কাছে বাতি দিতে। বাতি দেবার পর দেখতে পেলে, দুজন ফকির গেলাসে করে মদ খাচ্ছে। তাকেও ফকির মদ দিতে গেলে সে রেগে বললে, 'বেল্লিক, আমি মুসলমান, শরাব খাব?'

''তাদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও হাফেজ শরাব না খাওয়াতে ফকির গেলাসটি মাটিতে ফেলে দিলেন। গেলাস ভেঙে গেল, কিন্তু কোনও তরল পদার্থ দেখতে পাওয়া গেল না। তাইতে হাফেজের মনে কি এক ভাবের উদয় হলো। সে তাদের কাছে মদ চাইলে, তারা আর দিলে না। বললে, 'তোমায় শেষ পেয়ালা দিতে গেছলাম, তুমি নিলে না, এখন আর পাবে না।' হাফেজ অনেক অনুনয় বিনয় করাতে, তারা বললে, 'যেখানে গেলাস ভেঙেছে ঐ স্থানটা চাটলে কিছু পেতে পার।' তাদের কথায় বিশ্বাস করে সেই স্থানটা একটু চাটতেই সে তৎক্ষণাৎ ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেল। তার ভোগ পিপাসা চিরতরে দূর হলো।

''এদিকে সেই বেশ্যা স্ত্রীলোকটি সন্ধ্যার সময় হাফেজকে ঘরে দেখতে না পেয়ে তার সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করতে করতে তার কাছে গিয়ে দেখে, ভিক্ষুকের দুই চক্ষু দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হচ্ছে। সে প্রেমোন্মত্ত। ভাববিহ্বল প্রেমিক হাফেজ ইসারায় তাকেও ঐ স্থান চাটতে বললে। তাই করায় সেও প্রেমোন্মত্ত হয়ে গেল। তার

জীবনের গতি ফিরে গেল। ক্ষণিক সাধুসঙ্গে বেশ্যা নব জীবন লাভ করলে ও ভগবদারাধনায় ডুবে গেল।

"প্রেমিক হাফেজও তারপর থেকে নিজের কুটীরে বসে আল্লার নাম করত এবং দিনান্তে একবার ভিক্ষায় ও পীরের কাছে প্রদীপ দিতে বেরুত। তাকে সেই সময় যত রাজ্যের খোলামকুচি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসতে দেখা যেত, তা ছাড়া আর কোথাও যেতে তাকে বড় দেখা যেত না। এই ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটতে লাগল। একবার তার প্রতিবাসীরা কয়েকদিন যাবৎ তাকে ভিক্ষায় বেরুতে না দেখে তার ঘরে ঢুকে দ্যাখে একনিষ্ঠ সাধক ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছে পরলোকে। পড়ে আছে তার মৃতদেহ, একটি ছেঁড়া মাদুর, জলের পাত্র, ভাঙা সানকি ও তার প্রধান সম্পত্তি সাতটা বড় বড় মাটির জালা। জালা ভরতি যত রাজ্যের খোলামকুচি! প্রত্যেক দিন ঐ ভিক্ষুক সাধকের মনে যে যে ভাবের উদয় হত, দেওয়ানা (প্রেমোন্মত্ত) হাফেজ খোলামকুচিতে খোলামকুচি দিয়ে সেই সব লিখে জালার মধ্যে ফেলে রাখত। তার দেহান্তে সেই লেখাগুলি পণ্ডিতদের দ্বারা উদ্ধৃত হয়ে দেওয়ানা হাফেজ নামে এক জগদ্বিখ্যাত বই ছাপা হলো।"

গঙ্গাধর মহারাজ—(মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি)"দেখুন, একনিষ্ঠাই হাফেজকে কত বিপদ থেকে উদ্ধার করলে। মেয়ে মানুষের ফাঁদ—বিষম ফাঁদ। এর চেয়েও বিপদ, এর চেয়েও বন্ধন আর কি আছে? ঐ একনিষ্ঠা ছিল বলেই হাফেজের অত বড় বিপদ ও অত বড় বন্ধন কেটে গেল।"

বলরাম-মন্দিরে প্রেমানন্দ ও অখণ্ডানন্দ প্রসঙ্গে

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বীরেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীমার বাড়ি (উদ্বোধন অফিস) হইতে বলরাম-মন্দিরে আসিলেন। উদ্দেশ্য পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে করিয়া বেলুড় মঠে লইয়া যাওয়া।

বলরাম-মন্দির ঠাকুরের কলিকাতাস্থ প্রধান কেল্লা। ঠাকুর বলতেন, বলরামের অন্ন বড় পবিত্র। তাঁহার পুত্র রামকৃষ্ণবাবু—পিতার উপযুক্ত সন্তান। তিনিও ঠাকুরের পরম ভক্ত। পিতার ন্যায় সাধুসেবায় তাঁর হস্ত ও দ্বার সদা উন্মুক্ত।

বাবুরাম মহারাজ—(গঙ্গাধর মহারাজের প্রতি) "কেমন আছ?"

গঙ্গাধর মহারাজ—"কেমন আর থাকব দাদা, ওষুধ পথ্যি করছি। এই এক রকম কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।"

বাবুরাম মহারাজ—"তুমি এতদিন হলো এখানে এসেছ একবার মঠে গেলে না? স্বামীজী মঠ করে গেলেন আর তুমি কলিকাতায় এসেছ, মঠে গেলে না?"

গঙ্গাধর মহারাজ—"মা জোর করে সারগাছি থেকে আমাকে চিকিৎসার জন্য আনিয়েছেন। কবিরাজ লাগিয়েছেন। এখানে নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছি, পথ্যি করছি। এখন কোথাও গেলে মা বকবেন। আর তোমরা তো বৈরিগী, তোমরা ওখানে মাছের ঝোল পথ্যি দেবে কি?" (হাস্য)

বাবুরাম মহারাজ—"আচ্ছা চল, দেখবে, তোমায় পথ্যি দিতে পারি কি না।"

গঙ্গাধর মহারাজ—"এখন কোথাও গিয়েছি জানলে মা বকবেন। শরীরটা ঠিক হতে দাও না।"

বাবুরাম মহারাজ কিছুতেই ছাড়িলেন না। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ি করিয়া বরাহনগর কুটীঘাটে আসিলেন। পথে বরাহনগর বাজার হতে তাঁহার জন্য তাজা কই মাছ লইলেন। সঙ্গী মালদহের ভক্তটি মাছের দাম দিলেন।

কল্পতরুমূলে স্বামী প্রেমানন্দ ও অখণ্ডানন্দ

বৈকাল বেলা বাবুরাম মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে করিয়া শ্রীশ্রীস্বামীজীর সমাধি-মন্দিরের নিকট বেলগাছ তলায় বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলতলায় কয়েকটা বেল পড়িয়াছিল তাহা হইতে এক একটি করিয়া কুড়াইয়া লইয়া বাবুরাম মহারাজ "কালী কল্পতরুমূলে আয় মন বেড়াতে যাবি। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি ফল কুড়ায়ে পাবি" গানটি গাহিতে লাগিলেন এবং একটি বেল গঙ্গাধর মহারাজের হাতে দিয়া বলিলেন, "কেমন একটি পেলে?" আবার একটি হাতে দিয়া বলিলেন, "কেমন, দুটি পেলে?" এভাবে দুজনে যেন দুটি ভাই মহানন্দে খেলা করিতেছেন মনে হইতে লাগিল।

বঙ্গের ম্যাটসিনি স্বামী অখণ্ডানন্দ

আজ শুক্রবার, ১৭ মার্চ, ১৯১৬, খ্রীঃ। মঠ-বাড়ির দক্ষিণ দিকের রকে পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী ধর্মানন্দ, ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচৈতন্য, ঋষি মহারাজ ও অপর কয়েকটি ব্রহ্মচারী সাধু দক্ষিণাস্যে বসিয়া আছেন।

সম্মুখে প্রকাণ্ড ময়দান। যেখানে সাধারণ উৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুরের তৈলচিত্রের সম্মুখে তাঁবু খাটাইয়া কীর্তনাদি হয়। তখন ঐ ময়দানে কোনও মন্দির নির্মিত হয় নাই। কারণ যাঁহাদের অস্থি বুকে ধারণ করিয়া ঐ মন্দিরগুলি স্মৃতি রক্ষা করিতেছে তখন তাঁহারা সকলেই জগদ্ধিতায় দেহ ধারণ করিয়া আছেন। উক্ত রকের বামদিকে পোস্তা ; তারপরই পতিতপাবনী গঙ্গা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচর অখণ্ডানন্দ স্বামী আজ বৈকালে নিজ জীবনের কয়েকটি ঘটনা জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতেছেন—

"গত ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে আমার এক রকম অবস্থা হয়েছিল। সেই বৎসর মুর্শিদাবাদ, পুরী, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে খুব দুর্ভিক্ষ। আমার মনে হতো, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র-নারায়ণ ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছে, মরছে, আর আমি অন্নের গ্রাস মুখে তুলি কি বলে! তখন সারগাছি আশ্রমে (মুর্শিদাবাদ) দুজন মাস্টার, একজন ছুতার, একজন তাঁতি, ও দুজন চাকর, এই ছয়জন ছিল। ওদের সব মাহিনা দিয়ে রেখেছিলুম। অনেকগুলি অনাথ বালক হয়েছিল। আমি বুভুক্ষু দরিদ্রনারায়ণদের জন্য অন্ন ত্যাগ করব এই মনে করে একাদিক্রমে চার পাঁচ মাস শুধু শাক পাতা সিদ্ধ খেয়ে পড়েছিলুম। মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি আমাকে ভাত খাবার জন্য কত অনুরোধ করেছিলেন। আমি তাঁদের কোন কথা শুনি নি। তাঁরা বললেন, 'আপনার ঘাড়ে এই আশ্রম রয়েছে। আপনি এরকম করে আত্মহত্যা করলে আশ্রম চলবে কি করে?'

[ইতালি যখন পরপদদলিত, দুর্ভিক্ষে সমস্ত দেশ হাহাকার করছে, সেই সময় ম্যাটসিনি নিজে কালো জামা পরে থাকতেন। মুখে রুটি তুলতে পারতেন না। অনবরত তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ত। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'যতদিন না আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীনতা লাভ করে, দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, ততদিন এই কালো জামা পরে থাকব।' আর বলতেন, 'আমি রুটির টুকরো মুখে তুলতে যাই, দেখি হাজার হাজার অন্নক্লিষ্ট আমার স্বদেশী ভাই একখানা রুটির জন্য আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।' এই সব মনে হওয়াতে তিনি আর আহার করতে পারতেন না। তাঁর চোখ ফেটে গরম জল বেরুত।]

"শুধু শাকপাতা সিদ্ধ খেয়ে কয়েক মাস থাকবার পর শরীর ক্রমশই দুর্বল হতে লাগল। পরে হাঁটুর এক একটা শির গোনা যেতে লাগল। গায়ে চুলকনার মতন বেরুল। বহরমপুরের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য মুখুয্যে মহাশয় এই কথা শুনে, সারগাছি আশ্রমে এসে আমাকে অনেক বোঝালেন। শেষে বললেন, এর পর আপনার সর্বাঙ্গে খোস পাঁচড়া বেরুবে। তখন আপনি অস্থির হয়ে পড়বেন, আর ওরকম অনাহারে থাকবেন না। আমারও তখন খোসের মতন একটু একটু দেখা দিয়েছিল।

"আমার ঐ অবস্থা অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) মুর্শিদাবাদ দুর্ভিক্ষ রিলিফ কার্য করতে গিয়ে দেখেছেন। তিনিও আমাকে অনেক বোঝালেন। আমি স্বীকৃত হলুম না। পরে যখন তিনি বললেন যে, তাহলে আমার আপনার আশ্রমে থেকে সেবা কার্য করা চলবে না। আপনি ঠাকুরের সন্তান খাবেন না, আর আমি খাব, এ হতে পারে না, আমি মঠে ফিরে চললুম।

"অমূল্য মহারাজ দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য দিতে এসেছেন। এখানে থেকে আমার সামনে সাহায্য দেবেন এবং এখানকার দরিদ্রদের কষ্ট কিছু নিবারণ হবে বুঝে তাঁর কথায় আমি কিছু দিন পরে তাঁর সঙ্গে আবার ভাত খেতে থাকি। ভাত সহ্য হতো না, অল্প অল্প করে খেতে আরম্ভ করি।"

কলিকাতায় প্লেগ

ইংরাজী ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং বহুলোক ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এমন পল্লী বা গৃহ নাই যেখানে ঐ রোগে কেহ না কেহ আক্রান্ত বা মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত না হইয়াছেন। উহা ক্রমশ সংক্রামক আকার ধারণ করায় কলিকাতাবাসীর মনে সাতিশয় আতঙ্কের সৃষ্টি করে। যাঁহার যেখানে সুবিধা, তিনি সপরিবারে সেই স্থানে পলাইতেছেন। প্রতি মুখে আতঙ্ক, রেলগাড়ি অবিরাম ছুটাছুটি করিয়া যাত্রী চালান দিতেছে। পরক্ষণেই লোক ভর্তি হইতেছে। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। কোন দল দুই তিন দিন অপেক্ষা করিয়াও গাড়িতে চড়িতে পারিতেছেন না। সেই বিপদ ও আতঙ্কের সময়কার স্বীয় জীবনের দুই একটি ঘটনা পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ বলিতেছেন।

গঙ্গাধর মহারাজ—"ইংরাজী ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব চলেছে। বিবেকানন্দ স্বামীজী ঐ সংবাদ পেয়ে দার্জিলিং থেকে নেমে আসেন। তখন মঠ নীলাম্বর মুখুয্যের বাগানে। বেলুড় মঠের জমি সবে কেনা হয়েছে। প্লেগের ভয়ে কলিকাতার লোক যে যেখানে পারছে পালাচ্ছে। আর গভর্ণমেন্ট জোর করে সকলকে প্লেগের টীকা দেওয়াচ্ছে। তাইতে অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করত সরকার জোর করে ঐ টীকা দিয়ে প্লেগের বীজ আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাই গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে যে ব্যক্তি টীকা দিতে আসত, কখন কখন উত্তম মধ্যম প্রহার খেত।

"সেই সময় স্বামীজী আমাদের সকলকে ডেকে বললেন, 'দেখ, আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, অমৃতের সন্তান, আমাদের মরণ ভয় তুচ্ছ করে এই প্লেগ রুগীদের সেবা করতে হবে। এদের সেবা করতে, ঔষধাদি দিতে, চিকিৎসা করাতে আমাদের ঐ নূতন মঠের জমিও যদি বিক্রয় করতে এবং আমাদের জীবন বিসর্জন দিতে হয় তাহাতেও আমরা প্রস্তুত। আমাদের front এ cannon, left এ cannon, right এ cannon. আমাদের সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে বিপদ! এই বিপদের ভেতর দিয়ে আমাদের কর্তব্য করে যেতে হবে, প্রশ্ন করা চলবে না। Ours to do and die, ours not to question why. এস, আমরা সকলে তাঁর নামে মৃত্যু-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হই। আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, অমৃতের সন্তান, আমাদের কিসের ভয়?'

"স্বামীজী হিন্দিতে ও বাঙলায় কয়েক হাজার বিজ্ঞাপন ছাপালেন। তাতে লেখা ছিল—

'মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ।
জয় জগদম্বা, জয় জগদম্বা, জয় জগদম্বা।'

'এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমরা কতিপয় বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী, যাঁহারা গভর্ণমেন্ট বা অন্য কোনও হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা করেন না তাঁহাদের

সম্পূর্ণ স্ব স্ব ধর্মভাব রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সেবার জন্য ক্যাম্প বা অস্থায়ী হাসপাতাল খুলিয়াছি।' বিজ্ঞাপনে আরও লেখা হইল—'টীকা দেওয়ায় প্লেগ আরও বাড়িতেছে, এ গুজব মিথ্যা, কারণ গভর্ণমেন্ট কখনই প্রজানাশ করিতে পারেন না।' ইত্যাদি।

"আমি নিজে হিন্দি অনুবাদ করে ও ছাপিয়ে স্বয়ংই বিলি করবার জন্য কলিকাতায় যাই। আমার কাছে প্লেগের কি কাগজ আছে শুনে নেবার জন্য হ্যারিসন রোডে এত লোক আমাকে ঘিরে ফেললে যে, চিপসে মরে যাবার যোগাড় হলুম। এই দেখে, আমি এক এক তাড়া কাগজ এক এক দোকানের দিকে ফেলতে লাগলুম। লোকে সেই দিকে ছুটল। আমি একটু অগ্রসর হলুম। আবার সেই রকম বিস্তর লোক আমায় ঘিরে ফেললে। আমিও এক তাড়া বিজ্ঞাপন অন্য দিকে ছুঁড়ে দিলুম। ঐ রকম করতে করতে শেষে ট্যাঁকশালের কাছে এলুম। সেখানে এক ভক্তের সঙ্গে আলাপ ছিল। কাগজ টাগজ না ফেলে শৌচে গেলাম—তখন আমার পেটের অসুখ। শৌচাদি শেষ করে ট্যাঁকশালের নিচে এক টুলে বসে বসে ঐ বিজ্ঞাপন বিলি করলুম।

"দ্বিতীয় দিনে ঐখানে বসেই বিলি করছি। বেলা প্রায় দেড়টার সময় একজনকে বসিয়ে রেখে উপরে মুখ ধুতে গেছি, চার পাঁচ ব্যাটা গুণ্ডা নিচে থেকে আমার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। সেই ভক্তটি আমায় নিচে যেতে বারণ ও শীঘ্র ঘরের ভেতর ঢুকে যেতে বললেন। সেই ভক্ত ও আর আর লোক নিচে সেই গুণ্ডা ও সমবেত লোকদের, যারা আমাকে মারবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, অনেক বুঝিয়ে বললেন যে, টীকা নিলে কোন দোষ হয় না বরং ভালই হয়, ইঁনি সরকারের লোক নন ইত্যাদি। ঐরকম বুঝিয়ে তাদের তো ভাগিয়ে দিয়ে আমাকে ট্রামে চড়িয়ে দিলেন।

"আমি ঐ কাগজ নিয়ে আবার কালীঘাটে বিলি করতে গেলুম। আদি-গঙ্গা থেকে মায়ের মন্দিরে যেতে বড় রাস্তার উপর যে ডালির দোকান আছে সেই দোকানে বসে কাগজ বিলি করতে লাগলুম। কাগজে প্লেগের ও টীকার কথা আছে শুনে, আমার কাছে অনেক ভীড় হলো। শেষে দু-একজন হালদার এসে আমাকে বললেন, রস যে বড় গড়িয়ে পড়ছে দেখছি, নিয়ে আয় তো একটা লাঠি। ব্যাটা গেরুয়া পরে ভণ্ডামি করছে। কত টাকা গভর্ণমেন্টের খাচ্ছ? এই ভাবে সব বিদ্রূপ করতে লাগল।

"দেখ বুদ্ধি, যাদের ভালর জন্যেই নিজেদের অর্থ সামর্থ শারীরিক অসুস্থতা তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থভাবে বিজ্ঞাপন বিলি ও রোগীর সেবা করছি তাদেরই এই বিদ্রূপ!!

"একজন পুলিসের জমাদার আমার মতের দিকে ছিল। সে আমার কাছে এসে বললে, মশাই, শীঘ্র আমার সঙ্গে চলে আসুন নইলে এখনি এরা আপনাকে পিটবে। আজ-কাল টীকার ভয়ে সকলেই খেপেছে, আপনি আমার সঙ্গে শীঘ্র চলে আসুন। এই কথা বলে আমাকে থানায় নিয়ে গেল। তারপর সন্ধ্যার কিছু পরে জনতা কমলে আমি পালিয়ে বলরাম বাবুর বাড়ি এলুম।"

স্বামী অখণ্ডানন্দের তিব্বত-ভ্রমণ কাহিনী

ইংরাজী ১৮ মার্চ, ১৯১৬ খ্রীঃ। আজ সন্ধ্যার সময় মঠের দক্ষিণ প্রান্তে অতিথিশালার (গেষ্ট হাউস) ছাদের উপর পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ বসিয়া আছেন। কাছে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচৈতন্য, গোকুল মহারাজ ও অবিনাশ মহারাজ উপবিষ্ট।

তখনও ঐ বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। ঘরের কড়ি বরগায় রং দেওয়া হইতেছে। বারান্দা ও ছাদের উপরের ঘর এখনও বালির পলেস্তারা করিতে বাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতি আরম্ভ হইল। ঝাঁঝরের সুমধুর ধ্বনি ছাদের উপর হইতে শোনা যাইতেছে আরাত্রিকান্তে স্তব পাঠ হইল। শুক্লপক্ষ জ্যোৎস্নারাত্রি।

গোকুল মহারাজ—(পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া) ''আপনি তিব্বত টিব্বত অনেক ঘুরেছেন সেখানকার কথা কিছু বলুন।''

গঙ্গাধর মহারাজ—''বঙ্গদেশের সোজাসুজি উত্তরে তিব্বতের রাজধানী লাসা, পাঞ্জাবের উত্তরে মধ্য তিব্বত। আমি মধ্য তিব্বতে গেছলুম। লাসার দিকে যেতে চেষ্টা করেছিলুম, দিলে না যেতে। তাই পশ্চিমে লাডাক লেক দিয়ে গেছলুম। লাডাক লেক কাশ্মীর রাজ্যেরই অন্তর্গত।

''তখন অগ্রহায়ণ মাস। বেজায় শীত। জল গায়ে লাগলে তখনই জমে যায়। সেখানকার নিয়ম, বিদেশী কেউ গেলেই গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করলুম। আমাকে সাধু দেখে এবং ইংরাজী, বাঙলা, সংস্কৃত ও কিছু কিছু তিব্বতীয় ভাষা জানি বলে আমায় খাতির করে তাঁর বাড়িতেই সম্মানিত অতিথিরূপে রাখলেন। কাপড় চোপড়েরও যা কিছু অভাব ছিল আমায় দিলেন।

''ওখানকার যুক্ত-কমিশনার একজন সাহেব। তাঁর একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁকে ফার্সী ও উর্দু পড়াতেন। সে সময় সাহেব ওখানে ছিলেন না। শীতকালে শিয়ালকোটে থাকেন। গভর্ণর মুসলমান, ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে বড় ভয় করেন। তাই তিনি যুক্ত-কমিশনারকে তোষামোদ করেন। মুসলমান গভর্ণরও ঐ শিক্ষকের মুঠোর ভেতর। তাঁর কথা সাহেব শোনেন কিনা!

''যা হোক আমি গভর্ণরের খুব যত্নে আছি। দু-তিন দিন পরে তিনি আমাকে বললেন, 'আপনাকে আর আমি আমার বাড়িতে রাখতে পারব না, আপনি কোনও পান্থশালায় আজই চলে যান।' আমি তাঁর ওখান থেকে চলে গেলুম। আমার সঙ্গে সাতজন পরিব্রাজক ছিলেন, তাঁরা কাশ্মীর যাবেন। গভর্ণর আমাকেও তাঁদের সঙ্গে কাশ্মীর যেতে বললেন, কারণ এত ঠাণ্ডায় ধর্মশালায় থাকলে মরে যেতে পারি। শুনলুম, শিক্ষকটি গভর্ণরকে শাসিয়ে বলেছিলেন, 'ইনি

একজন বিদেশী লোক, নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এঁর আছে, বাইরে সাধু সেজে থাকেন, নইলে দু-তিন বৎসর ধরে এত কষ্ট স্বীকার করে কেন ইনি তিব্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?'

"ঐ সময় ওখান থেকে ১৮ ক্রোশ দূরে লামাদের এক সভা ছিল। গভর্ণর আগের দিন লোকজন নিয়ে ঐ সভায় গেছলেন। সহকারী-গভর্ণর আমার উপর সদয় ছিলেন। তিনি একটা ভাল ঘোড়ায় চড়িয়ে আমাকে সঙ্গে করে লামাদের সেই সভায় নিয়ে গেলেন। সকালে বেরিয়ে প্রায় সন্ধ্যার সময়ে সেখানে পৌঁছলুম। গভর্ণর আমাকে দেখে তাঁর সহকারীর উপর চটে গিয়ে তাঁকে খুব ধমক দিতে লাগলেন। আমাকে একটা বেতো ঘোড়া দিয়ে সে মুহূর্তে সেখান থেকে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। কি করি, তাদের রাজত্ব; সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটা বেতো ঘোড়ায় চড়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে ৩৬ মাইল ফিরে যেতে এত কষ্ট হলো তা আর বলবার নয়।

"আমার সঙ্গীদের উপদেশ মতো গভর্ণরের কাছ থেকে ছাড়পত্র (Passport) নিলুম। ছাড়পত্র হাতে দেবার সময় গভর্ণর একটু মুচকে হাসলেন, কেন কিছু বুঝতে পারলুম না। এখান থেকে তিব্বতীয় পরিব্রাজকদের সঙ্গে কাশ্মীর যাত্রা করলুম। রাস্তায় এত ঠাণ্ডা যে, রুটি ছিঁড়তে পারি না, হাত অসাড় মেরে গেছে। আমি ফিরে যেতে চাইলে তারা মানা করে বললে, তা হলে গভর্ণর আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। তারা আমাকে তুলাভরা পায়জামা প্রভৃতি গরম কাপড় দিল এবং আগুন টাগুন করে দিতে লাগল। এই রকমে ঘোড়ায় চড়ে শ্রীনগরের প্রায় কাছে এসেছি; তখন একজন কাশ্মীরী পণ্ডিত ঘোড়ায় চড়ে আমার সামনে এসে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমিও যথাযথ বললুম। তিনি আমাকে রাজার এক পরওয়ানা দেখিয়ে বললেন, 'কালকে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করবেন।' আমার সঙ্গীরা সব চটীতে ঢুকল। চটীর বাইরে এক ফাঁড়ি। ফাঁড়ির জমাদার আমাকে খুব খাতির করে ফাঁড়ির আলাদা একটা ঘরে থাকতে বললে।

"পরদিন সকালে আমায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, 'রাজার কোনও দোষ নেই। রেসিডেন্টের হুকুম মতো আপনাকে আটক করা হয়েছে। আপনাকে অনেক দিন আগে থেকে খোঁজা হচ্ছিল কিন্তু তখন পাই নি। রেসিডেন্টকে তার করছি উত্তর না আসা পর্যন্ত বড় কোতোয়ালিতে থাকুন। আপনার যা যা প্রয়োজন সব পুলিশ থেকে পাবেন।'

"আমি থানায় নজরবন্দি আছি। আমার বয়স তখন ২৫/২৬ বৎসর। দু-তিন বৎসর তিব্বতের দিকে ঘুরে শরীর খুব ভাল হয়েছিল। আমার অল্প বয়স ও সুচেহারা দেখে, ঐ বড় কোতোয়ালির একজন চৌকিদারের স্ত্রীর আমার জন্য খুব দুঃখ। সে তার স্বামীকে দুঃখ করে বলত, 'এ ছেলেমানুষ রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত নয়। একে এরকম কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়।' আমি পুলিশের কোনও জিনিস খেতুম না বলে সেই স্ত্রীলোকটি আমায় খাওয়াত। দু-তিন দিন এমনি করে কেটে গেল। তারপর ফের আমাকে গভর্ণরের কাছে নিয়ে গেল।

"গভর্ণর আমাকে বললেন, 'রেসিডেন্টের হুকুম এসেছে, আপনি সমস্ত স্বাধীনতা পাবেন কেবল আমাদের নজরবন্দিতে থাকতে হবে।' আমার জন্য পুলিশ ইন্‌সপেক্টরকে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ও লেখাপড়ার সরঞ্জাম দেবার হুকুম হলো। আমি বললুম, 'কালই আমাকে আলাদা বাড়ি না দিলে আমি "হাঙ্গার স্ট্রাইক" করব; না খেয়ে তোমাদের রাজত্বে মরব।' সেই দিন সেই স্ত্রীলোকের ভিক্ষাই গ্রহণ করলুম। পরদিন আলাদা বাড়ি দেবার কথা কিন্তু কোনই উচ্চবাচ্য নেই, লেখবার সাজ-সরঞ্জামও দিলে না। দুই সের করে রোজ দুধের বন্দোবস্ত ছিল তাহাও দিত না; চায়ের জন্য একটু দুধ দিত। আমিও অনশনে রইলুম যতদিন না আলাদা বাড়ি করে দেবে ততদিন ওদের কিছুই খাব না। মায়ি কাঁদতে লাগল, জেদ করে বলতে লাগল, 'আমার দেওয়া রুটি খাও, ওদের নাইবা খেলে।' আমি বললুম, 'তোমার স্বামী ৯ টাকা মাত্র বেতন পায়, ছাপোষা, দু-তিন দিন তোমাদেরই রুটি খেলুম আর খাব না। আর আমরা এমন সাধু নই যে, গরীবের উপর অন্যায় অত্যাচার করে তাদের অন্নে ভাগ বসাব।' আমি কিছুতেই খেলুম না—বজ্রের ন্যায় কঠিন হলুম। তিব্বত থেকে সঙ্গে করে ভাল চা এনেছিলুম। শুধু সেই র (raw) চা খেয়ে পাঁচদিন পড়ে রইলুম তবুও কিছুতেই খেলুম না। পাঁচ দিনের দিন রাত্রে ক্ষুধার জ্বালায় ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল, বিছানায় ছটফট করছি। সেই স্ত্রীলোকটির একটি ছোট ছেলে রোজ আমার পা টা টিপে দিতে আসত। সেদিন আমার কষ্ট দেখে বললে, মহারাজ, 'আজ আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে দেখছি। একটা পাই পয়সা আমার কাছে আছে—আপেল কিনে আনছি আপনি খান।' ছেলেটি দুটো বড় আপেল কিনে নিয়ে এল। তাই খেয়ে কিছু তাজা হয়ে বললুম, এই দুটো আপেল খেয়ে এখনও আমি পাঁচ দিন আবার যুঝতে পারি।

"পরদিন সকালে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট আমার ঘরে ঢুকতেই মুখে যা এল গালাগাল দিলুম। ব্যাটা চুপ মেরে রইল। তারপর আমাকে নৌকায় চড়িয়ে গভর্ণরের কাছে নিয়ে যাবার জন্য ভাত খেতে দিলে। আমি রেগে বললুম, কিছুতেই খাব না, যতদিন না আমায় আলাদা বাড়ি দেওয়া হয়। সে বললে, 'আপনি অনশনে আছেন গভর্ণর তা শুনে আপনাকে খাইয়ে তবে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হুকুম দিয়েছেন। বলেছেন, না খেলে দেখা করব না।' অগত্যা নৌকাতেই খেয়ে তার সঙ্গে দেখা করে সব বললুম।

"তারপর রাজার এক সমাধিস্থলের উপর স্মৃতিরক্ষার্থ মন্দির ও সাধুদের থাকবার জন্য ঘর তৈয়ারি করা ছিল— সেইখানে আমার থাকবার বন্দোবস্ত হলো। মন্দিরে রোজ ভোগ হতো সেই ভোগ আমাকে দিত। রোজ পুলিশ থেকে চৌকিদার এসে খবর নিত। কোথাও যেতে হলে পুলিশে খবর দিয়ে তবে আমাকে যেতে হতো।

"সেইখানে বাগবাজারের এ.টি.মিত্র, কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি ঋষিবর মুখুয্যের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, 'আপনার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কি না আমি জানি না। আপনাকে সাহায্য করতে গিয়ে শেষে আমরা কি চাকরি খোয়াব?' তবে লেখবার সরঞ্জাম

প্রভৃতি দিয়ে তিনি সাহায্য করলেন। সেই কাগজপত্র পেয়ে আমি বরাহনগর মঠে শশি মহারাজকে পত্র লিখি।

"স্বামীজী তখন গাজীপুরে পওহারী বাবার কাছে। আমার এই সংবাদ পেয়েই মঠের তরফ থেকে কলকাতা হতে শশি মহারাজ, গিরিশবাবু ও কাশী থেকে প্রমদাদাস মিত্র প্রভৃতি আরও দু-এক নামজাদা লোক কাশ্মীরের রাজনৈতিক এজেন্টের কাছে চিঠি লিখে জানালেন, ইনি আমাদের মঠের সাধু, ধর্ম ছাড়া এঁর আর অন্য উদ্দেশ্য কিছুই নেই।

"আমার ইচ্ছা হয়েছিল আর্যদের আদিনিবাস মধ্য এশিয়ায় একবার ঘুরে আসি। কিন্তু স্বামীজী আমায় ফিরে আসতে বার বার লিখলেন।

"সেই সময় পুলিশ আমায় খবর দিলে শিয়ালকোটে রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে, অথবা ১৫/২০ দিন শ্রীনগরেই অপেক্ষা করতে। এপ্রিল মাসেই রেসিডেণ্ট এইখানে আসবেন। আমি তাই রইলুম। কিছুদিন পরে আমার কাশ্মীর দেখবার ইচ্ছা হলো। কিছু দূরে দু-একটা মন্দির আছে আমি তাই দেখতে গেছি। ইতিমধ্যে রেসিডেন্ট সাহেব শ্রীনগরে এসেই আমার কাছে লোক পাঠিয়েছেন। আমার ঘরে চাবি দেওয়া দেখে, আমায় খুঁজতে চারিদিকে লোক ছুটেছে। আর একজন সেপাই আমার ঘরের সামনে বসে। বাড়ির কাছ বরাবর ফিরে আসবার সময় আমি ঐ-কথা শুনে রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

"কাছারিতে মাননীয় ঋষিবর বাবুর সঙ্গে দেখা, আমাকে দেখেই তিনি বললেন, 'শীঘ্রই রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করুন, আপনাকে তিনি খুঁজছেন।' আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তিনি বললেন, 'আপনার যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয় তা আমি পত্র দ্বারা কলিকাতা, কাশী প্রভৃতি স্থান হতে জেনেছি। আপনার গুরুভাইও চিঠি লিখেছেন। আপনি এখন স্বাধীন; কলিকাতায় ফিরে যেতে পারেন। অথবা যদি ইচ্ছা করেন গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে আপনাকে তিব্বতে দূত (Ambassador) করে পাঠাব, আপনার সমস্ত খরচাদি রাজসরকার বহন করবে। আর আপনার ভবিষ্যৎও (future prospect) খুবই উজ্জ্বল হবে—তা হলে বলুন, তাই যোগাড় করি।' আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলুম। বললুম, 'আমি সাধু হয়েছি, ভগবানের নাম করে দিন কাটাই, রাজনৈতিক কোনও কাজ আমার দ্বারা হবে না।' তখন রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, 'তিব্বত-কাহিনী আপনার কিছু লেখা আছে?' আমি বললুম, 'কিছুই না।' শেষে বললেন, 'আপনার যতদূর মনে আছে বলুন।' আমি বলে যেতে লাগলুম, একজন লেখক লিখে নিতে লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে অনেক অফিসার বলতে লাগল, 'মহাশয়, এ পদ কেন ছাড়লেন? আমরা অনেক চেষ্টা করেও এ পদ পাই না।' আমি তাদের উত্তর দিলুম, তোমরা কি সামান্য টাকার জন্য আমাকে গুপ্তচর হতে বল? কারও উপকার করতে পারি না আবার একটা স্বাধীন দেশের সর্বনাশ করব?"

ঠিক এই সময় মিসেস সেভিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং Hindu University সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাবার্তা গঙ্গাধর মহারাজের সহিত হইতে লাগিল—

Mrs. Sevier : " I Went close to the University land but I did not land there. What would be the teachings and ideas of the Hindu University? Would it be according to oriental teachings and ideas?"

Gangadhar Maharaj : "I asked Mr. Ashutosh Mukherji. He replied that in the long run it would be like the modern University."

Mrs. Sevier : "Why do they not urge for teaching Hindu ideas and knowledge? But the organisation must be of the West. Is it for want of money that the organisers are taking help from the Govt., and thereby placing themselves in their hands?"

Gangadhar Maharaj : "No, they could have amassed money without the help of the Government but the Government will not leave the control of the University into our hands. Justice Mukherji and few others say that it will turn at last to one of our modern University, having no oriental teachings at all."

Mrs. Sevier : "No help of getting it wholly into your own hands?"
Gangadhar Maharaj : "No."
Mrs. Sevier : "O God"

স্বামী বিবেকানন্দের অন্বেষণে স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দ—(ব্রহ্মচারীদিগের প্রতি) "শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় একাকী দেশ-ভ্রমণে বাহির হন। সেই সময় আমি কি প্রকারে তাঁর পেছু পেছু ধাবা করতুম তার গল্প বলি শোন ঃ

জয়পুরে স্বামী অখণ্ডানন্দ

"জয়পুর, আলওয়ার, আজমীর প্রভৃতি স্থানে স্বামীজী যাবেন, এ সংবাদ আমি কোন সূত্রে জানতে পারি। তাঁর প্রতি আমার খুব ভালবাসা ছিল। তাই তাঁর সঙ্গ নেবার জন্য জয়পুর যাই। সেখানে এক দাদুরপন্থীর আখড়ায় উঠি। সেই আখড়ার কাছে মস্ত বড় একটি ফটকওয়ালা লালবাড়ি। ভগবানের এমনি মহিমা যে, সেই সময় হঠাৎ আমার মনে হলো সেই বড় বাড়িতেই

বোধ হয় স্বামীজীর সন্ধান পাব। ভাবলুম শ্রীগোপীনাথজীউর বিগ্রহ দর্শন করে ফেরবার সময় তথায় খোঁজ নোব। এই মনে ক্করে গোপীনাথ দর্শনে গেলুম। দর্শনান্তে তথায় খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, দোতলায় জনৈক ভদ্রলোক, হাতে সোনার বালা পরে বসে আছেন। আমি উপরে উঠে তাঁর সামনে যেতেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে নমস্কার করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোন বাঙালী সন্ন্যাসী এখানে আছেন কি?'

ভদ্রলোক—'হাঁ, এক বাঙালী সন্ন্যাসী এখানে ছিলেন। আমি তাঁর সন্ধান বলে দিতে পারি। আপনি তাঁর কে?'

অখণ্ডানন্দ—'গুরুভাই'।

"গুরুভাই বলাতেই তিনি আমাকে যথেষ্ট খাতির ও সঙ্গে করে, যে বাড়িটা আমি আগে আঁচ করেছিলুম, সেই লাল রঙের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং কয়েকদিন থাকবার জন্য আমাকে অনুরোধ করাতে রইলুম। আমার জামা ছিল না, তিনি তৈয়ারি করাইয়া দিলেন। তাঁর নাম চতুর সিং, ক্ষেত্রী মহারাজার জ্ঞাতি। তাঁর বড় ভাই এখন বোধ হয় সেই রাজার council-এর মেম্বার হয়েছেন। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তিনি সন্ধান নিয়ে বললেন, স্বামীজী (বিবেকানন্দ) ক্ষেত্রীর রাজাকে শিষ্য করে, আজমীর গেছেন।

পুষ্করে স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত সাক্ষাৎ

"আমি জয়পুরে গোবিন্দজী দর্শন করে আজমীর গেলুম। সেখানে এসে শুনলুম, স্বামীজী আমেদাবাদ গেছেন। তখন আমি পুষ্করাভিমুখে রওনা হলুম। পুষ্করে সারদার (স্বামী ত্রিগুণাতীত) সহিত দেখা হলো। তার সঙ্গে আজমীরে ফিরে এলুম। আজমীরে সারদা অসুস্থ হওয়ায় তার সেবা করতে লাগলুম। এইরূপে পক্ষাধিক কাল তথায় থাকতে হলো।

"আরোগ্য লাভ করে সারদা খাণ্ডোয়া যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করল। কিন্তু আমরা উভয়েই কপর্দকশূন্য। আমি নিজের জন্য চিন্তিত ছিলাম না, কিন্তু সারদা, অসুস্থ পদব্রজে যাইতে অক্ষম। চতুর সিং-এর ভগ্নিপতি মৌর সিং খাণ্ডোয়া যাবার টিকিটের মূল্য দিলে, সারদাকে খাণ্ডোয়া পাঠিয়ে দিলুম। সারদা চলে গেলে ভাবতে লাগলুম, পদব্রজে গেলে স্বামীজীকে ধরা যাবে না। কিন্তু আমি কপর্দকশূন্য কি উপায়ে ট্রেনে যাব? দৈবাৎ এক ভক্ত ভেরাওয়ালের (Verawal) টিকিট কিনে দেন।

"ভেরাওয়ালে গিয়ে শুনলুম, স্বামীজী এখানে এসেছিলেন বটে কিন্তু এখন নাই। আমি সেখান থেকে আবু পর্বতে যাত্রা করলুম। সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানসকল দেখে আমেদাবাদে

আসলুম। আমেদাবাদে সন্ধান নিয়ে জানলুম স্বামীজী এখানে নাই, তিনি ওয়াঢোয়ান গিয়াছেন। আমি সেখান থেকে বরোদা ও ভারোচ হয়ে নর্মদা সঙ্গমে স্নান করি।

"নর্মদা সঙ্গম থেকে বরোদায় ফিরে এক সদ্‌গোপের বাড়িতে রাত্রি যাপন করি। পরদিন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা বলতে লাগলেন, আপনি দণ্ডী সন্ন্যাসী হয়ে শূদ্রের বাড়িতে কেন আছেন? তাঁরা এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে যথেষ্ট আদর করে রাখলেন। কিন্তু সে বাসা যা অপরিষ্কার! থাকা কষ্টকর। সে বাসায় না উঠে আমি বরোদা রাজ্যের উচ্চপদস্থ এক বাঙালীর বাসায় উঠি। তিনি বিশেষ আদর যত্ন করে আমাকে তাঁর বাসায় রাখলেন। আমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর জাতিভেদ নাই শুনে তাঁরই বাসায় আহারের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর পাচক ছিল গোয়াবাসী খ্রীস্টান। পাচকটির পরিচ্ছদ ও আচার দেখে আমার আহারে প্রবৃত্তি হলো না। তিনি বললেন, 'আপনার এখন জাতিভেদ রয়েছে'। আমি বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা থাকে তো আছে।'

"বরোদায় কয়েকদিন অবস্থান করে স্বামীজীর সন্ধানে বেরুলুম। ওয়াঢোয়ান জংশনে নেমে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, 'বিবেকানন্দ নামে এক মহা পণ্ডিত সাধু জুনাগড়ে আছেন।' তখন আমি জুনাগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলুম। সেখানে এসে জানলুম স্বামীজী পোরবন্দর হয়ে দ্বারকা যাত্রা করেছেন। জুনাগড়ের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে প্রভাস তীর্থে যাই। প্রভাস দর্শনান্তে স্টীমার যোগে দ্বারকায় গেলুম। ওমা, দ্বারকায় গিয়ে শুনি স্বামীজী বেটদ্বারকায় যাত্রা করেছেন। দ্বারকায় একরাত্রি বাস করে, পরদিন বেটদ্বারকায় গেলুম। সেখানে সংবাদ নিয়ে জানলুম কচ্ছভূজের রাজা তাঁকে কচ্ছভূজ যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। স্বামীজী কচ্ছ মাণ্ডবীতে গেছেন। আমিও সেই দিকে যাত্রা করলুম।"

ডাকাতের হাতে স্বামী অখণ্ডানন্দ

"তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য আমার আগ্রহ এমন বেড়েছে যে, ঐ সব স্থানে কিছু দেখা-শোনা না করেই মাণ্ডবী যাত্রা করলুম। কি আশ্চর্য, সেখানে গিয়ে শুনলুম তিনি নারায়ণ সরোবরের দিকে গেছেন। সেখানে রাত্রিটা কাটিয়ে নারায়ণ সরোবরের অভিমুখে যাচ্ছি, পথে ডাকাতের হাতে পড়ি। হঠাৎ তিন চার ব্যাটা ডাকাত এসে আমায় পিছন থেকে এমন জোরে ধাক্কা মারলে যে আমি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেলুম। তাদের হাতে সরু লাঠি ছিল। দু চার ঘা লাঠিও মারলে। আমি তাদের ভাষায় বলতে লাগলুম, 'মেড়ে গনো, মেড়ে গনো, মুকে মার যো মূ।' আমার যা আছে সব তোমাদের দিচ্ছি, আমায় মেরো না। এইরকম করে চেঁচিয়ে তাদের ভাষায় বলছি, সেই সময় এক বেটা ষণ্ডা ডাকাত আমায় চিৎ করে ফেললে। চিৎ হয়েই দেখি, এক ব্যাটার হাতে খাপ খোলা শাণিত তরওয়াল লক লক করে নাড়াচ্ছে, ঐ না দেখে আমার

প্রাণ শুকিয়ে গেল। আগে তাদের হাতে তরওয়াল ছিল কি না জানতেই পারি নি; লাঠি আছে বলেই জানি। যা হোক আমি তো একান্ত মনে ঠাকুরকে স্মরণ করতে ও ডাকাতদের মাঝে মাঝে বলতে লাগলুম, আমায় মেরো না, যা আছে আমার নিকট, তোমরা সব লও। আমার কাছে ছিল তুলোর জামা, আলখাল্লা, চণ্ডী, গীতা প্রভৃতি খানকতক বই একটা থলিতে আর একটা বাঘের চামড়ার আসন। যা কিছু ছিল আমি সমস্ত গা থেকে খুলে সেই ভীমাকৃতি ডাকাতদের সামনে ফেলতেই, দু তিন ব্যাটা ডাকাত সেই জামার পকেটে হাত দিয়ে ও থলি ঝেড়ে টাকা পয়সা খুঁজতে লাগল, কিন্তু কিছুই পেলে না।

"রাস্তায় আমার এক ভক্ত জুটেছিল—যেন তালপাতার সেপাই—আমার পিছনে পিছনে আসছিল। আমার ঐ অবস্থা ও ডাকাতদের হাতে খাপখোলা তরওয়াল দেখে সেই ক্ষীণকায় অনুচরটি আধ হাত জিব বার করে রাস্তায় পড়ে গেল। তার কাঁধে অতি জীর্ণ এক ঝুলি, তার মধ্যে ছিল কিছু বাসন-কোসন, আর বোধ হয়, কিছু পয়সা টয়সা। বেচারীর ঐ অবস্থা দেখে, আমি যম-দূতের মতন ডাকাতদের —যারা একটা সামান্য টাকার জন্য পথিকদের খুন করতে প্রস্তুত—বললুম, 'দেখ, বাপু, আমি পয়সা টয়সা নিইনা এবং রাখিও না। আমার এই জামা কাপড় যা কিছু আছে, সব তোমরা নিয়ে যাও; তোমাদের কাজে লাগবে, শীতে গায়ে দেবে। কিন্তু ঐ লোকটার কিছু নিও না; ও বড় গরীব।' তখন সেই তালপাতার সেপাইটি কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল, 'হুজুর, ও (অখণ্ডানন্দ) ফকির, ওর কিছু অভাব হবে না, আবার মিলে যাবে। আমি বড় গরীব, আমার কাছ থেকে কিছু নিও না, আমার কিছু নেই।'"

স্বামী অখণ্ডানন্দ—(মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি) "দেখুন, তখনও তার পয়সার জন্য কি আসক্তি!

"যাই হোক, তার ছেঁড়া ঝুলি দেখে ডাকাতরা সেদিকে বড় কেউ নজর করলে না। কেবল আমার জামা ভাল করে খুঁজতে লাগল কিন্তু কিছুই পেলে না। ডাকাতদের মধ্যে একজন আমায় বললে, তোমার হাত দুটো পেছন কর। উদ্দেশ্য, হাত দুটো পিছন দিকে পিছমোড়া করে বাঁধে। আমি স্বীকার হলুম না। বরং একজনের গায়ে হাত দিয়ে বললুম, 'পিছনে পিঠের দিকে আমার হাত ওরকম করে বেঁধে রেখে আর কি হবে। আমার যা কিছু আছে সব তোমরা নিয়ে যাও।' আমি তার গায়ে হাত দিতেই সে ব্যাটা এমনি জোরে আমার হাত ছুঁড়ে ফেললে যে আমার কাঁধের জয়েন্টটা (সন্ধিস্থল) কন্‌কন্‌ করতে লাগল। যখন ঐ রকম কথাবার্তা চলছিল, তখন তারা তরওয়াল খাপের ভিতর পুরে রেখেছে।

"ঐ ডাকাতদের সর্দার এক পাশে বসেছিল। তার গায়ে একটা কাল কোট, মাথায় লাল পাগড়ি ও হাতে একটি লাঠি ছিল। যখন আমার কাছ থেকে কিছুই পেলে না দেখলে তখন সেই সর্দার উঠে আমার পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে পায়ের ধূলা নিয়ে বললে, জামা টামা আমরা নোব

না, আপনি গায়ে দিয়ে নিন। যাবার সময় একজন ডাকাত আমাকে শাসিয়ে গেল—'খবরদার, একথা কাহারও কাছে বল না, প্রাণে মারা যাবে।' এই কথা বলেই তারা তীরবেগে চলে গেল। আমি তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

"নারায়ণ সরোবরের পথে এইভাবে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার হয়ে পুনরায় স্বামীজীর অন্বেষণে চললুম। সঙ্গে সেই ভক্তটিও আছে। নারায়ণ সরোবরে পৌঁছে সেখানকার মোহান্ত মহারাজের মুখে শুনলুম স্বামীজী তথা হতে পূর্বদিন আশাপুরীতে গেছেন। আশাপুরী একটি দেবীর স্থান। দস্যু আক্রমণে ও স্বামীজীর অদর্শনে নৈরাশ্যে সেখানে আমার জ্বর হওয়ায় সরোবরে আর স্নান করলুম না। মুখে মাথায় জল দিয়ে আচমন করে আশাপুরীর দিকে যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম।

"নারায়ণ সরোবর দেখতে যে সুন্দর তা নয়। বিষ্ণু মূর্তিই প্রধান, অন্যান্য মূর্তিও আছে। সেখানে আমার বিপদের কথা শুনে মোহান্ত মহারাজ বললেন, 'মহারাজ, আপনি কেন একলা আসতে গেলেন? আপনার স্বামীজী তো ঘোড়া ও সওয়ার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।' আমি স্বামীজীর উদ্দেশ্যে আশাপুরীতে যাব শুনে, তিনি ঘোড়া ও সেপাই আমার সঙ্গে দিলেন।

"সেখান থেকে আমরা রাত্রে আশাপুরী অভিমুখে যাত্রা করলুম—সেখানে রাত্রে চলাচলই প্রথা। জ্যোৎস্না রাত্রি, তাতে আমাতে যাচ্ছি, পথে মধ্যরাত্রে এক বিস্তীর্ণ মাঠে সঙ্গী সেপাইটা থমকে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায়, সে বলে উঠল, 'কোই খারাপ আদমি ছিপাতা হ্যায়।' তাই শুনে আমার প্রাণ তো শুকিয়ে গেল। ভাবনা হলো, যার জন্য এত ছোটাছুটি সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় স্বামীজীর দর্শন বুঝি আর হলো না, এই মাঠেই বা ডাকাতের হাতে প্রাণ যায়! মনে মনে ব্যাকুল হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম জপ করতে লাগলুম।

"পথপ্রদর্শক ও রক্ষক সেপাইটা আমায় অভয় দিয়ে বলতে লাগল, 'মহারাজ, আপনি সাধু, আপনাকে খুলে বলি। আমরা খুব অল্প মাহিনা ও এক মুঠা চানা পাই। তাতে আমাদের সংসার চলে না। কাজেই এই যে ডাকাত টাকাত দেখছেন, ওরা সবাই রাজার চাকর, আমিও ঐ ডাকাতদের একজন। এই নিয়ম আছে, আমাদের মধ্যে যদি কেহ কাহাকেও সঙ্গে লয়, তাকে কেউ কিছু বলবে না।'

"এই রকম দুজনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছি। শেষ রাত্রে এক গ্রামের ধর্মশালায় পৌঁছে আমরা দুজনে কিছু আহার করে নিলুম। আহারান্তে সেপাই বললে, 'স্বামীজী, আপনি সাধুলোক সঙ্গে রয়েছেন, তাই আমাদের ঘোড়া কিছু খেতে পেলে না, তা না হলে ঐ যে চারিদিকে বেড়া দেওয়া ঘাস দেখছেন, ঐ ঘাস চুরি করে ঘোড়াকে খাওয়াতুম এবং আরও কিছু রোজগারও করতুম। আপনি সাধু আপনার সঙ্গে এসে ওসব কাজ করব না, তবে ফেরবার সময় লুঠতে লুঠতে ফিরব।'

"কচ্ছীরা খুব সাধু ভক্ত। কোন গ্রামে সাধু সন্ন্যাসী আসলে পথ হতে গৃহস্থরা কাড়াকাড়ি করে, এ বলে আমার বাড়ি চলুন, ও বলে আমার বাড়ি চলুন। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খুব আদর যত্ন করে খাওয়ায়।

"কখনো উটে কখনো ঘোড়ায়, সিপাই সঙ্গে আমরা আশাপুরীতে পৌঁছলুম। মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল এই ভেবে যে, এখানে নিশ্চয় স্বামীজীর দর্শন পাব। জয়পুর থেকে পিছু নিতে নিতে কত বিপদ আপদ ও শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ করে বহুদূর থেকে আসছি, এখানে স্বামীজীর দর্শন পাব। মনে খুব আনন্দ। কিন্তু ওমা, এখানে সন্ধান নিয়ে জানলুম তিনি মাণ্ডবীতে চলে গেছেন। তাইতে প্রথমটা এত হতাশ হয়ে পড়েছিলুম তা বলে জানাবার নয়। কিন্তু নিরুদ্যম হবার পাত্র আমি নই। সেখান থেকে আবার মাণ্ডবীর দিকে ছুটলুম।

স্বামী বিবেকানন্দ ও কেশর বাঈয়ের কথা

"মাণ্ডবীতে পৌঁছে গোকুলে গোঁসাই-এর শিষ্য কেশর বাঈ-এর বাড়িতে স্বামীজীকে ধরলুম। জয়পুর থেকে আরম্ভ করে আজমীর, আমেদাবাদ, ভেরাওয়াল, ওয়াঢোয়ান, জুনাগড়, পোরবন্দর, দ্বারকা, বেটদ্বারকা, কচ্ছ মাণ্ডবী, নারায়ণ সরোবর, আশাপুরী প্রভৃতি স্থানে পেছু ধাবা করতে করতে এই সমুদ্র কিনারা কচ্ছ প্রদেশে (Cutch) স্বামীজীকে দেড় বৎসর পরে দেখে, আমার যে কি অপার আনন্দ হতে লাগল তা আর ভাষায় কি বলব! তিনিও হঠাৎ সেখানে আমায় দেখে বিস্মিত ও যারপরনাই আনন্দিত হয়ে বললেন, 'কি রে, গঙ্গা, তুই এখানে কি করে এলি?' আমি জয়পুর থেকে পেছু ধাবা করতে করতে যে ভাবে এখানে এসে পড়লুম, সব কথা বললুম তাঁকে। ডাকাতে ধরার কথা শুনে বললেন, 'এ-রকম দুঃসাহসের কাজ করে? কেন তুই ন্যায়াধীশের (Magistrate) কাছ থেকে ঘোড়া সেপাই চেয়ে নিলিনি?'

"পরে আমাকে বললেন, 'কেশর বাঈ-এর কাছে কৃষ্ণকথা একলা উপভোগ করতে পারছিলুম না। মনে হচ্ছিল, তারকদা কি বাবুরাম কেউ যদি থাকত কাছে খুব রগড় হতো। যাহা হোক, তুই এসেছিস—ছেলেমানুষ—এদের কৃষ্ণকথার রগড়টা শোন। এই বলে তিনি তাদের রগড়ের কথা শোনাতে লাগলেন—হেসে হেসে পেটে খিল ধরে গেল। ...তাদের প্রধান স্থান আজমীর টাজমীর হবে। ...কেশর বাঈ খুব দানশীলা।

স্বামী বিবেকানন্দ ও রেসিডেন্ট সাহেব

"স্বামীজীর আন্তরিক ইচ্ছা তিনি একাকী থাকেন। আমি তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিলুম না। তিনি পরদিনই ভূজে চলে গেলেন। আমি ২/৩ দিন পরে ভূজে রওনা হলাম। সেখানে রাজার দেওয়ানের বাড়িতে উঠলুম। স্বামীজী একদিন ওখানকার রেসিডেন্ট (Resident) সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি স্বামীজীকে তাঁর গুপ্ত মনোভাব জানিয়ে বললেন, 'আমি ওখানে

রেল পাততে চাই।' কিন্তু স্বামীজী মত না দেওয়ায় সাহেবের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ভূজে দু-দিন থেকে আমরা উভয়ে মাণ্ডবীতে কয়েকদিন বাস করার পর তিনি পোরবন্দর অভিমুখে যাত্রা করলেন। আমি পাঁচ সাত দিন পরে পোরবন্দরে যাই, সেখানে আবার দুজনের সাক্ষাৎ হয়। পোরবন্দর থেকে আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি হলো। তিনি জুনাগড়ে এবং আমি কাঠিয়াওয়াড় যাত্রা করলুম।

(প্রেমানন্দ—দ্বিতীয় ভাগ ; রামকৃষ্ণ সাধন মন্দির)

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ স্মরণে

শ্রী—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা-সহচর অন্তরঙ্গ সন্তানগণের অভয়চরণ স্পর্শে ও করুণাবিগলিত আশিস-ধারায় বহু বহু দুঃখী মানব নৈরাশ্য-বেদনায়, শোক-দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের কৃপা-স্পর্শে শত ভুল-ভ্রান্তি—অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও জীবন আশা-আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দরিদ্র-আর্ত-দুঃখীজনের স্নেহময় 'বাবা'—পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের চরণ-প্রান্তে আসিয়া বহুজন নানা দুঃখ-সংঘাতের মধ্যে জীবনের গতি-পথে শক্তি-সাহস লাভ করিয়া বলিষ্ঠ হৃদয়ে অগ্রসর হইয়াছে। মহুলায় দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে অন্নাভাবের হাহাকারের মধ্যে রিক্তহস্তে সেবাকার্যের প্রারম্ভিক অবস্থায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস শাক-পাতা খাইয়া জীবনধারণের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন তাঁহার বিশাল হৃদয়বত্তা, আর্ত-মানবের সেবায় চরম আত্মোৎসর্গ।

বিহার ভূমিকম্পে শত শত লোক গৃহহীন, অন্নহীন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য দিয়া সেবাকার্য আরম্ভ করিয়েছেন—অন্নদান, গৃহাদি নির্মাণ, পীড়িতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে। দুর্গত মানবের সেবা কিভাবে চলিতেছে তাহা স্বয়ং পরিদর্শন করিবার জন্য বাবা বিহারে গমন করিবেন।

বেলুড় মঠে স্বামীজীর পাশের ঘরে বাবা সমাসীন—সম্মুখে কয়েকজন সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। এমন সময়ে জনৈক ব্রহ্মচারী আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। সেই প্রশান্ত-গম্ভীর, শুভ্র-কেশ শিব-পুরুষ ভূমিকম্প প্রসঙ্গে বলিতেছেন—আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বে সমস্ত ঘরখানি নিস্তব্ধ। বিহারবাসীরা নিদারুণ কষ্ট পাইতেছে এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল—চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া গেল। কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিতেছেন—"ঠাকুরের কাছে কেঁদে-কেঁদে জানালুম—ঠাকুর আমি বৃদ্ধ, স্থবির হয়ে পড়েছি; তা-না হলে আজ নিজ হাতে তাদের সেবা করতুম।" ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণপরে প্রশমিত হইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ওঃ! কি তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! আমার মনে হইল তিনি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তল পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লইতেছেন। প্রথম প্রশ্ন—"কি চাও?" আমি মনের বাসনা জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন—"অমনি দীক্ষা দিলেই হলো—তোমায় জানি না, তুমি কোথায় থাক, কি কর, সম্পূর্ণ

অজ্ঞাত। না, তা হবে না। তুমি যাও।" আমার মানসিক অবস্থা জানিতে পারিয়া ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন স্বামীজীর বই পড়িয়াছি কিনা এবং কি বুঝিয়াছি। আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল—পবিত্রতা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও ধৈর্য। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, হাঁ! ঠিক!" তিনি আমার মুখের দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোন্ ঠাকুরকে ভালবাস?" এই কথা বলিয়াই তাঁহার সেবকদের অন্তরালে যাইতে বলিলেন। আমি কিন্তু তৎপূর্বেই বলিয়া ফেলিয়াছি—ঠাকুরকেই ভালবাসি। তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আর যেতে হবে না। ও আমাদের ঠাকুরকেই ভালবাসে।" পরদিনেই তিনি কৃপা করিলেন।

দীক্ষান্তে প্রণাম করিবার সময় তিনি আমার মাথাটা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন এবং সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ রহিলেন। মাথাটা অত্যন্ত ভারি বোধ হইতে লাগিল। মাথা তুলিলে কমণ্ডলু হইতে গঙ্গাবারি আমার হাতে ঢালিয়া দিয়া পান করিতে বলিলেন। পরদিন বিদায় গ্রহণকালে সস্নেহে বলিলেন—"আমি তো তোমার জন্যে ঠাকুরের কাছে জানিয়েছি। তাঁকে খুব ডাকবে—খুব ভালবাসবে। এখন তোমার হাত। সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থপাঠ ও মানবের সেবা কায়মনোবাক্যে করবে—দান করবে সাধ্যমত। সাধুসঙ্গ প্রথম। এক সাধুসঙ্গ করলেই অপরগুলি সব এসে যাবে।" ইহার কয়েকদিন পরে তিনি পত্রযোগে উপদেশ দেন—"আন্তরিকতার সহিত ঠাকুরকে ডাকিয়া যাও। তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।"

জয়রামবাটী-কামারপুকুর হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাবাকে দর্শন করিতে গিয়াছি বেলুড় মঠে। তিনি তখন স্বামীজীর ঘরের সম্মুখে বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান। প্রণামান্তে জয়রামবাটী-কামারপুকুর গমনের কথা বলিলাম। তিনি খুব আনন্দের সহিত বলিলেন—"তুমি ধন্য—দীক্ষার পরেই দক্ষিণেশ্বর-জয়রামবাটী-কামারপুকুর ঘুরে এলে! মহাতীর্থ! তুমি ধন্য!" এই বলিয়াই তিনি আমাকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া তাঁহার বক্ষে টানিয়া লইলেন। 'মহাতীর্থ' কথাটি খুব জোর দিয়া বলিলেন। ঠাকুরের স্বহস্তে রোপিত আমগাছ হইতে পাকা আম পাড়িয়া খাওয়ার কথায় বলিলেন—"আমিও খেয়েছি।"

সারগাছি আশ্রম হইতে বাবা বেলুড় মঠে আসিয়াছেন—শরীর অসুস্থ। শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া কপাল কাপড় দিয়া বাঁধা। শুইয়া আছেন—সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। কাতরভাবে বলিলেন—"বাবা, যে-ক-দিন বেঁচে আছি একবার একবার এসে দেখে যেও।" আমাকে অদূরে একখানি চেয়ার রাখিতে বলিলেন। রাখিবার সময় সামান্য শব্দ হইলে বলিলেন—"সব কাজ সতর্ক হয়ে করতে হয়। স্বামীজী এমন কাজ সহ্য করতে পারতেন না।"

সারগাছি আশ্রমে ঠাকুরের মহোৎসব। বহু দরিদ্রনারায়ণ আজ প্রসাদ পাইবে। বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা প্রসাদ পাইতে লাগিল। আশ্রম আজ আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। প্রসাদ পাইয়া সকলে তৃপ্তির আনন্দে হাসিমুখে

ফিরিতেছে। বাবা আজ খুব আনন্দে আছেন। মুর্শিদাবাদে অনাবৃষ্টি হেতু ভীষণ জলকষ্ট ও প্রচণ্ড গরম। মহোৎসবের পরদিনই মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। সকলকে ডাকিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বলিতেছেন—"অনেক লোক প্রসাদ পেলে। প্রভু জলকে ধরে রেখে দিয়েছিলেন—টেনে রেখে দিয়েছিলেন। মহোৎসব হয়ে গেল আর ছেড়ে দিলেন। দেখ, অন্যের খেতে দেরি হলে আমার ক্ষিধে পায়। তারা খেলে সে-ক্ষিদে চলে যায়। এখানে ঠাকুর অন্নপূর্ণারূপে আছেন।" পরে ম্যাক্সমূলারের লেখা হইতে পড়িয়া সকলকে শুনাইতে লাগিলেন। ভারত, ভারতবাসীর প্রতি ম্যাক্সমূলারের অগাধ শ্রদ্ধার কথা বলিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে চরণপ্রান্তে বসিয়া আছি। তিনি সস্নেহে বলিলেন—"যতদিন এখানে আছি সুবিধা হলেই আসবে।" পুনরায় অনাবৃষ্টি-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"দেখ, একবার এক গ্রাম্য জমিদারের বাড়িতে গেছি। প্রজারা হাহাকার করছে। জমিদার মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে। আমার শোবার ব্যবস্থা বাইরের একখানা ঘরে হয়েছিল। গভীর রাত্রে উন্মুক্ত আকাশের নিচে একখানা ভাঙা তক্তাপোষের উপর বসে সারারাত প্রণবধ্বনি করতে লাগলুম। ওঃ, সকাল থেকে কি প্রচুর বৃষ্টি! এক বৃষ্টিতেই চাষ শুরু করে দিলে। তখন সবেমাত্র মহুলার কাজ আরম্ভ করেছি—খুব গায়ত্রী করতুম। কিছুদিন পরে কি-সব দূরে হচ্চে দেখতে পেতুম। একদিন এক নেপালী গোপাল সিংকে মনি-অর্ডার করতে পাঠালুম। রাত হয়ে গেল—ফিরে আর আসে না। তখন ভাবনা হলো—চারিদিকে গভীর অন্ধকার, আমি ঘরে বসে আছি—দেখতে পাচ্চি সে এক মিস্ত্রির দোকানে একটা হুক তৈরি করাচ্চে। কিছুক্ষণ পরে হুক নিয়ে হাজির। ঠিক ঐ-রকম একটা হুক হলে আলো টাঙাবার সুবিধে হয় কিছুদিন আগে মনে মনে ভেবেছিলুম। আর একবার এক আফিংখোর বুড়োকে গ্রামান্তরে পাঠিয়েছিলুম। বৈকালে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি—পথে প্রকাণ্ড মাঠ। রাত হয়ে গেল। তখন আমার কাছে ঠাকুরের একখানি ছোট্ট ছবি ছিল। অন্ধকারে ঠাকুরের কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলুম। ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন সে এক মুড়ি-মুড়কির দোকানে আশ্রয় নিয়েছে। সে ফিরে এসে যা বল্লে সব মিলে গেল। মঠে মহারাজকে লিখলুম। মহারাজ জানালেন—ও সিদ্ধাই। তখন আবার গায়ত্রী-জপ বন্ধ করি। গায়ত্রী-জপ করতে করতে মন উদাসী হয়ে যেতো। তখন মনে হতো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে যাই, যেমন ছিলুম। কিছু ভাল লাগতো না। কি কাজ, মাথা-মুণ্ডু! আবার পরক্ষণেই ভাবতুম—ঠাকুরের কাজ এই আরম্ভ হয়েছে। যদি ছেড়ে চলে যাই সবই নষ্ট হয়ে যাবে।"

তারপর ব্রহ্মচর্য-শক্তি সম্বন্ধে বলিলেন—"ব্রহ্মচর্যের অসীম বল। ব্রহ্মচর্য অক্ষুণ্ণ থাকলে সমস্ত জগৎ তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে না। তিব্বতে দু-একবার শুনে কাজ চালাবার মত তিব্বতীভাষা শিক্ষা হয়েছিল। ১৫ দিনে তিব্বতী ভাষায় লামাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করলুম।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীতে তাঁহার বাণী-প্রসঙ্গে কথা উঠিল। বাবা বলিতে লাগিলেন—"ও লেখা ঠাকুরেরই বলা। রাত্রে শুয়ে আছি—ঠাকুর আমার হৃদয়ে থেকে বলছেন—'ওরা যখন

এত করে বলছে তখন এইটে লিখে দে-না। আমার আবার শতবার্ষিকী কি! আমি তো বিরাট, অনন্ত।' সকালে উঠে লেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে পারলুম না। বুড়ো মানুষ, হাতড়ে হাতড়ে কাগজ কলম বের করে লিখে ফেললুম। কি জানি, যদি সব কথা মনে না থাকে।"

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় আমেরিকা হইতে তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি সকলকে চিঠিখানি দেখাইতেছেন আর বলিতেছেন—"দেখ, কত বড় বড় অক্ষরে বাংলায় লিখেছে। আবার নূতন করে লেখা অভ্যাস করে লিখেছে। কি বিশ্বাস! কি শরণাগতি!"

একদিন প্রাতে প্রণাম করিয়া বসিবামাত্র তিনি বলিলেন—"দেখ বাবা, যে আদর্শের জন্যে মরতে যায়, সে মরে না। তার আদর্শই তাকে বাঁচায়।" ঐ মুহূর্তটি আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকিবে। তিনি যেন আমার প্রাণের মধ্যে কথাটি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। সেখানে আর কেহই ছিলেন না এবং অন্য কোন কথা আর বলিলেন না।

সন্ধ্যায় জনৈক সন্তানের বাধা-বিঘ্ন-কষ্টের কথা শুনিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"আহা কি কষ্ট! সদাধার—এত কষ্ট! ঠাকুর মঙ্গল করুন। দেখ, দুঃখের মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়, কুন্তী প্রার্থনা করেছিলেন—'সুখমে বাজ পড়ু'।" কথাগুলি কি করুণায় ভরা! জনৈক গুরুভ্রাতার সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করা হইতেছে।

মহাপুরুষ মহারাজের শেষ অসুখের সময় বাবা বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। তিনি বাগান বাড়িতে রহিয়াছেন।

কোন যুবক দুশ্চিকিৎস্য ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাবাকে পত্রে অসুখের কথা জানাইবার পর হঠাৎ আশ্চর্যরূপে সারিয়া উঠিলেন। বাবা কিন্তু সে সংবাদ পান নাই। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"—কেমন আছে? তাই চিঠি পেয়ে সন্ধ্যারতির পর কেঁদে-কেঁদে ঠাকুরের কাছে বললুম—ঠাকুর, তুমি আমাকে নাও,—কে ভালো করে দাও।"

(উদ্বোধন : ৪১ বর্ষ ১১ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি-সঞ্চয়ন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

বোধ হয় ১৯১৫ সালের শীতকালে পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে প্রথম বেলুড় মঠে দেখি। তখন আমাদের সমসাময়িক ঈশ্বর, বিরূপাক্ষ, অবনী, পরেশ, গোঁসাই, বিমল, দ্বিজেন, বলাই, শংকর, ললিত, বীরেন, দেবেন, মুক্তি, মাখন প্রভৃতি এসে পড়েছে।

বাবুরাম মহারাজ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন দেখবার জন্য—বললেন, "কত শিক্ষিত ছেলেপিলে এসেছে স্বামীজীর কাজ করবার জন্য। এতকাল আমরা শ্মশান জাগিয়ে বসে আছি, কারণ তিনি বলে গেছেন—'আমার ছেলেরা দেখবি পরে সব আসবে'। আমি এক এক সময় ভাবতুম, কই কোন চিহ্নই তো দেখি না।"

গঙ্গাধর মহারাজকে দেখলুম—গায়ে গরম আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ী, খুব বড় বড় চোখ। আরতির পর পশ্চিম দিকের বারান্দায় চায়ের টেবিলের কাছে বসে বাবুরাম মহারাজ বললেন, "এই সব ছেলে দেখ, এরা সব বেদ-বেদান্ত পড়বার জন্য কত উদ্‌গ্রীব, আর তুই গিয়ে কতকগুলো অনাথ বালক নিয়ে সাধারণ পল্লীতে দিন কাটাচ্ছিস। আয়, এখানে এসে এইবার পাট বসা, আমরাও ছুটি পাই।"

গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, "তা কি হয়? স্বামীজীতো গরীবদেরই জন্য বেশি পরিশ্রম করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষের প্রাণ পল্লীতেই'। আর মুসলমানদের উদার না করতে পারলে ভারতের উন্নতির সমূহ বিপদ। আমি আর কি করছি বল, গরীব পল্লীবাসীদের কিণ্ডারগার্টেন উপায়ে লেখাপড়া, আর তাঁত, কাঠের কাজ, সেলাই প্রভৃতি কুটিরশিল্প শেখাবার চেষ্টা করছি। যে-সব সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী এখন আছে এবং ভবিষ্যতে আসবে তাদের জন্য বড় লাইব্রেরি করে রেখেছি। হাতে-নাতে অন্নসমস্যা মেটাবার জন্য চাষবাস ও গোপালনের ব্যবস্থা করেছি। স্বামীজী তো এই ভাবেই দেশকে স্বাবলম্বী করে তোলবার ইচ্ছা করেছিলেন। যে পলাশীর মাঠে ভারত স্বাধীনতা হারালো, সেই মাঠেই আমি ঠাকুর-স্বামীজীকে বসালুম, যদি তাঁদের কৃপায় আবার দেশ জাগে। আমার বোধ হয়, ঐখান থেকেই ভবিষ্যতে এক বিরাট কর্মতরঙ্গ উঠবে, নইলে এত জায়গা থাকতে ঠাকুর আমাকে পলাশীর মাঠের ধারে সারগাছি নিয়ে গিয়ে বসালেন কেন?"

বাবুরাম মহারাজ বললেন, "কিন্তু তোমার যে বাঙালীর শরীর, এধারে অঙ্গ শিথিল হয়ে এলো, কর্মীও তো খুব কমই জুটলো, যারা আসছে তারাও আবার বেশিদিন খাটতে পারে না,

ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর মুসলমানরা কি-ই বা তোমাকে সাহায্য করে? বরং এদের কাছে তোমার সব ভাব ঢেলে দাও, বেদবেদান্ত শেখাও, এরা সব দেশবিদেশে প্রচার করে অর্থসংগ্রহ করে নিয়ে আসুক এবং দেশের কাজে লাগাক। নইলে একলা মণীন্দ্র নন্দী তোমায় কতটুকু সাহায্য করবেন। এই দেখ, স্বামীজী কিছু টাকাকড়ি বিদেশ থেকে নিয়ে এলেন বলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে গঙ্গার ধারে বসাতে পারলেন, তাঁর ভাবপ্রচারের একটা দাঁড়াবার জায়গা হলো; নইলে আমরা যদি কেবল দেশবিদেশে ঘুরে বেড়িয়ে প্রচার করতুম তা হলে স্বামীজীর যে উদ্দেশ্য সংঘশক্তির ভেতর দিয়ে Aggressive Hinduism (প্রসারশীল হিন্দুধর্ম) কি করে হতো? এই দাঁড়াবার জায়গাটুকু হয়েছে বলে তবে তো তোমার প্লেগ-রিলিফ, কাশীর হাসপাতাল, মাদ্রাজের মঠ প্রভৃতি হলো। কিন্তু এসব করতে গেলে অনেক টাকা চাই, যা ভারতবর্ষে পাওয়া যাবে না। বিদেশীদের ধর্ম শিখিয়ে রোজগার করে আনতে হবে, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। তার জন্য কর্মী দরকার। আমি, কৃষ্ণলাল প্রভৃতি তো মূর্খের দল; এই সব প্রচারকদের শিক্ষিত ও সংঘবদ্ধ করা তোমাদের কাজ; না, তোমরা এক গাঁয়ে গিয়ে বসে রইলে। এখানে বস, রোজ বেদের, পাণিনির অধ্যাপনা কর, স্বামীজী যে বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলে গেলেন, তার কতদূর তোমরা করলে? গাঁয়ে গাঁয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ঢের লোক পাওয়া যাবে; কিন্তু বেদবেদান্ত পড়ানোর লোক কোথায় পাওয়া যাবে? এক সুধীরই একটু আধটু এদের শেখায়। আমি ওসব কিছু জানি না, আমি শুধু ঠাকুরের জীবনটাই ওদের কাছে বলি। বিশ্বের সভ্য-সমাজের নিকট তোমরা তোমাদের একমাত্র বৈদিক সাহিত্য ও সাধনা নিয়েই শিক্ষকের আসনে বসতে পার, নইলে জগতের কাছে কেবল ছাত্র হয়েই থাকতে হবে; স্বামীজী বলতেন এসব—জান তো?"

গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, "দাদা, সব যে নিজের ইচ্ছেয় করেছি তা নয়, শুধু যে লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য দেখে ঐখানে বসে পড়ি তা নয়, আর একটা শক্তি জোর করে ঘাড় ধরে করিয়েছে।" সুর করে বলতে লাগলেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।

আগে এরূপ সুর করে পড়া আমরা কখন শুনি নি। বাবুরাম মহারাজ বললেন, "যাক, ওসব কথা। তুমি একটু বেদ থেকে সুর করে এদের শোনাও।"

গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, "আমি শুক্লযজুর্বেদের পাঠ জানি। সে তো রাত্রে পড়া যাবে না। বরং গীতা থেকেই একটু বলি। আর দিন কতক পরে এরাই কত শিখবে এবং কত আবৃত্তি করবে।"

আমি বললুম—"মহারাজ একে তো আমরা সংস্কৃত একেবারেই জানি না। শ্যামাচরণের অর্থপুস্তক মুখস্থ করে কোন রকমে এন্ট্রান্স পাশ করেছি। বেদ পড়বার খুব ইচ্ছা। লোকে বলত— মাথা খারাপ, লেখাপড়া কিছুই হবে না।" মহারাজ বললেন, "সে কি কথা! আমাদের ঠাকুর হচ্ছেন বেদপুরুষ, তাঁর শরণাপন্ন হলে বেদ তোমাদের আপনি সড়গড় হয়ে যাবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ থেকে একটু বলি শোন—

একো হংস ভূবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নানঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।।"

—ঠিক বেদপাঠ না হলেও বেদধ্বনিতে এইগুলি আবৃত্তি করতে লাগলেন; আমরা অবাক হয়ে শুনতে লাগলুম। তারপর উভয়েই উপরে উঠে গেলেন।

*　　　*　　　*

পর দিন সকালে শুক্লযজুর্বেদের অষ্টাদশ অধ্যায় ঈশোপনিষৎ আবৃত্তি করে আমাদের শোনালেন। আমরা জিগ্যেস করলুম, "শুক্লযজুর্বেদ রাত্রে পাঠ করে না কেন?" তাতে বললেন—"বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুর্বেদ সূর্য হতে প্রাপ্ত হন। একবার নৈমিষারণ্যে ঋষিরা এক সভা করেন, ঠিক ভারতযুদ্ধের পর দেশের আইনকানুন ঠিক করবার জন্য। তাতে ঋষিরা এই নিয়ম করেন যে, যাঁরা সাত দিনের মধ্যে সেখানে উপস্থিত না হতে পারবেন, তাঁদের গোহত্যার পাপ হবে। বৈশম্পায়ন অতিবার্ধক্য হেতু যেতে পারেন নি; এদিকে হঠাৎ তিনি একটি গোহত্যাও করে ফেললেন। তখন শিষ্যদের ডেকে বললেন—'তোমরা আমার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর—কারণ, আমার এই বৃদ্ধবয়সে কোন কৃচ্ছ্রসাধন করবার সামর্থ্য নেই। যাজ্ঞবল্ক্য শুনে বললেন, 'এর জন্য এদের আপনি কেন ডেকেছেন—আমি একলাই এই প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম করব।' শুনে বৈশম্পায়ন বললেন, 'তোমার মতো অভিমানীকে আমি শিষ্য করি না। তোমাকে যে যজুর্বেদ দান করেছি, তা আমাকে প্রত্যর্পণ কর।'

"যাজ্ঞবল্ক্য আবৃত্তি করতে লাগলেন, আর সমস্ত যজুর্মন্ত্র তম-আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর মুখ থেকে

বেরিয়ে যেতে লাগল, এদিকে গোপনে তৈত্তিরীয়-বংশের ঋষি-বালকেরা তা শ্রবণমাত্র কণ্ঠস্থ করে যেতে লাগলেন। সেই জন্য এই যজুঃ হলো তৈত্তিরীয়-শাখা, আর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে বেরিয়েছিল বলে কৃষ্ণযজুঃ নামে খ্যাত হলো।

"যাজ্ঞবল্ক্য গুরুবাক্যে মন্ত্র বিস্মৃত হলেন, শেষে গুরু তাকে ক্ষমা করলেন এবং সরস্বতীর উপাসনা করতে বললেন। সরস্বতীর কৃপায় তাঁর মেধাশক্তি ফিরে এল, মা সরস্বতীর উপদেশে তিনি তখন সূর্যের উপাসনা দ্বারা শুক্লযজুর্বেদ প্রাপ্ত হলেন, সেই জন্য উহা রাত্রে পাঠ্য নয়। দেবীভাগবতে এর বিশেষ বিবরণ পাবে।" এই কথা বলে মহারাজ যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতীস্তুতি একটু সুর করে পাঠ করলেন—

"কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেব হততেজসম্।
গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্॥
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকাম্॥
গ্রন্থকর্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্॥
লুপ্তং সর্বং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ রাত্র্যৈ নমো নমঃ॥"

* * *

১৯১৫ সনের শীতকাল, স্থান বেলুড় মঠ, আরতির পর পশ্চিম দিকের বারাণ্ডায় চায়ের টেবিলে গঙ্গাধর মহারাজ বল্লেন, "স্বামীজী ইসলামের সামাজিক উদারতা পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, 'Islamic body with Vedantic brain' —তার মানে মুসলমান হয়ে বেদান্ত পড়া নয়। এর মানে সমাজ হবে ওদের মত উদার, ওদের সমাজে গ্রহণ আছে, যদি একবার গৃহীত হয়, তা হলে ত্যাগ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে গ্রহণ নেই—যেমন ইহুদীদের—পরন্তু ত্যাগ আছে। ফলে আমরা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি। জাঠরা, শিখরা ঠিক ঠিক উদার বটে, কিন্তু ওদের সোসাইটি খুব ছোট এবং অশিক্ষিত। তিনি মুঘল রক্তকে বলতেন, আত্মার সুরা—তলোয়ারের মতো খর, আগুনের মতো উষ্ণ। স্বামীজী শরীর ও মস্তিষ্ক ঐ দুটোর সমবায় চাইতেন। বৈদান্তিক মস্তিষ্ক চাই, সে হলো হিন্দু ব্রাহ্মণদের, কিন্তু physique নেই অর্থাৎ মস্তিষ্ক-শক্তিটাকে কাজে পরিণত করবার দেহ নেই, হাজার বছর দাসত্ব করে করে দেহে ঘুণ ধরে গেছে।

"একদিন এক স্বপ্নে দেখলুম, স্বামীজী দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ মুসলমান ফকিরের দেহ—কোমরে কেবল লোহার শিকল ও কৌপীন, হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা, তার মাথায় একটা লোহার বল, সেই বলটা থেকে ছোট ছোট শিকল ঝুলছে। সেইটে বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন। সঙ্গে চার জন শিষ্য। জিজ্ঞেস করলুম, 'এ রকম বেশ কেন?' বল্লেন, 'এ রকম শরীর নইলে কাজ করব কি? তোদের বাংলার ভেতুড়ে শরীরে সামান্য কঠোরতায় ভেঙে পড়ে। জানলি আমি বসে নেই, আমি এদের মধ্যে ঠাকুরের উদারতা ছড়াচ্ছি, তাই এদের দেশের ফকির সেজে এদের সঙ্গে মিশি।' বল্লুম, 'ওরা কারা?' এক এক করে চার জনকে দেখাতে লাগলেন, 'ইরান, তুরান, খোরাশান, আফগান।' জিজ্ঞেস করলুম, 'ওদের দিয়ে তোমার কি হবে?' বল্লেন, 'এই রকম শরীরে বেদান্ত পড়লে তবে ধারণা করতে পারবে।' জিজ্ঞেস করলুম, 'এখন তুমি কি করতে চাও?' বল্লেন, 'যাতে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এদের মিল হয়। বেদ, মহাভারত পড়ে দেখ এরা তোদেরই জাত ভাই। কিন্তু আর একটা শক্তি ক্রমাগত চেষ্টা করছে, যাতে সেটা না ঘটে ওঠে।'"

এই মিলনটা যে spiritually একেবারে অসম্ভব নয়, সেটা দেখেছি রাঢ়িখালে হিন্দু-মুসলমানের মিলনে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে, যখন স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে যান।

(উদ্বোধন : ৫৩ বর্ষ ৭ ও ৩ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী জ্ঞানদানন্দ

মহাপুরুষদিগকে প্রথম দর্শনেই ধরা-ছোঁয়া যায় না। যত বেশি মেলামেশা করা যায় ততই ক্রমে তাঁহাদের উচ্চভাব কথঞ্চিৎ বোঝা যায়।

আমি মঠে সাধুদিগের নিকট হইতে পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের সামান্য কিছু সংবাদ প্রথমে পাই; তাঁহার বাল্যজীবন, তাঁহার হিমালয়, কেদারবদরী, কাশ্মীর, তিব্বত প্রভৃতি ভ্রমণ ও রাজপুতানায় তাঁহার সেবাকার্য, মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ, সারগাছিতে অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবগত হই। তখন হইতে তাঁহাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

ঠিক কখন তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলাম মনে নাই; সম্ভবত ১৯২১ বা ১৯২২ সালে—সেদিন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভাবিয়াছিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

তিনি যখন মহারাজদের সহিত কথা বলিতেন তখন তাঁহার প্রাণখোলা হাসি, মিষ্ট বাক্য, সরলতা ও সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। কথা বলিবার সময় তাঁহার চক্ষু ও সর্বাঙ্গ দিয়া আনন্দের স্ফুরণ হইত। এমন মহাপুরুষকে দেখিয়া কার না আনন্দ হয়?

যখনই সময় হইত তখনই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সান্নিধ্যে বসিয়া তাঁহার অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিত হইতাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদসেবাদি করিয়া ধন্য হইয়াছি। ভ্রমণকালে তাঁহার রোগীর সেবা ও দয়া দাক্ষিণ্যাদির কথা শুনিয়াও মুগ্ধ হইয়াছি।

রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষজী তাঁহাকে পাইলে তাঁহার সহিত খুব আনন্দ করিতেন। তাঁহারা তাঁহার সহিত রঙ্গরসাদি করিয়া আমাদিগকেও আনন্দ দিতেন; তিনি যথার্থই একজন আনন্দময় পুরুষ ছিলেন।

তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে অনেক কিছু লেখা হইয়াছে। এখানে তাঁহার সহিত আমার যে-সকল ঘটনা অল্পবিস্তর ঘটিয়াছে সেগুলি লিখিবার চেষ্টা করিব।

আমি ১৯২৫ সালে মালদহ আশ্রমের কাজে যাই। তখনকার সে আশ্রমটি ছিল অতি ক্ষুদ্রাকার, ১০৲ টাকা তাহার ভাড়া। তাহাতে একটিমাত্র পাকাঘর ও দুইটি কুঁড়েঘর; একান্ত স্থানাভাব। সামান্য কিছু চাঁদা পাওয়া যাইত; তাহাই আর মুষ্টিভিক্ষার চাউলই ছিল আমাদের সম্বল। উহারই একটি ঘরে রাত্রে গরীব ছেলেদের নৈশ পাঠশালা বসিত, আর একটিতে

ছিল আমাদের রান্নাঘর। আশ্রমের অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল ২/৩টি স্কুল পাড়ায় পাড়ায়, একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, ছোট একটি লাইব্রেরি এবং সামান্যভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা।

একবার এক সন্ধ্যায় একজন মুসলমান ভদ্রলোক একটি শিশুকে, বয়স ২/৩ বৎসর হইবে, আশ্রমে লইয়া উপস্থিত। ২/১টি কথাবার্তার পর তিনি অকস্মাৎ উহাকে আশ্রমে রাখিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন আশ্রমের অন্যতম কর্মী ব্রহ্মচারী গঙ্গাচৈতন্য (বর্তমানে স্বামী বগলানন্দ) উহা দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ছেলেটিকে এখানে রেখে যাচ্ছেন যে।" তিনি বলিলেন, "এটি মুচির ছেলে, ইহার পিতামাতা মারা যাওয়ার পর আমি বাড়ি নিয়ে যাই এবং লালন-পালন করি, এখন এ খুবই অসুস্থ। তাই আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি এবং রেখে যাচ্ছি। আপনারা সকলের সেবা করেন, এরও করুন।" ইহা বলিয়া উক্ত ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। আমরা মহাবিপদে পড়িলাম। নিজেরা কোনমতে রান্না করিয়া দুটি খাই। ইহাকে লইয়া কি করা যাইবে? কোন উপায় তো দেখিতেছি না। তখন মনে হইল পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের কথা। ২/৩ দিন পর তাঁহাকে একখানি পত্রে ছেলেটির বিষয় সব লিখিলাম। তিনি চিঠি পাওয়া মাত্রই উহাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিলেন ; ২/৪ দিন পর ছেলেটিকে সারগাছি পাঠানো হইল। তিনি কিন্তু ছেলেটিকে পাইয়া মহা খুশি হইলেন। আমি ৫/৬ মাস পরে মঠে যাইবার পথে পূজনীয় মহারাজজীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই সেই ছেলেটিকে কোলে করিয়া আনন্দ করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, তোমার সেই ছেলেটি।" দেখিলাম সেই ছেলেটির চেহারা ভদ্রবংশের ছেলের মতো হইয়াছে। সুস্থ ও সবল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ছেলেটির কি ভাগ্য! কোথায় সে ছিল একটি মুচির ছেলে, আর আজ সে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ, মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ মহারাজের কোলে উঠিয়াছে এবং কি আদর-যত্ন পাইতেছে! পূর্বজন্মে না জানি তাহার কি সুকৃতিই ছিল!

আমি তিন দিন সেখানে ছিলাম, সেই আশ্রমের অবস্থাও ভাল নহে। সকাল ৯টার পর আমাদের এক ঠোঙা মুড়ি ও সামান্য একটু গুড় দেওয়া হইত। ইহাই ছিল সেখানের জলখাবার। বেলা ১২টায় আশ্রমের ক্ষেতের মোটা চালের ভাত ও একটু ডাল। খাইতে বসিয়া দেখিলাম ডালও জলের মতো পাতলা এবং শক্ত। তরকারী মাত্র বাগানের ডাঁটা ও বেগুন। রাত্রে ও দিনে ১২টার পর আহার এবং একইরূপ খাদ্য। তিন দিনই এই ছিল আমাদের আহার। বলা বাহুল্য, মহারাজজীও তাহাই খাইতেন, বেশির মধ্যে তাঁহার ছিল একটু চা ও একটু দুধ। এত কষ্ট করিয়াও তিনি সেখানে এমন আনন্দে কাটাইতেন দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম!

এক বৎসর পরে আবার সারগাছি যাই বেলুড় মঠ যাইবার পথে। আমি যখন আশ্রমে পৌঁছিলাম তখন দেখি মহারাজজী আমাকে দেখিয়া আগাইয়া আসিতেছেন। আমি নিকটে

আসিলে তিনি মৃত সন্তানের মাতারা যেমন আপন আত্মীয় দেখিয়া কান্নাকাটি করে, সেই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিলেন, "দেখ, জ্বরে ভুগে তোমার ছেলেটি ৫/৬ দিন শয্যাগত ছিল। তারপর হঠাৎ মারা গেল। অনেক যত্ন করেছিলাম, কিছুতেই বাঁচানো গেল না।" এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া সব শুনিলাম, পরে বলিলাম, "মহারাজজী, ছেলেটির বড় ভাগ্য। আপনি তাহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন এবং কত না ভালবাসিতেন! শরীর যাইবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরই তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়াছেন নিশ্চয়ই।" এই কথা শুনিয়া তিনি শান্ত হইলেন। মহারাজজীর এই অহেতুক ভালবাসা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

মহাপুরুষজী প্রথম যখন অসুস্থ হইয়া পড়েন, গঙ্গাধর মহারাজজী আসিয়া মহাপুরুষজীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা, ভাল হয়ে উঠুন। আপনি চলে গেলে কি হবে?" তাঁহার কান্না দেখিয়া অবাক হইলাম। গুরুভাইয়ের প্রতি গুরুভাইয়ের এত স্নেহ ও ভালবাসা! সে দৃশ্য দেখিবার মতো। তাঁহাদের পরস্পরের ভালবাসা কত গভীর ছিল তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না!

গঙ্গাধর মহারাজজী সেই সময় সোনার-বাগানের বাড়ির দক্ষিণদিকের ছোট ঘরটিতে থাকিতেন। আমি হলঘরটিতে শুইতাম। একদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমাইতেছি, তখন রাত্রি বারটা হইবে। তিনি সহসা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "নীলকণ্ঠ, ঘুমোচ্ছ? ওঠো, রাত্রে ঘুমুবে কি? হাত-মুখ ধুয়ে জপধ্যান কর।" আমিও বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ হাত পা ধুইয়া জপধ্যান করিতে বসিয়া ভাবিলাম, মহারাজজী আমাকে কত ভালবাসেন, তাই আমাকে এমনভাবে ডাকিলেন। আমি জপাদি করিবার পর ৩½টায় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ঠাকুরঘরে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে শয্যা হইতে উঠাইয়া আবার জপাদি করিতে বসিতাম। তিনি ৫/৬ দিন আমাকে এইরূপে উঠাইতেন ও জপাদি করিতে বলিতেন। এইভাবে এত রাত্রি জাগা ও দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজাসেবাদি করা আমার পক্ষে ক্রমে কষ্টকর হইয়া উঠিল। শরীর দুর্বল বোধ করিতে লাগিলাম, পূজার কাজ করিতে অসমর্থ হইলাম। তখন তাঁহাকে বলিলাম, "মহারাজ, রাত্রি জাগায় ও দিনের বেলা পূজার খাটুনিতে আমার শরীর খারাপ হইতেছে; আমি রাত্রি জাগিয়া আর জপ-ধ্যানাদি করিতে পারিতেছি না, আমাকে আর রাত্রে দয়া করিয়া ডাকিবেন না, এতে ঠাকুরসেবার ত্রুটি হচ্ছে।" তিনি বলিলেন, "কেন? আমরা তো শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় দিনরাত তাঁর সেবা করেছি। তোমরা পারবে না কেন?"

ঐ দিন রাত্রে তিনি আবার ডাকিলেন, তার পরদিন ভোরে ঐ ঘর হইতে বিছানা লইয়া অন্যত্র যাইব ঠিক করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় তিনি উহা দেখিতে পাইয়া আমার বিছানা ধরিয়া আমাকে আটকাইলেন; বলিলেন, "কোথায় যাও?" আমি বলিলাম, "রাত্রি জাগিয়া দিনে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি আর এখানে থাকিব না।" তিনি বলিলেন, "আমরা

সারা রাত সারা দিন কাজ করেছি ; আমাদের তো কষ্ট হয় নাই। তোমরা পারবে না কেন?" আমি বলিলাম, "মহারাজ, শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাদের শরীর ও মন ঐ ভাবে গঠন করে দিয়েছিলেন, তাই আপনারা এমনভাবে সেবা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমাদের শরীর ও মন এতটা করতে পারছে না। আপনি দয়া করে আমাদেরও সেইরূপ করে দিন।" তখন তিনি বলিলেন, "হাঁ, তা সত্য বটে। আচ্ছা, আর তোমাকে ডাকব না।" ভাবিলাম আমার মঙ্গলের জন্য তিনি কত না ভাবিতেছেন! অথচ দেখিতাম সারা রাত তাঁহার চোখে ঘুম নাই। সর্বদাই ঠাকুর দেবতাদের নাম করিতেছেন।

এইভাবে তাঁহার কত ভালবাসাই না পাইয়াছি! আজ শেষ বয়সে এইসব কথা মনে হইলে আনন্দে স্তব্ধ হইয়া যাই।

আর একবার—তিনি তখন মঠের অধ্যক্ষ। একট বড় পানতুয়া লইয়া সারগাছি হইতে মঠে আসিয়াছেন, ঐ পানতুয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিবার পর তাঁহাকে উহার কিছুটা প্রসাদ দিয়া আসিলাম। রোজই সময় পাইলে তাঁহার কাছে যাইতাম এবং সেবাদি করিতাম। ঐদিন যখন তাঁহার কাছে গিয়াছি তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "এই যে নীলকণ্ঠ, এই পানতুয়া আছে। খাও।" আমি বলিলাম, "আমার খিদে নেই, শরীর খারাপ।" কিন্তু তিনি বলিলেন, "না, এইটুকু খাইতে পারিবে।" আমি বারংবার না না করিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমার হাতে ওটা দিয়া বলিলেন "খাও, কিচ্ছু হবে না।" অগত্যা তাহা খাইতে হইল। কিন্তু আমার কোন অসুখ হয় নাই। এইরূপে কত স্নেহ ভালবাসাদি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি আজ তাহা স্মরণ করিয়া 'হৃষ্যামি' পুনঃ পুনঃ! কত ভাগ্য ছিল তাই এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তানদের করুণা লাভ করিয়া ধন্য হইবার সুযোগ পাইয়াছি।

(উদ্বোধন ঃ ৭১ বর্ষ ৫ সংখ্যা)

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

স্বামী—

স্বামী অখণ্ডানন্দ, অতি সাধারণ লোকের মতো সারগাছির মাঠে চাষাভুসোর মধ্যে প্রায় ৪০ বৎসর কাটিয়ে গিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর—তিনি কি করে গেলেন? কি তাঁর সাধনা, বৈশিষ্ট্যই বা কি? এসব প্রশ্ন আজ স্বভাবতই মনে জাগছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান হিসাবে তাঁর অপূর্ব জীবন, উপলব্ধি, ভাব-ভক্তি, অতলস্পর্শ আধ্যাত্মিক চেতনা, মানুষের পূজা, সর্বভূতে নারায়ণ-দর্শন—এসব গভীর ধ্যানের বিষয়।

"সাধারণ লোকের মতো"—কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য। অনেকেই তাঁকে দেখেছে নিজের হাতে আশ্রমের জমিতে ফুলের ও তরকারির বাগান করতে। ১৮৯৮ সালে তিনি প্রথম আশ্রম স্থাপন করেছেন—আর্ত অনাথ আতুর মানুষকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করেছেন যেমন করে 'পুরুষসূক্ত' পাঠ করে মন্দিরে নারায়ণ শিলার পূজা করা হয়ে থাকে। হাফ-প্যান্ট পরে বেলা ২টা পর্যন্ত কতদিন তিনি মাটি কুপিয়েছেন, তারপর হয়তো আহার পান্তাভাত! চাঁদার খাতা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা আদায় করেছেন, বাজার করে নিয়ে এসেছেন, আবার আশ্রমে এসে রান্না করে পরিবেশন করে আশ্রমবাসী অনাথ বালকদের মায়ের মতো সেবা করেছেন। আশ্রমসুদ্ধ হয়তো অসুখ, তিনি একটিমাত্র বালকের সাহচর্যে মায়ের মতো তরকারি কুটছেন, ভাঁড়ার দিচ্ছেন, সাবু-বার্লি খাওয়াচ্ছেন আরও অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজ করছেন। রাত্রে উঠে রোগীদের টেম্পারেচার নেওয়া, জ্বর ছাড়বামাত্র কুইনিন দেওয়া আরও কত প্রকারের সেবা করা—সব এক হাতে করেছেন। এর মধ্যে হয়তো এডিসাহেব (জেলাম্যাজিস্ট্রেট) এসেছেন বিজয়ার পর, অমনি তাঁকে নারকেল নাড়ু দিয়ে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। অর্থ যদি এলো—সঞ্চয় না করে খরচ করে ফেলা। এই ছিল তাঁর জীবন সারগাছিতে।

আশ্রমের কেউ তাঁর সেবা করতে পেত না, তিনিই সকলের সেবা করতেন। এই রকম কঠোর পরিশ্রম করে মাঝে মাঝে খুব অসুস্থ হয়ে পড়তেন। একবার তিনি ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সাধনার স্থান আশ্রম ছেড়ে যাবেন না। শেষে পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজ জোর করে তাঁকে নিয়ে গেলেন কলকাতা, সেখানে বিপিনবাবু তাঁর ডাক্তার—এক মাস জলসাবু খাইয়ে ফেলে রাখলেন। ছমাস লাগে সারতে। ভাল হতে না হতেই মহারাজ সারগাছি আসার জন্য ব্যাকুল, তাঁর জীবন্ত নারায়ণ, মানুষঠাকুরের পূজার জন্যে, সেবার জন্যে আশ্রমে ফিরে এলেন।

বাগানে কাজ করছেন, লাইব্রেরি সাজাচ্ছেন, ছেলেদের যত্ন নিচ্ছেন, চাষীদের সঙ্গে প্রাণখুলে মিশছেন, মাসের পর মাস রান্না করে খাওয়াচ্ছেন। ছুতোরের কারখানা চলছে, তাঁতের কাজ চলছে—অফিসের কাজও করছেন—সবই তাঁর রুটিনের মধ্যে। আবার সারা রাত জেগে জ্ঞানচর্চা—বই পড়ছেন। এই ভাবে তিব্বতের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন। একবার নদিন নরাত এতটুকু না ঘুমিয়ে কেটেছে। সারাদিন কাজের পর রাত্রে নির্জন অবসরে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে বসেছেন, লিখতে লিখতে ভোর হয়ে গেছে। আবার দিনের কাজ। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর অদ্ভুত কর্মময় জীবন!

দেখতে সাধারণ মানুষের ন্যায়—কিন্তু মহা-কর্মযোগী। এত কাজ করছেন কেউ বুঝতে পারত না, এত বই পড়ছেন—কেউ জানতে পারত না। তারপর প্রতি পদে ভগবানের উপর নির্ভরতা, আকাশবৃত্তির দ্বারা আশ্রম চালানো, রিপোর্ট ছাপাছাপি নেই, টাকার জন্য আবেদন-নিবেদন নেই, কাজ চলছে।

একদিন আশ্রমে চাল বাড়ন্ত! বহরমপুরের সাগু উকিল গোরাবাজার-নিবাসী প্রমথবাবু অপ্রত্যাশিতভাবে এসে দশ টাকার চাল কিনে আশ্রমে দেবার জন্যে নিয়ে এসেছেন। এইরকম কতশত ঘটনা। আবার আর একটা দিক। এডিসাহেব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পূজনীয় অখণ্ডানন্দ মহারাজকে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। সাহেব বেশ পণ্ডিত—র‍্যাংলার, অবিবাহিত। মহারাজকে বললেন, "স্বামীজী, আপনি কলেজের ছেলেদের মধ্যে মাঝে মাঝে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা দিন।" মহারাজ অবশ্য তাঁর কথামত কাজ করেন নি; তাঁকে চালাচ্ছেন ঠাকুর, তাঁর আদেশ না পেলে, তিনি কিছুই করতে পারতেন না। তিনি বলতেন, "আমার মধ্যে রাম আছেন, রাম না বললে কিছু করবার জো নাই।" 'আচরি সকল ধর্ম, বুঝাইলা গূঢ় মর্ম'—এই জন্যেই তো শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, নিজে আচরণ করে দেখিয়ে গেছেন, আবার তাঁর সন্তানদের দিয়ে কেমন ভাবে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

ঠাকুরের এই সন্তান একাধারে ছিলেন ভক্তিযোগী ও কর্মযোগী! ঘুম ও চুপচাপ বসে থাকার মহাশত্রু ছিলেন তিনি! কর্ম, কর্ম—কেবল কর্ম! তবে নূতনভাবে কর্ম করতে হবে—কর্ম মানে পূজা! সকামভাবে নয়—নিষ্কামভাবে, সেবার ভাবে, উপাসনার ভাবে। নিজের জীবনে আচরণ করে দেখিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সন্তানের জীবনরূপ গ্রন্থের পৃষ্ঠা আমরা যত উল্টাব—ততই দেখতে পাব, তিনি ছিলেন—গীতার নিষ্কাম কর্ম-যোগের—অনাসক্তি-যোগের মূর্তিমান বিগ্রহ! তাঁর জীবন ছিল নবতম সেবাধর্মের বিশাল স্তম্ভস্বরূপ।

(উদ্বোধন ঃ ৫৭ বর্ষ ৯ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দের কথা-সংগ্রহ

জনৈক সেবক

আশ্রমের একটি বালক-ভক্ত কিছুদিন হইতে দীক্ষার জন্য পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে অনুরোধ করিতেছে। একদিন তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "তুই দীক্ষা চাইছিস? তোর তো দীক্ষা হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী মন্ত্রই প্রধান। তোকে আমি নিজে গায়ত্রী দিয়েছি—তাতেই তোর হয়েছে।"

একদিন তিনি ঠাকুরের পূজা করিতে বলিলে ভক্তটি বলিল, "ঠাকুর-পূজার মন্ত্র-তন্ত্র আমি কিছু জানি না।" তিনি "আয়, আমার কাছে আয়" বলিয়া কাছে ডাকিলেন এবং শেষে বলিলেন, "ঠাকুরের চিন্তা করে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবি। কিন্তু সাবধান যেন কোন অন্যায় না হয়। ক্ষমা-প্রার্থনা করবি। কেঁদে কেঁদে বলবি—ঠাকুর, আমায় মানুষ কর। ঠাকুর বলতেন, মানুষ নয়, মানহুঁশ।"

একদিন মহারাজ বলিলেন, "আমাদের কি বুঝবি? আমরা বিরাট, অনন্ত। দশের জন্য আমাদের শরীর। আমাদের চিনলেই হলো! ডালের চামচে ডালের কোন স্বাদ পায় না। তোদের মাথা নিরেট—একটু ঘি, আর সবটা কাম ক্রোধ অহঙ্কারেই ভর্তি। মানুষ হবার আগে এসব ত্যাগ কর।

"ব্রহ্মচারীর ভুল হবে কেন? স্বামীজী আমাকে একদিন তামাক সাজতে বলেছিলেন ; কলকেতে ঠিকরা দিতে ভুল হয়েছিল। এজন্য তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন।

"তোরা আমাদের চিনলি না? তাই কথার উপর কথা বলিস, চোখ রাঙাস, রাগ করিস।" ভক্তটি বলিল, "আপনার উপর রাগ করব না তো কার উপর রাগ করব, আমাদের আর কে আছে?" তখন মহা সন্তুষ্ট হয়ে বলিলেন, "তা বৈ কি। আমার উপর রাগ না করলে কোথায় যাবি? ঠাকুরের অশেষ কৃপা যে তাঁর কাছে এসেছিস। তোরা আমাকে ভালবাসবি, আমি তোদের ভালবাসব। ঠাকুরের কাজ করতে করতে মরে যাবি—সে তো মহাভাগ্য। কিসের দিন, কিসের রাত—গ্রাহ্য করবি না, কাজ করতে করতে মরে যা, আমি দেখি। আমাদের কাছে এসেছিস, শুধু পড়ে পড়ে ঘুমুবি, আর বলবি বিশ্রাম করছিলাম—সে কি রে? আমাদের ঘুম নেই। আমরা 'ঘুমোর ঘুম পাড়াতে' এসেছি। দেখ, এই বয়সেও কিভাবে কাজ করে চলেছি, আর তোরা সব জোয়ান ছোকরা!

"সেই ছেলে বয়সে ঠাকুরের কাছে গিয়েছি, তারপর পাহাড় পর্বত জঙ্গলে কত ভালুক,

ডাকাতের হাতে পড়েছি, কত কষ্টের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করেছি! তারপর এখানে এসেও কি-ভাবে জীবন কেটেছে তোরা কি তা কল্পনা করতে পারবি? তোরা তো এখন দেখছিস বড় বড় সিন্দুক, সুটকেশ, খাট-পালঙ্ক! কিন্তু কত কষ্ট করেছি—সেটা তো দেখলি না!

"দেখ্ দেখ্—ঠাকুরের লীলাখেলা—কত সব আসছে যাচ্ছে, এলাহি ব্যাপার! কখনও কল্পনাও করতে পারিসনি। এখনই তো ঠাকুরের শেষ লীলাখেলা হয়ে যাচ্ছে।"

একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি চাস?" ভক্তটি বলিল, "ভক্তি বিশ্বাস নিষ্ঠা, আর যেন জীবনে মানুষ হতে পারি।" ইহার কয়েক দিন পরে বিজয়াদশমীর রাত্রে ভক্তটিকে আশীর্বাদ করিলেন, "তোর কর্মশক্তি বৃদ্ধি হোক।"

সেবক আসিয়া জানাইল খাবার তৈরি। মহারাজ বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর। আমি ওদের (সমবেত ভক্তদের) কিছু বলব। ওদের সব ভেতরে আসতে বল।"

ভক্তেরা ভিতরে আসিলেন। মহারাজের শরীরটা কিন্তু বড় খারাপ। প্রথমে পুরুষ-ভক্তদের বলিলেন, "দেখ, কিছু কিছু দান-ধ্যান করতে হয়, সন্ধ্যে সকাল দুবেলা—ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করতে হয়। দেখ, অনেকে দীক্ষা নেয় কিন্তু আর কিছু করে না, এজন্য আমি দীক্ষা দিতে চাই না। আর কি বোকা! করজপ বার বার দেখিয়ে দিই, তা-ও করতে পারে না! আমি বলি কি, সংসারে দুটি একটি ছেলেমেয়ে হলেই ভাইবোনের মতো থাকবে। কোথায় সে সব? বৎসর অন্তর ছেলে হচ্ছে, আবার দীক্ষা নিতে আসে! কে কি করে আসে, আমি আর পারি না, আমি আর দেব না। কি করব—এসে কেঁদে পায়ে ধরবে, তখন আবার না দিয়েও পারি না। দেখ, ছোট ছেলেদের ভেতরটা বড় সুন্দর, একবার দেখিয়ে দিলেই হয়। কিন্তু বুড়োগুলোর তা হয় না।

"যাক, ঠাকুরের নামে সব উদ্ধার হয়ে যাবে, ভক্তিবিশ্বাস থাকলেই হলো। ঠাকুরের পুজো কি প্রকারে করবে আবার? ভক্তি-সহকারে। তাঁকে ফুল দেবে, মন্ত্র-তন্ত্র আমি ওসব জানি না। ওরা করছে, ওরা জানে। কলিতে আর কিছুই নয়, কেবল নাম। তাঁর নাম করে যাও। যতই কাজ কর, ভেতরে জানবে আমি কিছুই নই, সব তিনি। যা রয় সয়, তাই করা ভাল। ঐ তাঁর নাম ১০৮ বার জপ করবে, তা হলেই ক্রমশ হবে। আস্তে আস্তে বেশি বেশি চেষ্টা করতে হয়। মনকে পাকা করে নিতে হয়।

"এখন আমাদের বেশির ভাগেরই কর্ম করা উচিত। বসে বসে ধ্যানভজনও করতে পারে না, ঘুমোয়! তমোগুণের মধ্যে ডুবে আছে, ধর্ম হবে কি? কর্ম কর, তার মধ্যে মনে করবে যে, তাঁর কাজ করছি। আগে রজোগুণ আসুক, তারপর সত্ত্বগুণ, তার পর দর্শনাদি। কিছুদিন যেতে না যেতেই বলে, আমার কোন দর্শন-টর্শন হয় না কেন? আরে বাবা, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

"প্রাণ ভরে ডাকো, কাঁদো—'দেখা দাও, দেখা দাও, প্রভু আমায় দেখা দাও।' দর্শন অমনি হয়? সে সরলতা নেই, বিশ্বাস নেই, সারা মনটা কামক্রোধে ভর্তি! কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর। লোকে মাগছেলের জন্য কত কাঁদে, কিন্তু এজন্য কে কাঁদছে?

"আজকাল যেমন হয়েছে, দেখ না ব্রাহ্মণের ছেলে, পৈতের পর গায়ত্রী-জপ করেছে কি না সন্দেহ! কতক তো পৈতেই ফেলে দেয়! না হিন্দু, না মুসলমান! লঘুগুরু জ্ঞান নেই, আজ্ঞে প্রাজ্ঞে জানে না। যাক, সন্ধ্যা হয়েছে। 'হরিবোল' বল।"

সন্ধ্যার সময় বাবা একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, সন্ধ্যার সময় 'হরিবোল' বলতে হয় হাততালি দিয়ে। দেখ, স্ত্রী-পুত্র এসব দু-দিনের জন্য, ভোগসুখ ক্ষণস্থায়ী। তাই কখন কখন নির্জন বাস খুব ভাল। তাহলে মন সংযত হয়। আজ অনেক কথা বললাম।"

ভক্তেরা বলিলেন, "আপনারা না বললে আমরা কোথা যাব?" বাবা বলিলেন, "কি জানি, ঠাকুরের ইচ্ছা। সব দিন এমন হয় না।"

সন্ধ্যাবেলা পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেই মহারাজ আপত্তি করিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীকে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করবে, দুপায়ের ধুলো নেবে, কখনও এক পায়ের ধুলো নেবে না। সকাল-সন্ধ্যায় শুয়ে থাকবে না, বসে পা নাচাবে না, দাঁড়িয়ে জল খাবে না, গালে হাত দিয়ে ভাববে না, সন্ধ্যাবেলা হাততালি দিয়ে হরিবোল বলবে।

"আমার কথাগুলি অবিচলিত ভাবে কর, মঙ্গল হবে। ভগবান অতি নিকটতম, কারণ তিনি হৃদয়ে। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত, তাই তাঁকে দেখতে পায় না—দূর মনে করে। তিনি নিকটতম—তিনি প্রাণের প্রাণ, মনের মন। তিনি আছেন তাই প্রাণবায়ু চলছে।

"দেখ, তোমায় তো বলেছি। ঝাঁট দেওয়া, কুটনো কোটা—সব তাঁর কাজ মনে করে করবে। এই যে আমরা এত কাজ করছি—আশ্রম, সেবা—এই সব হচ্ছে কেন? ঠাকুর, আহা, বারটি বছর ঘুম নেই—দক্ষিণেশ্বরে পড়ে কি সাধনাই করলেন। হুঁশ নেই, হৃদয় মুখুজ্যে চিমটি কেটে হুঁশ আনবার চেষ্টা করত, খাওয়াত। কি কষ্টই ঠাকুর করেছেন! কেন? জগতের মঙ্গলের জন্য। সাধনার পরেও বিশ্রাম নেই, জগতের জন্য জীবন পাত করে গেলেন। গলায় ঘা হলো, কথাবার্তা কইতে নিষেধ, তাও বিশ্রাম নেই! কারো পরনে ছেঁড়া কাপড় দেখলে কোন ধনী গৃহস্থ ভক্তকে বলতেন, 'আহা, ওকে একটা কাপড় দাও।' মথুরবাবুর সঙ্গে একবার দেওঘরে সাঁওতালদের দেখে তাঁর কি কান্না! আহা এরা খেতে পায় না, এদের কত কষ্ট! তারপর মথুরবাবু টাকা খরচ করে তাদের খাওয়ালেন, কাপড় দিলেন, তবে ঠাকুর বৃন্দাবন গেলেন। পেটে অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই, বেদান্তের কথা কে শুনবে বল?

"ঠাকুর আমাদের রেখে গেলেন কাজের জন্য। সাধন-ভজন, নিঃসম্বল ভ্রমণ—সবই তিনি করিয়েছেন। শেষে এইখানে এই সেবা করাচ্ছেন।"

পরহিতার্থে দধীচির আত্মত্যাগের গল্প শেষ করে বলিলেন, "কোন কাজ ছোট মনে করতে নেই। সব তাঁর কাজ। স্বামীজী নিজে হাঁড়ি মেজেছিলেন!

"কাজের জন্যই স্বামীজী এসব মঠ মিশন করে গেলেন, তা যদি না হবে তো যাবার দিনেও স্বামীজী এত কাজ করে গেলেন কেন? অনেক দিন থেকেই চিঠিতে লিখছেন, 'মা আমায় ডাকছেন, আমার কাজ ফুরিয়ে এসেছে।' কিন্তু কই, হাত পা গুটিয়ে তো বসে রইলেন না। বহুমূত্র অসুখ, পরিশ্রান্ত, কিন্তু সেদিনও দেড় মাইল বেড়িয়ে এলেন, ব্যাকরণের ক্লাস করলেন, সাধুদের বকলেন কাজ-কর্ম না করার দরুন। বললেন, 'তোরা ঘুমোবি বলে মঠ হলো নাকি?' শেষে ধ্যানে বসলেন। সেদিন যেন কাজের জোয়ার এসেছিল।

"স্বামীজীর অদর্শনের সাত দিন পরে কালীঘাটের পথে তাঁর সাক্ষাৎদর্শন পেলাম। তুমি চেষ্টা কর তুমিও দেখবে। দর্শন, প্রেম—সে তো বহুদূর! এখন নিষ্কাম কর্ম!"

(উদ্বোধন ঃ ৫৩ বর্ষ ২ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের উপদেশ

জনৈক সন্ন্যাসী

২১ অক্টোবর, ১৯২৭। সারগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমে মহারাজের কাছে বসে দীক্ষার কথা ভাবছি। একটু পরে তিনি বললেন—"তোর তো হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, তোকে যে উপদেশ দিয়েছি—তা তোর মনে আছে? সাড়ে চারটার সময় উঠিস তো? ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবি—'ঠাকুর, আমায় প্রেম দাও, শুদ্ধাভক্তি দাও, দেখা দাও। তুমি কত জ্ঞান প্রেম দিচ্ছ, কত লোককে তরাচ্ছ, আমি তোমার আশ্রয়ে আছি—আমাকে দেখা দাও।' ঠাকুর আমাদের এই রকম উপদেশ দিতেন; বলতেন—ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকবি। সকালে উঠে নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের ধ্যান করবি, যেন মাথার উপর সহস্রদল পদ্মে সহাস্য ও জ্যোতির্ময় রূপে শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন। এই রকম ধ্যান করবি।"

আর এক দিন বলেছিলেন, "পারব না—এ কথা আমার কাছে বোলো না। পারব না—এ-কথা যেন তোমার মুখে না শুনি। যখনই মনে বিকার উপস্থিত হবে, তখনই ঠাকুরঘরে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করবে—ঠাকুর, আমায় উদ্ধার কর, কত পাপী-তাপীকে তুমি উদ্ধার করছ, আমাকেও উদ্ধার কর।"

২১ নভেম্বর, ১৯২৮। ধ্যানের সম্বন্ধে বললেন, "যখন মন স্থির না হয় তখন অনেক রকম ফুল ও নৈবেদ্য সাজায়ে ইষ্টদেবতাকে মনে মনে নিবেদন করবে। মনটা সম্পূর্ণরূপে তাঁতে লাগিয়ে রাখবে; মানস পূজা করবে। তা হলেই মন আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে। আসনের বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম নেই। যে আসনে বসলে কোন কষ্ট হয় না এবং অনেকক্ষণ একাসনে থাকতে পারা যায় এইরূপ আসনই শ্রেয়।

"ধ্যান করতে করতে মন যদি ইষ্টদেবতার প্রতি একাগ্র না হতে চায়, তো মনে করবে—রাশি রাশি ফুল দিয়ে তাঁকে পূজা করছ, মালা পরিয়ে দিচ্ছ, থালা থালা বিল্বপত্র, পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য সব দিচ্ছ। এইরকম ভাবতে ভাবতে ধ্যান আপনি জমে যাবে!"

২৩ মে, ১৯২৯। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন মহারাজ বললেন, "বুদ্ধদেব ত্যাগের আদর্শ, মহাতপস্যার ফলে আত্মজ্ঞান লাভ করেন।" পরে ত্রিশরণমন্ত্র উচ্চারণ করলেন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

কথা-প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, "যে, যে-সংস্কার নিয়ে জন্মায়, তার সেই সেই সংস্কার সহজে যায় না। এমন কি মহাপুরুষদের কাছে থাকলেও নয়। এই দেখ না—শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পর্শে কত লোকের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে উদ্ধার পেয়ে গেছে, কেউ তাঁর কথা শুনে উদ্ধার পেঁয়ে গেছে, আবার কেউ তাঁর দীর্ঘদিন সেবা করেও সাধারণ লোকের মতো রয়ে গেল।"

২৪ মে, ১৯২৯। আমাকে বললেন, "নিজের দিকে যত তুমি মন দেবে, তত তুমি ছোট হয়ে যাবে ; আর পরকে যত তুমি আত্মবৎ মনে করবে তত তুমি বড় হবে। স্বামীজী বলতেন—নিজেকে ভাবলে যা আনন্দ হয়, নিজের সুখদুঃখে সুখী দুঃখী আর একজনকে ভাবলে তার চেয়ে দ্বিগুণ আনন্দ। এই রকম যত করবে তত তোমার 'আমিটা' জগতে ছড়িয়ে পড়বে। তবে তো আত্মজ্ঞান লাভ হবে। পরকে নিজের মতো যত দেখতে শিখবে, ততো তোমার হৃদয় উদার এবং আত্মজ্ঞান লাভ হবে।"

একজন কুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বললেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর—ঠাকুর, আমায় প্রেম দাও, শ্রদ্ধা দাও, ভক্তি দাও। তোমারই এক জন ছেলের কাছে আছি। নাথ, একবার কৃপা কর, একবার দেখা দাও। এই রকম কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলেই তোমার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা হবে। তোমার কুণ্ডলিনী নিশ্চয় জেগেছেন, না জাগলে তুমি ঠাকুরকে ডাকতে পারতে না, ঠাকুরের কথা আলোচনা করতে তোমার এত ইচ্ছা হতো না। যাদের কুণ্ডলিনী জাগেনি তাদের ভগবানের নাম ভাল লাগে না, তারা সংসারে জড়িয়ে পড়ে; যেখানে ভগবানের নাম হয় সেখান থেকে উঠে যায়। ঠাকুরের কাছে কুণ্ডলিনী জাগার প্রার্থনা না করে তাঁকে কি করে পাওয়া যায় সেই প্রার্থনা করবে। প্রত্যহ নিয়মিত জপ-ধ্যান করবে। আর আমাদের জীবন স্টাডি (অধ্যয়ন) করবে।

"দেখ্ না—আমি কেন এখানে এই ৩২ বছর পড়ে আছি। এখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ বাকি আছে বলে রেখেছেন। নিজের আত্মা দশের মধ্যে ছড়িয়ে দিবি, আর দশের আত্মাটা নিজের ভেতর টেনে নিবি, দেখবি তাতে কত আনন্দ পাবি। আর যদি তুই নিজেরটা নিয়েই ব্যস্ত থাকিস, তবে তুই নিজেকে আত্মঘাতী করবি, নিজের মধ্যে জড়িয়ে পড়বি, আর মরবি। নিজেকে যত লোকের মধ্যে বিলিয়ে দিবি ততই আনন্দলাভ করবি এবং তাতেই আত্মজ্ঞান হবে। আর নিজেকে যত জড়িয়ে ফেলবি ততই ছোট হয়ে যাবি।

"এই দেখ্—দধীচি মুনির ত্যাগ। লোকের কল্যাণ হবে বলে নিজের অস্থি দান করলেন। একি কম কথা? দেবতারা এসে বললেন—'হে মুনিবর, আমরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার কাছে এসেছি। আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।' তখন মুনি বললেন,

'এই শরীর রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরি, শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য, এই শরীর দিয়ে যদি পরের সেবা না হলো তবে এই শরীর-ধারণ বৃথা—

যোঽধ্রুবেণাত্মনা নাথা ন ধর্মং ন যশঃ পুমান্।
ঈহেত ভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি।।
এতাবানব্যয়ো ধর্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি।।
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ।।

" 'ইহ সংসারে যে-ব্যক্তি অনিত্য শরীরের দ্বারা জীবের সেবা করে ধর্ম ও যশ লাভ না করল, সে স্থাবর অপেক্ষাও অধম। জীবের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হওয়াই মহাপুরুষদের ধর্ম। শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য ক্ষণভঙ্গুর এই শরীর দ্বারা, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও বিত্তদ্বারা যে-মনুষ্য স্বার্থশূন্য ভাবে উপকার না করে তার ধন-জন-জীবনে ধিক্।' শেষে দধীচি বললেন—'আমার এই শরীরের হাড় দিয়ে যদি বৃত্রাসুরের মতো অত্যাচারীর প্রাণ বধ হয় এবং তিনলোক শান্তিলাভ করে, তবে আমি পরম আনন্দের সহিত প্রাণত্যাগ করছি।' এই বলে তিনি দেহত্যাগ করলেন এবং তাঁর অস্থি নিয়ে বজ্র তৈরি হলো, তা দ্বারা বৃত্রাসুরবধ হলো, দেখ, কি ত্যাগ! এই রকম ত্যাগেই জ্ঞানলাভ হয়।

"নিজেকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিবি, তবেই এখানে থাকার ফল হবে। এখানে মানুষ হয়ে যদি হৃদয় না হলো তো কি হলো? নিজেকে পরের জন্য বিলিয়ে দে। যদি কোন অভুক্ত লোক আসে এবং অন্য আহার না থাকে তো নিজেরটা তাকে দিয়ে দিবি।

"সব সময় ধৈর্য-ক্ষমা চাই। রাগ ত্যাগ করবি। যদি খুব রাগের কিছু হয়, নির্বিকার থাকবি, কিছুতেই রাগবি না। রাগে শীঘ্র অধঃপতন হয়। ঠাকুর বলতেন, কামক্রোধাদি ছয় রিপুকে মোড় ফিরিয়ে দিবি। কাম কি, না তাঁকে পাবার ইচ্ছা। এই রকম সব তাঁর দিকে মোড় ফিরিয়ে দিবি।

"আসল কথা নিজেকে বিলিয়ে দিবি। পরের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে কুণ্ঠিত হবি না। আর শ্রদ্ধা সহকারে সমস্ত কাজ করবি। শ্রদ্ধা না হলে কিছুই হবে না। শ্রদ্ধা মানুষকে অমর করে। শ্রদ্ধা থেকে প্রেম, করুণা, ভালবাসা, দয়া—আত্মজ্ঞান পর্যন্ত লাভ হয়, আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। শ্রদ্ধা না থাকলে কিছুই হয় না। ঠাকুরের উপর নির্ভর করে পড়ে থাক, সব হয়ে যাবে।"

(উদ্বোধন ঃ ৫২ বর্ষ ৭ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের উপদেশ

শ্রী—

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ ১৯২৯ সালের ২৬ মে সেবা-বিষয়ে বলিলেন, "যার সেবা করবি তার কিসে সুখ হয়, তাই লক্ষ্য রাখবি। তার যে সময় যা দরকার তা না চাইলেও তাকে জিজ্ঞেস করে দিবি। তাকে সর্বদা যত্ন করবি; তবে তো যথার্থ সেবা করা হবে।"

কাহারও সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা সম্বন্ধে বলিলেন, "কোন লোকের সম্পর্কে ভাল বা মন্দ মত প্রকাশ করার সময় তাকে প্রত্যক্ষ দেখে যে-রকম তোমার মনে হয় তাই বলবে। খবরদার! লোকের মুখে শুনে এক জনের উপর খারাপ ধারণা রাখবে না। যতটুকু দেখবে —তার বেশি বলবে না।"

২১ মে। সন্ধ্যারতির সময় তিনি ঠাকুর-মন্দিরে যেয়ে আরতির পর—

"আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনির্নমোঽস্তু তে।।"

এই গায়ত্রী-আবাহনটি তিনবার উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং ভাল করিয়া ভজন করাইলেন। ভজনের পর সকলে তাঁহার কাছে বসিলে বলিতে লাগিলেন, "সন্ধ্যাবেলা হরিবোল বলা যে কত ভাল তা ঠাকুরই বলে গিয়েছেন। তিনি বলতেন, যেমন নানা দেশের নানা রকম পাখি সন্ধ্যাবেলায় একটি গাছের উপর বসিয়া কলকল করছে, সেই গাছের তলায় গিয়ে যেমনি হাততালি দেবে অমনি সব পাখি উড়ে যাবে, সেই রকম মনরূপ গাছে চিন্তারূপ নানা পাখি সারা দিন কলকল করছে, সন্ধ্যাবেলা হাততালি দিয়ে হরিবোল করলে বিষয়চিন্তা চলে গিয়ে শ্রীভগবানকে মনে পড়ে; এই জন্যে সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বাললেই 'হরিবোল হরিবোল' করতে হয় এবং হাততালি দিতে হয়।"

৩১ মে। মহারাজ অনেক পূর্বকথা বলিলেন, "আহা, তমালগাছ কেমন কালো! ঠাকুরের সময় আমাদের কি ভাবই ছিল! তমালগাছ দেখলে ভাবে বিভোর হয়ে যেতাম। কুমারটুলিতে এক

জনের বাড়িতে একটি তমালগাছ ছিল, মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম। ঠাকুরের কাছে ঐ তমাল-সম্বন্ধে কত গানই হতো, আর আমরা ভাবে ভরপুর হয়ে যেতাম, ঠাকুরেরও সমাধি হয়ে যেত।

গান

শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়
সম্মুখে তমাল তরু ধরিবারে ধায়।
আহা, কৃষ্ণ কালো তমাল কালো
তাই, তমাল বড় ভালবাসি।

"কি মধুর ভাবের সব গান! একদিন ঠাকুর খাবার পর শুয়েছেন, স্বামীজীও আর এক জায়গায় শুয়েছিলেন, বাঁয়াতে একটি টোকা দিয়ে গান ধরেছি—'এস এস বঁধু, এস...নয়ন ভরিয়া দেখি।' স্বামীজী উঠে পড়লেন, বললেন, 'তুই আমাকে আর শুতে দিলি নি। ভিতরটা কেমন করে উঠেছে!' ঠাকুরও তাঁর ঘরে ভাবে বিভোর! আজকাল এসব কীর্তন হলে অনেকে হাসে। সেসব দিন আর নেই। একদিন সন্ধ্যাবেলা মঠের বারান্দায় বসে আছি—গঙ্গায় সন্ধ্যারতির ধূপধুনা দেবামাত্র 'হরিবোল হরিবোল' বলেছি, এমন সময় বাবুরাম মহারাজ হরিনাম শুনেই দুবাহু তুলে নৃত্য আরম্ভ করলেন। তারপর একে একে মঠের সকলে তাঁকে ঘিরে হরিনামে মত্ত হয়ে 'হরিবোল হরিবোল' করে নাচতে লাগল।"

১ জুন। জনৈক ব্রহ্মচারী তাহার করণীয় কাজ কিছুক্ষণ করিয়া উহা আর এক জনের হাতে দিয়া চলিয়া যায়। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ তাহাকে বলিলেন, "তোমাদের পক্ষে সেবা করা ভাল। সাধু হতে এসেছ, সেবা করবে না তো কি? আর কাতর হওয়াটা কি জান? ব্রহ্মচর্যের অভাব। যে বীর্যধারণ করে, যার ওজোধাতু আছে—তার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। সে চাঁদ পেড়ে আনতে পারে, সূর্য পেড়ে আনতে পারে। যার বীর্যক্ষয় হয়েছে—সে তো কিছুই করতে পারে না, তার ক্ষমতা আর কতটুকু? দেখছ তো আমাদের (ঠাকুরের সন্তানদের) এখনও পর্যন্ত খাটবার ক্ষমতা! যদি শরীরটা ভাল থাকত তা হলে এই বুড়ো বয়সেই দেখিয়ে দিতাম—এখনও মনের মধ্যে যে-সব ভাব আছে তা তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। জানি, এই ভাব পূর্ণ করতে আবার আসতে হবে; ঠাকুর আবার পাঠাতে পারেন।

"ছোট বেলায় ওজোধাতুক্ষয় হয়ে থাকে তো কোন ভাবনা নেই; এখন ঠাকুরের শ্রীচরণে এসে পড়েছ—এখন আর নয়। যত তুমি বীর্যধারণ করতে পারবে—তত তোমার শক্তি বৃদ্ধি হবে এবং আত্মদর্শনলাভ করবার ক্ষমতা আসবে। আত্মার শক্তিতে কাজ করবে, আত্মা অনন্ত শক্তির আধার।

"একটু কাজ করেই ভাববে না যে, আমি একটা কিছু করে ফেলেছি। তা হলে তুমি ছোট হয়ে যাবে। যত তুমি মনে করবে আমি কিছুই করি নি, ততই তোমার শক্তি বৃদ্ধি হবে। শরীর মন সর্বদা পবিত্র রাখবে। তবেই শক্তি বাড়বে। ছোট ছেলেদের অপরাধ ভগবানের খাতায় লেখা থাকে না। তাদের পাপ-পুণ্য তিনি দেখেন না। ছোট ছেলেরা বড় পবিত্র।

"সেবা করতে হলে খুব ধৈর্য থাকা চাই, নইলে সে সেবা করতে পারে না। সেবা কি যে-সে করতে পারে? যার পূর্ব জন্মের পুণ্য থাকে সেই সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ করে এবং ঠিক ঠিক সেবা করতে পারে।"

৪ জুন। "জপ সব সময় করা চলে। ভগবানের নাম সব সময় করা চলে মনে মনে। সব সময় জপ করতে পার। ঠাকুরের কথায় আছে—পাখি উড়ে যেতে যেতে ভগবানের নাম করছে। ...খুব সরল হবি, কুটিল হবি না। যত সরল হবি তত তোর হৃদয় প্রশস্ত হবে। সব বিষয়ে খোলাখুলি ব্যবহার করবি। ঢাকঢাক গুড়গুড় করবি না। খোলাখুলি ব্যবহার খুব ভাল। যে মানুষ যত সরল তার অন্তর তত পবিত্র। সর্বদা শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র থাকবার চেষ্টা করবি। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করবি। এই আশ্রম আগে একটা পোড়ো বাড়িতে ছিল, তখন বাড়িটি এমন ছবির মতো সাজিয়ে রাখতাম যে, রেশমকুঠীর সাহেবরা দেখতে এসে খুব খুশি হতো, বলতো—'স্বামীজী, তুমি এই ভাঙা বাড়িটা এমন ভাবে সাজিয়ে রাখ ঠিক যেন ছবির মতো। সাহেববাচ্চা কিনা তাই ওসব বোঝে!

"আমি খুব পবিত্র ভাব ভালবাসি। তাই দেখ না, ঠাকুর সেই ছোট বেলায় আমাকে হিমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। কেমন পবিত্র স্থান, সব সময় ফুল ফুটে আছে! প্রকৃতি দেবী যেন হাসছেন! অমন পবিত্র স্থান কি আর আছে? সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান। আমি তো আসতাম না। ভ্রমণ করতে করতে কাশ্মীরে এসে পড়লাম। সেখানে স্বামীজীর চিঠি পেলাম। তখন স্বামীজীকে ও আর আর গুরু-ভাইদের দেখবার খুব ইচ্ছা হওয়ায় এলাম, না হলে আর ফিরতাম না, ঐখানেই থেকে যেতাম।"

১৫ জুন। "তোমরা ভাল হতে ঠাকুরের জায়গায় এসেছ। এজন্য ভাবতে হবে 'কিসে আমরা ভাল হব'। ভাল হতে চেষ্টা করতে হবে, তবে তো শান্তি পাবে? যখন দেখবে একজনের কথায় খুব রাগ হবে, তখন তার উপর রাগ না করে তাকে আরো বেশি ভালবাসার চেষ্টা করবে। তুমি রাগছ না দেখে সে তোমাকে আর রাগাতে পারবে না। এইরকম করে চরিত্র গঠন করতে চেষ্টা কর, তবে তো ঠাকুরের স্থানে শান্তি পাবে। সেবা যদি আপনা হতে কর তবে তা বড় মিষ্টি লাগে। যে সেবা বলে বলে করাতে হয়—সে-তো জোর করে করানো। খুব ব্রহ্মচর্যের জোর থাকলে তবে ধৈর্য ধরে সেবা করতে পারে। খুব সহ্যগুণ থাকা চাই। সহ্যগুণ না থাকলে আর সাধু কিসের? খুব সহ্য করতে অভ্যাস করবে, সহ্য না করলে কিছুই হবে না।"

২৬ জুন। "হৃদয় না থাকলে কিছু হবে না। হৃদয়ের স্ফুরণ হওয়া চাই, তা যদি না হয় তো কিছুই হবে না। চোখ বুজে বসে থাকলে কিছুই হবে না, ওতে ঠাকুরকে পাবি না। তাইতেই যদি হতো তা হলে আমরা হিমালয়ের নানান জায়গায় সাধনা করেই জীবনটা কাটিয়ে দিতাম।

"ঠাকুর নিজে আমাদের চোখ বুজে ধ্যান করতে শিখিয়েছিলেন, তাই তিব্বতে গিয়েছিলাম ধ্যান করতে। আবার দেখ, ঠাকুর কোথায় এনে ফেলেছেন। এখন যে তোদের নিয়ে সংসার করছি, এতে আমার কি স্বার্থ আছে?

"হৃদয় দরকার, হৃদয় না থাকলে চোখ বুজে বসে থাকলে কিছুই হবে না। এ-যুগে যদি তাই হতো, তা হলে আমরা আর এমন কর্ম আরম্ভ করতাম না। দশ জনের জন্য প্রাণ কাঁদা চাই। দশ জনের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া চাই, তবে ঠাকুরকে পাবি। যদি কারো হৃদয় আছে দেখতেন, তাহলে স্বামীজী তার হাজার দোষ ক্ষমা করতেন।"

২১ জুলাই। আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন মহারাজ বলিলেন, "আজ গুরু ও ব্যাসদেবের পূজার দিন। গুরুকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়।" আজ সকালে তিনি ঠাকুরমন্দিরে গিয়া প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ জপ করিলেন এবং পরে নিচে নামিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঘরে বালি করকর করছে, ঝাঁট দেওয়া হয় না নাকি?" জনৈক সেবক বলিল, "ঝাঁট দেওয়া হয়েছে, তবে পায়ে পায়ে আবার বালি গিয়েছে।" উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "ঠাকুর-সেবা তন-মন-ধন দিয়ে করতে হয়। শুধু বসে বসে জপ করলে হবে না। একটু 'তন' দিয়েও ঠাকুরের সেবা কর, যতক্ষণ বস তার অর্ধেক সময় বসে আর অর্ধেকটা দিয়ে ঠাকুরের মন্দির ঝাঁট দিও, এতে ভাল হবে। আর শুধু বসে থেকে কি ফল? এই তো দেখি কথায় কথায় রেগে ওঠ, মনে সর্বদা রাগ গজগজ করছে—এত ঠাকুরঘরে বসার ফল কি এই রাগ? ঠাকুর বলতেন, সিদ্ধ হওয়া কি না নরম হওয়া, আলু পটল সিদ্ধ হলে যেমন হয়। নির্বিকার থাকবে, সব অবস্থাতেই শান্ত ভাব ঠিক রাখা চাই।"

(উদ্বোধন ঃ ৫২ বর্ষ ১০ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের কথা

স্বামী—

১৫.৪.১৩৩৬—সারগাছি আশ্রমে জনৈক ছেলে একটি গরুকে এমনভাবে মারে যে, তার পা ভেঙে যায়। তাই শুনে বাবা মর্মান্তিক কষ্ট পান এবং ব্রহ্মচারীদের বলেন, "না জেনে শুনে কারো নামে দোষ দিতে নেই।" পরে কাতরভাবে বলেন, "হে ঠাকুর, যদি গো-হত্যার পাপ কিছু হয় তা আমার হোক, ওর যেন কোন পাপ না হয়; ও ছেলেমানুষ, প্রভু ওকে ক্ষমা কর।" ভাব প্রশমিত হলে উপস্থিত আশ্রমবাসীদের লক্ষ্য করে বললেন, "নিজের দোষ আগে দেখতে হয়। নিজের সিন্ধু-পরিমাণ গুণকে বিন্দু-পরিমাণ দেখবে এবং বিন্দু-পরিমাণ দোষকে সিন্ধু-পরিমাণ দেখবে, আর অনুতাপ করবে। পরের বিন্দু-পরিমাণ গুণকে সিন্ধু-পরিমাণ দেখবে, আর সিন্ধু-পরিমাণ দোষকে বিন্দু-পরিমাণ দেখবে, তবে তো ঠিক ঠিক চরিত্রগঠন করতে পারবে।"

১৬.৪.৩৬—সমবেত ভক্তদের বাবা বললেন, "দেখ, আমি দেশ ও দশকে আমার প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি। ইউরোপের এই কজনকে খুব শ্রদ্ধা করি—ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, টলস্টয়, ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি। আবার দেখ, লা মিজারেবল-এর বিশপের কি রকম ক্ষমাগুণ। তাঁর ঐ ক্ষমাগুণে একটা চোরের জীবন বদলে গেল! দেখ, নাইটিঙ্গেল একটা কুকুরের সেবা থেকে আরম্ভ করে জগতের মধ্যে কত বড় হয়ে গেলেন! চোখের সামনে আদর্শ থাকতেও তোরা ঠিক মতো চলতে পারিস না। আর আমরা চোখ বুজলে যে কি হবে তা ঠাকুরই জানেন। জানবি যে, এই ঠাকুরের সংসারে যদি কারও একটু অহংভাব আসে তবে তার পতন অনিবার্য। এ আমি বরাবর দেখে আসছি।"

২০.৪.৩৬—জনৈক ব্রহ্মচারী নানা অসুস্থতার জন্য প্রায়ই শরীর নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁকে একদিন শরীরের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখে বললেন—"জানবি এই দেহটাই একটা ফোড়া; তার উপর আবার অসুখ হলে তো কথাই নেই। সে যেন গোদের উপর বিষফোড়া। যত পারিস রোগগুলোকে মন থেকে তাড়াতে চেষ্টা করবি। মনে করবি যে, আত্মা তো অমর, আমার আবার রোগ-শোক কি? যত এইরকম ভাববি, তত দেখবি রোগের দিকে মনটা না গিয়ে আত্মার দিকে যাবে। আর মনটাকে যত এই দেহের দিকে ফেলে রাখবি তত এই অসুখ, মাথাধরা, পেটকামড়ানো তোকে জড়িয়ে ধরবে।"

২৫.৪.৩৬—সিদ্ধাই ও সাধুজীবন-সম্বন্ধে বললেন, "আমাদের মধ্যে কি ঠাকুর কম শক্তি দিয়ে গিয়েছেন? তা তোরা তো আর চিনতে পারলি না। এই ঘা, অসুখ-বিসুখ আমরা চোখ

দিয়ে দেখে সারাতে পারি। ...কিন্তু যদি সাধুমহাপুরুষদের জীবন দেখে মানুষ হতে না শিখলি তাহলে আর কি হলো। যদি সেই আদর্শের দিকে লক্ষ্য না থাকল, তাহলে সংসার কি দোষ করেছিল? একটুতেই মন খারাপ হয়, অভিমান হয়, এসব কি মন? এসব কাঁচ্চা, ছটাক! মন মহাসমুদ্রের মতো শান্ত নিশ্চল। দেখ, সমুদ্রে কত নদী এসে পড়েছে, তাতে সমুদ্রের কিছু হয়েছে কি? সমুদ্র যেমন তেমনই আছে। তেমনি মনে কত ঝড়ঝাপটা বয়ে যাবে, মনের কোন বিকার হবে না। 'সন্তোষঃ পরমানন্দঃ'—তবে তো তাকে মন বলব। যত দূর পারবি ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম রাখতে চেষ্টা করবি।"

১১.৫.৩৬—জন্মাষ্টমী দিবস। পূর্বকথা-প্রসঙ্গে বাবা বললেন, "১৮৯০/৯১ খ্রীস্টাব্দ হবে, এটোয়ায় ছিলাম। ঠিক এই জন্মাষ্টমীর দিন অনেকক্ষণ শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করেছি। তার আগেই খুব জল হওয়ায় আমাকে যে ঘরে থাকতে দিয়েছিল তার ফরাস ভিজে যায়। তাই সেগুলি গুটিয়ে বালিসের মতো করে রেখেছিল। শ্রান্ত হয়ে ফরাসে ঠেস দিয়ে আছি, তখন চাঁদ উঠেছে—একটু তন্দ্রাভাব আসছে, এমন সময় দেখতে পেলাম ঠাকুর এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলছেন, 'আমি যে অবতার হয়ে এসেছিলাম তা-কি কেউ চিনল রে?' এখনও আমার চোখের সামনে সেই ছবিটা ভাসছে।"

১৮.৫.৩৬—জনৈক ব্রহ্মচারীভক্তকে ধ্যান-ভজন সম্বন্ধে বললেন, "তোকে অত চক্ষু বুজে বসে থাকতে হবে না। ঠাকুরঘরে যখন বসবি, তখন চোখ বুজে বসবি কেন? চেয়ে থাকবি ঠাকুরের দিকে, মনে করবি ঠাকুর স্বয়ং বসে আছেন। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের ছোট ঘরে আছেন, ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন ভক্ত বসে আছেন। তিনি কত রকম উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা শুনছেন আর মাঝে মাঝে চোখ বুজছেন, সেই সময় ঠাকুর তাঁদের বললেন, 'ওগো, তোমরা চোখ বুজে কি দেখছ?' আমি তখন তাঁর কথা বুঝতে পারিনি, পরে বুঝলাম যে স্বয়ং অবতারপুরুষ এসেছেন, তাঁকে প্রাণভরে দেখে নয়ন সার্থক কর। স্বয়ং ভগবান তোমার কাছে, আর তুমি চোখ বুজে কি ভাবছ? এই কথা স্বামীজীকে বলি, তিনি শুনে ভারি খুশি।

"তখন আমরা কলকাতার মধ্যে কোথায় নির্জন স্থান খুঁজে বেড়াতাম। একদিন ইডেন গার্ডেনে গিয়েছি, দেখি একটা পাতাবাহারের গাছ দিয়ে ঘেরা 'রো', তার মধ্যে দু-জন ধ্যান করছে, আমরাও তার মধ্যে বসলাম। আমাদের ধ্যান জমে গেল। ধ্যান ভাঙতে দেখি তারা দু-জন এক এক বার চোখ বোজে, আর চোখ টেপে। নিরাকার-ধ্যানে সাধারণ লোক চোখ বুজলে অন্ধকার দেখে। সাকার-ধ্যানে ভক্ত চোখ বোজামাত্র প্রভুর জ্যোতি দর্শন করে। বসে ধ্যান করার চেয়ে কাজ করবে, আর মনে প্রভুকে স্মরণ করে তাঁর নাম করবে। চোখ বোজামাত্র ইষ্টদর্শন হয় এরকম লোক কজন আছে?"

১৯.৫.৩৬—"খুব কাজ করবে, সর্বদাই একটা না একটা কাজে মন লাগিয়ে রাখবে,

তাহলে মন অসৎ-চিন্তা করতে পারবে না; আর যদি চুপ করে বসে থাক তা নানান কু-চিন্তা এসে তোমার চিত্ত অধিকার করবে, আর সেই সময় একজন সঙ্গী পেলে পরনিন্দা পরচর্চা করতে আরম্ভ করে দেবে।

"বিশ্রাম কি জান? এক কাজ থেকে আর এক কাজে লাগা। যেমন তুমি জমি খুঁড়তে খুঁড়তে পরিশ্রান্ত; সেটা বন্ধ করে খানিকটা ছুতোরের কাজ করলে, আবার সে-কাজ থেকে আর এক কাজে লাগলে। এমনি করলে কাজ একঘেয়ে মনে হয় না, কাজ ভাল লাগে।

"দেখ, আমাদের অবতাররা এসে আগে কর্ম থেকেই শিক্ষা দেন। এই দেখ কৃষ্ণ, অবতার— জন্ম হলো কারাগারে, সেই দুর্যোগে জন্মেও নিস্তার নেই, কোথায় নন্দের বাড়ি, সেখানে যেতে হবে, তা আবার যেতে যেতে রাস্তায় নদীতে পড়ে গেলেন। নন্দের বাড়ি পৌঁছেও নিস্তার নেই, এই পূতনা বধ, ঐ অমুক বধ—ছোটবেলা থেকেই কাজ আরম্ভ! শেষ পর্যন্ত কি কষ্টটা না ভোগ করতে হলো। রাম-অবতারেও দেখ—ছোটবেলাতেই তাড়কা বধ, তারপর বনে যেতে হলো! সারাজীবন কত কষ্ট, তা তো জানই। বুদ্ধ অবতারে কি কঠোর সাধনা, শুনলে গা রোমাঞ্চিত হয়। বাবা, কর্ম না করলে কিছু হচ্ছে না। আগে কর্ম চাই; কর্ম করতে করতে সব ঠিক হয়ে যাবে।

"আমাদের ঠাকুরের কথা? দেখ, তিনি পতিতপাবন—কত সাধনা, কত কষ্ট করে গেছেন। শেষে গলায় ঘা হলো, ডাক্তাররা কথা বলতে মানা করলেন, তবুও জীবের কল্যাণের জন্য কথা না বলে থাকতে পারেন নি। যেমনি ভগবৎ-প্রসঙ্গ আরম্ভ হতো, অমনি ভাব হতো, উপদেশ দিতেন, আর গলার ঘা বেড়ে যেত। ডাক্তাররা হাজার মানা করেও তাঁকে কথা বলা থেকে নিরস্ত করতে পারেন নি।

"কখন কখন তিনি আমাদের তাঁর পাশে বসিয়ে ধ্যান করাতেন, ধ্যান করতে করতে রোমাঞ্চ-পুলক হতো, চোখ থেকে ধারা বয়ে যেত, ভাবে হাসিকান্না, আর ধ্যানে যেন কার সঙ্গে কত কথা হচ্ছে—কি চমৎকার বল দিকি! এরকম অবস্থা কি সহজে হয়? কর্ম করে যাও। মনকে খবরদার অসৎ-প্রসঙ্গে বা অসৎ-কাজে লাগাবে না।

"যারা ভগবানকে যথার্থ ডাকে, তাদের চেহারা চালচলনই আলাদা হয়। তাদের দেখলে আনন্দ হয়। তাদের মুখ সর্বদা প্রফুল্ল থাকে, হৃদয় পবিত্র থাকে, মন রাগ-দ্বেষশূন্য হয়, তারা সর্বদা সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে থাকতে চায়; তারা ভালমন্দ এক দেখে। ভালও তাদের কাছে ভাল, মন্দও তাদের কাছে ভাল।

"ধর, তুই ঠাকুরঘর থেকে এলি, আমি যদি সেই সময় তোর মনের মতো একটা কথা না বলি, আর তুই যদি রেগে যাস, তাহলে এতক্ষণ ঠাকুর ঘরে বসে কি হলো? স্বামীজী বলতেন—কীর্তন করতে করতে কারো ভাব হলো, মাটিতে পড়ে গেল, তারপর যখন ভাব

ছেড়ে গেল তখন ভোগের দিকে মন! এটা কি রকম ভাব হে বাপু? এরকম ভাবের উপর তিনি ভয়ানক চটা ছিলেন।

"স্বামীজীর একটা মহৎ গুণ ছিল—তাঁকে কেউ সহজে রাগাতে পারত না। হয়ত একটা লোক তাঁর সামনে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলছে—তাঁর নিন্দা শুরু করে দিল, নানা রকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। স্বামীজী কিন্তু রাগা দূরের কথা, মুচকি হেসে হেসে তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। স্বামীজীর এই গুণের কথা রাজপুতানায় খুব সাধারণ লোকদের মুখেও শুনেছি। বিলাতের লোক স্বামীজীর পাণ্ডিত্যে যত না মুগ্ধ হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে তাঁর সাধারণ বুদ্ধিমত্তায় এবং তাঁর অমায়িক ব্যবহারে।

"আমি তাই বলি, যে যত বুদ্ধিমান হয়, তার তত রাগ কম হয়। যে যত বোকা হবে, তার রাগ তত বেশি হবে। রাগ করা একদম ভুলে যা। রাগের উপর রাগ কর, বলবি 'খবরদার, বেটা মাথা তুলতে পারবি না।'

"দেখ, ঠাকুর কেমন সহজ কথায় মীমাংসা করে দিয়েছেন। ঠাকুরের আগে এরকম কথা কেউ বলেননি—যেমন 'শ ষ স—যে সয়, সে রয়, তার হয়।' তাই বলি খুব সয়ে যাবি। একেবারে মাটির মানুষ হয়ে যা, রাগ একদম থাকবে না।

"যখন যে অপরাধ করবি, তৎক্ষণাৎ তা বলে দিবি, খবরদার লুকিয়ে রাখবি না, এতে ভারি খারাপ হয়। অপরাধ হলে মুখের সামনে বলে দিলে তখনই তার মীমাংসা হয়ে যায়। যে উদার, যার হৃদয় আছে, তার শত অপরাধও স্বামীজী ধরতেন না। হৃদয়বান লোকের প্রতি তাঁর ভালবাসার কত গল্পই মনে পড়ছে।"

(উদ্বোধন ঃ ৫৩ বর্ষ ৮ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের কথা

(আশ্রমবাসীদের ডায়েরির কয়েক পৃষ্ঠা)

২১।৫।১৩৩৬ (ইং ৬।৯।২৯)

আশ্রমবাসীদের কাহারো কাহারো আলস্যে ব্যথিত হইয়া মহারাজ বলিতেছেন—"আমাদের এই পতিত দেশ কি সহজে জাগবে? দেশটাকে তমোতে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমরা এত কুঁড়ে হয়ে পড়েছি যে, মাথার ওপর ঝুল ঝুলছে, হাত দিয়ে সেটা অক্লেশে সরিয়ে দিতে পারি, তা দেব না। সেটা যখন মুখে এসে পড়বে, তখন কোন রকমে মুখ থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় ফেলব। আর একতা নেই, হিংসেতেই মরে যায়। শুধু মুখে বলবে ভাই ভাই একঠাঁই, কাজের বেলা একেবারে বিপরীত।"

২২।৫।১৩৩৬

শ্রীশ্রীঠাকুর এবং স্বামীজীর সৌন্দর্যানুরাগ-প্রসঙ্গে বলিলেন, "ঠাকুর যখন কালীমন্দিরে যেতেন, তখন হয়ত মায়ের কাপড়টা টেনে একটু সরিয়ে দিলেন, নথ একটু নেড়ে দিলেন, যেখানে যেটি থাকলে মানায়—ঠাকুর তা ঠিক করে দিতেন।

"স্বামীজী আর্ট খুব ভালবাসতেন। প্রথম আমেরিকা যাবার সময় জাপানে নেবে জাপানের সৌন্দর্যজ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কতই সুখ্যাতি করে লিখতেন, আর বলেছিলেন—'একখানা ছবির দাম ছ-হাজার টাকা, ছবিটা এত সুন্দর যে ভাবলাম—আমার ঐ পুঁজি টাকা খরচ করে ছবিটা কিনে ভারতবর্ষে ফিরে যাই, আমেরিকায় আর যাব না'।"

৩০।৫।১৩৩৬

জনৈক আশ্রমবাসীর অপরের প্রতি ঔদাসীন্যে আহত হইয়া মহারাজ তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "নিজেকে দশজনের মধ্যে বিলিয়ে দে। এই যে আমরা জগতে একটা সাড়া তুলেছি, এ কিসের জন্য? আমাদের পেট থেকে দুটো হাত বেরিয়েছে না কি? আমরা যে নিজেকে দশের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি; আমরা যে দশের সুখে সুখী, দশের দুঃখে দুঃখী। আমাদের মধ্যে আমার বলতে আর আমি যে কে তা খুঁজে পাই না।

"নিজে যখন খেতে বসি, তখন তোদের কথা ভাবি, তোরা কে খেলি না খেলি সব ভাবি। খেতে বসে সকলেরই এরকম ভাবা উচিত—কে খেলে না খেলে, কি খেলে, খাবে কি না, এসব

খোঁজ রাখা উচিত। এ না পারিস তো পশু আর তোতে বিশেষ প্রভেদ থাকল না। নিজেকে দশের মধ্যে যত ছড়িয়ে দিবি ততই তুই নিজেকে ঠিক বুঝতে পারবি। যে যত নিজেকে ভুলতে পারবে, সে তত নিজেকে চিনতে পারবে।"

নানা দেবদেবীর কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"দেবীপুরাণে দেবীর মাহাত্ম্যই কীর্তন করা হয়েছে। তাতে আর কোন দেবতার মাহাত্ম্য নেই, তেমনি শিবপুরাণে শিবের, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর, ইত্যাদি।

"যে দেবদেবীর পূজাই কর না কেন, ঠাকুরকে সেই দেবদেবী বলেই ভাববে এবং সেই দেবদেবীর যে রকম পূজার বিধি, সেই রকমই পূজা করবে। মহাবীরের পূজাতে মহাবীরের জয় দেবে, সে সময় ঠাকুরের জয় দেবে না, এইরকম সব দেবতার বেলা। মহাবীর মহাবলবান, বীর্যবান, তেজস্বী; তাঁর জয় বা তাঁর নাম মিনমিনে গলায় করলে চলবে না। তাঁর জয় হুঙ্কার ছেড়ে দেবে, সেই মহাবীরের ভাবটা তখন নিজের মধ্যে আনবে।

"একদিন বরাহনগর মঠে স্বামীজী আর আমরা কয়েকজন গুরুভাই মিলে শিবের গান গাইছি। গাইতে গাইতে আমি একবারে লাফিয়ে উঠেছি, গান থেমে যাবার পর স্বামীজী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—'তুই গাইতে গাইতে অমন করে যে লাফিয়ে উঠলি?' আমি বললাম, 'ভাই, ঐ গান গাইতে গাইতে আমি দেখলাম যেন শিব জটা ঝাড়া দিয়ে আমার ভিতরে লাফিয়ে উঠেছেন। আর আমি ভাবলাম—আমার গলাটা যদি এত মোটা হতো যে জড়িয়ে ধরা যেত না, আর সেই গলায় যদি শিবের নাম করতাম তবে তো ত্রিভুবন তাল ধরত।' 'ত্রিভুবন ধরত তাল' 'ঠিক ঠিক হতো!' স্বামীজী হাসতে হাসতে সব গুরুভাইদের বলতে লাগলেন—'দেখছিস, কেমন ভাবের কথা বলছে, ঐ রকম ভাব হলে তবে তো ঠিক হলো।' "

* * *

একটু পরে বলিতেছেন, "যে ঠাকুরকে মন সঁপেছে তার আর ভাবনা কি?" একজন ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়াছেন বলায় মহারাজ বলিলেন, "শ্রীশ্রীমাকে যখন দর্শন করেছ, তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করার মতো ফল হয়েছে। মাকে দর্শন করা আর ঠাকুরকে দর্শন করা এক কথা।"

১।৬।১৩৩৬ (ইং ১৭।৯।২৯)

শহীদ যতীন দাসের মৃত্যুর কয়েক দিন পর। মহারাজ বলিতেছেন, "আমার না খাওয়াটা দেখছি ঠিকই হয়েছে। আহা, দেশের একটা ছেলে দেশের জন্য না খেয়ে খেয়ে প্রাণ দিল! দেখ, ভগবান তাই আমাকে পাকেচক্রে ফেলে খাওয়া বন্ধ করালেন। আমরাই তো দশের জন্য আগে কেঁদেছি। সেই ভাবেই তো এখন ওরা দশের জন্য প্রাণ দিতে শিখছে।

"যদি রাজনৈতিক কারণে না খাই তো খুব খারাপ হতো। তাই দেখ ভগবানের কি ইচ্ছা, পাকেচক্রে আমার খাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল। আমিও কাশ্মীরে ঐ রকম করেছিলাম। মিছিমিছি সন্দেহ করে আমাকে জেলে রেখেছিল। আমিও তখন অনশন করেছিলাম। সরকার এটা কি ভাল করছেন? না খেয়ে মরে যাচ্ছে তবু ছাড়ছে না! এসব দেখে লোকের নজর সরকারের ওপর ভাল থাকবে না।"

২।৬।১৩৩৬ (ইং ১৮।৯।২৯)

দেশসেবার কথায় মহারাজের পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। একটু আবেগের সহিত বলিতেছেন, "কে আগে সাধারণের দুঃখ দেখে স্বামীজীকে আমেরিকায় লিখেছিল, আর স্বামীজীই বা কি লিখেছিলেন তা পত্রাবলীতে পড়েছিস তো? দেখ, সেই থেকে দেশের কাজের একটা মোড় ফিরে গেল। কোথায় আমি মনে করেছিলাম ভ্রমণ করে জীবন কাটাব, তা ঠাকুর আমাকে কোথায় মুর্শিদাবাদের একটা পাড়াগাঁয়ে চাষাদের মধ্যে সারা জীবনটা ফেলে রাখলেন। আশীর্বাদ করি বেঁচে থাক—দেখবি কালে কি হয়। কর্ম ছাড়া গতি নেই, খুব কাজ করে যাবি। গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকবি না, কাজ করে যাবি, আর ভাববি—কিছুই তো করলাম না, তা হলে আত্মার শক্তি বাড়বে। আর যদি একটু কাজ করে ভাবিস অনেক করেছি—তাহলে ঐখানেই শেষ, তার উপরে যেতে পারবি না। আত্মা মহাশক্তিমান—আত্মার মধ্যে মহাশক্তি নিহিত। তাকে যত ফুটিয়ে তুলবি—তত তোর আত্মবিকাশ হতে থাকবে।

"আমার কাছে থেকে একটা লোক কি রকম উতরে গিয়েছে শোন। চৌবে বলে একজন লোক এসেছিল। সে যখন আসে তখন আমাদের খুব লোকাভাব। সে এসেই আমাকে বললে—আমি সাধুসেবা করব, সাধুর যদি ব্রাহ্মণশরীর হয় তবেই সেবা করব—নচেৎ নয়। তারপর আমার কাছে থাকতে থাকতে অনাথ বালকদের বমি শুধু হাতে ফেলত, বিষ্ঠামূত্রও পরিষ্কার করত, প্রাণপণ তাদের সেবা করত। কি রকম পরিবর্তন হয়েছিল দেখ!

"স্বামীজীকে এর কথা বলাতে তাঁর চোখে জল এসেছিল, আর বলেছিলেন, 'তুই খুব ভাল worker (কর্মী) তৈরি করেছিস তো, এমন সেবা কজন করতে পারে? কটা শিক্ষিত লোক পারে? তারা শুধু লেখাপড়াই করে মরে গোলামির জন্য। আর এ মূর্খ হয়েও হৃদয়বান।'

"শেষে লোকটি এমন হয়েছিল যে, হয়ত রান্না করে সকলকে খাইয়ে নিজে ভাত বেড়ে খেতে বসবে—এমন সময় এক অভুক্ত অতিথি এল, অমনি সেই বাড়া ভাত তাকে খেতে দিল, আর নিজে না খেয়ে হর হর বম্‌বম্ করতে লাগল। ছেলেদের মুখে আমি শুনি, চোবেজীর খাওয়া হয়নি, মুখ দেখে তা বোঝা যেত না, সদা প্রসন্ন। এ কি কম ত্যাগের কথা? আর দেখ, স্বামীজী কত বড় হৃদয়বান! এই সব কথা শুনে তাঁর চোখে জল এসেছিল!

"আমরা পরের জন্য হৃদয়টা ছিঁড়ে দিতে পারি। আমাদের কাছ থেকে যদি কারো এটুকু হৃদয় না হলো, তো আর কি হবে? আত্মজ্ঞান ঢের দূরের কথা। আমি যে কর্ম করতে বলি,

তা মনে করিস না যে, ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করতে বলেছি। ঝোঁকের মাথায় যে কাজ করা যায়, তার reaction (প্রতিক্রিয়া) পরে খুব খারাপ হয়। আমি বলছি যে, বেশ ধীর স্থির হয়ে কাজ করবে। ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করবে না। মধ্য-পথই শ্রেষ্ঠ।"

* * *

"যেটুকু কাজ করেছিস তাতে মনে করবি না যে এত কাজ করেছি, আর কত করব? তা হলে ঐ পর্যন্ত থেকে গেলি—জীবনে আর উন্নতি করতে পারবি না। তোদের বয়সে আমরা কত করেছি, তাই তো এখন দেশময় কি ব্যাপার হচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস। তোরা আমাদের জীবনটা দেখ না। আমরা তাঁর সন্তান। আর তাঁর কথা ছেড়েই দে না। কি কঠোর সাধনা! ১২ বছর নিয়মিত খাওয়া নেই, ঘুম নেই, শুধু সাধনা করেছেন! কি কঠোর বল্ দেখি!

"তোদের আর অতদূর যেতে হবে না, তোরা আমাদের জীবন লক্ষ্য করে কাজ করে যা; তা হলেই তোদের পক্ষে ঢের। সব কাজই শ্রদ্ধা-ভালবাসা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে করবি। ছাড়া ছাড়া কাজ করা ভাল নয়; যে কাজ করবি ষোল আনা প্রাণ দিয়ে সেই কাজ করবি, তবে তো ঠিক ঠিক কাজ করা হলো। তোদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, জাগিয়ে তোল্, নিজেকে যত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখবি, তত খারাপ বৈ ভাল হবে না।"

* * *

"সব সময় মুখ গম্ভীর করে থাকা ঠিক নয়— হাসবি, তামাসা করবি, তবে তো মনকে প্রফুল্ল রাখতে পারবি। ঠাকুর স্ফূর্তি করে কত গল্প বলতেন, কত রসিক ছিলেন! স্বামীজীও খুব রসিক ও 'নকুলে' ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যদি কেউ দেখা করতে এল—আর লোকটি যদি একটু অস্বাভাবিক ধরনের হয়, তবে তো কথাই নেই—সে চলে গেলেই স্বামীজী তার হাতনাড়া, কথা-কওয়া চলাফেরা হুবহু নকল করতে পারতেন। খুব হাসবি, ফষ্টি নষ্টি করবি, ভাল ভাল গল্প করবি—তবে তো স্ফূর্তিতে থাকবি, মন প্রফুল্ল থাকবে।"

১১।৫।১৩৩৬ (ইং ২৭।৯।২৯)

কথা-প্রসঙ্গে মহারাজ বলিলেন, "আমার ইচ্ছে যে, তোমাদের সকলেরই কাছে একটা করে ডায়েরি থাকে। তাতে যে-সব কথাবার্তা হয় তার সারাংশ তুলে রাখবে। শুধু আমার কথা বলে নয়, উল্লেখযোগ্য ঘটনাও তাতে লিখবে। আমার খুব ইচ্ছে যে, মঠের যত সাধু-সন্ন্যাসী তাদের সকলের কাছে একটা করে ডায়েরি থাকবে, আর তাতে সব দরকারি কথা লিখে রাখবে।

"যদি কোন সাধু ভ্রমণে বাহির হয়, হিমালয়ের কোন স্থানের মনোরম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়, সেই সব জায়গার বর্ণনা যথাসম্ভব লিখে রাখবে। কোন সাধুসন্তের সঙ্গে দেখা হলো তো তাঁর সঙ্গে কি কি ধর্মালোচনা হলো তাও লিখে রাখবে।

"এই সব ডায়েরি বছরে শেষে মঠে জমা দিতে হবে; আর মঠে সেইগুলি রেকর্ডের মতো থাকবে। তারপর তার মধ্যে থেকে বেছে বেছে ভালগুলি মঠ-মিশনের মাসিক কাগজে প্রকাশ করতে হবে, তাতে নিজেদেরও অনেক জ্ঞান হবে, আর দশজনও পড়ে মুগ্ধ হবে। আমার ভারি ইচ্ছে এই রকম হয়।"

*   *   *

১৫।৯।১৩৩৬ (ইং ৩০।১২।২৯)

বিনোদ বাবুর সঙ্গে মহারাজের কথা হইতেছে।

বিনোদবাবু—"মা আমাকে বলেছিলেন, 'এই তোর শেষ জন্ম।' যখন মাকে প্রথম দর্শন করি, তখন মা আমার দিকে তাকিয়েই এই কথা বলেছিলেন। কই, আমি তো এখনও কিছু বুঝছি না।"

মহারাজ—"কি বুঝছ না?"

বি—"আজ্ঞে, আত্মজ্ঞান হলো কই?"

ম—"এই জন্য বলছ? তা আত্মজ্ঞান তুমি ইচ্ছা করলেই হতে পারে। তবে কি জান, ঠাকুর তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আত্মজ্ঞান হলেই তো হয়ে গেল, তখন আর কি তাঁর কাজ করতে পারবে? জান তো, ঠাকুর স্বামীজীর চাবিকাঠি রেখে দিয়েছিলেন। আত্মজ্ঞান হলে তো সব হয়ে গেল।

"বড় মহারাজ আর আমি ছোট বেলায় এক দিন দক্ষিণেশ্বরে আসছি, পথে আমি বললাম, 'এখনি যদি আমাদের আত্মজ্ঞান হয় তো কেমন হয়?' বড় মহারাজ বললেন, 'তা হলে এখনি মুখ থুবড়ে পড়ে যাব। তখন কি আমি এখানে থাকব?'

"তোমার আর আত্মজ্ঞানের বাকি কি? তুমি মায়ের কথায় বিশ্বাস কর। বিশ্বাস মস্ত জিনিস। দেখ, গিরিশ বাবুর ঠাকুরের প্রতি কি প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল! একদিন এক জন ঠাকুরের পিকদান পুকুরে ধুতে গিয়েছিল। যেমনি পিকদানের গয়ের পুকুরে ফেলেছে অমনি এক ঝাঁক মাছ এসে গয়েরগুলো কপ কপ খেয়ে ফেলল। তাই না শুনে গিরিশবাবু গদগদ ভাবে বললেন, 'আহা, মাছগুলো তরে যাবে রে, মাছগুলো তরে যাবে, মাছগুলোর এই শেষ জন্ম।' দেখ দেখি কত বড় বিশ্বাসের কথা!

"আর জানই তো ঠাকুর বলেছিলেন, যাদের শেষ জন্ম তারা এখানে আসবেই আসবে। এখন চাই বিশ্বাস। তুমি মায়ের কথায় বিশ্বাস কর, তাঁর মুখ দিয়ে যখন এই কথা বেরিয়েছে, তখন কি আর মিথ্যা হয়?"

২২।৯।১৩৩৬ (ইং ৬।১।৩০)

মহারাজ আজ মঠের কথা বলিতেছেন, "মঠে আজকাল শুদ্ধানন্দ স্নান করে গীতা চণ্ডী না হয় উপনিষৎ পাঠ করে, শুনে আমারও ইচ্ছা হলো। কিন্তু তখনি ঠাকুর যেন বললেন, 'আমি তোকে পেয়েছি, তুই আমাকে পেয়েছিস, মঠও আমি হয়ে আছি, এই মঠে যা দেখছিস সব আমি, তবে তুই আর পাঠ করবি কি? খা, দা, বেড়িয়ে বেড়া, স্ফূর্তি কর, খেলা কর—তোকে আর কিছু দেখতে হবে না।' দাদা (মহাপুরুষ মহারাজ) শুনে বললেন, 'ঠিক তো!' সব শুনে মুখ গম্ভীর করে পায়ের ধুলো নিতে লাগল। তাই আমি যে কয়দিন মঠে ছিলাম ওসব খুঁটিনাটির কথা আর মনেও আসে নি।" ***আশ্রমের একটি ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বাবা বলিলেন, "এই কথাগুলি বেশ মন দিয়ে শোন—এই যে লোকেরা আমাদের টাকা দেয়, একি খামখেয়ালি করে খরচ করলে চলে? খুব বুঝে খরচ করতে হয়। তারা বুকের রক্তের চেয়ে এই টাকা বেশি ভালবাসে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই টাকা রোজগার করে, সেই টাকা আমাদের সৎ কাজে ব্যয় করতে দেয়, সেই জন্য এই টাকা খুব বুঝে খরচ করতে হয়। বুঝলে?"

(উদ্বোধন ঃ ৫৩বর্ষ ১১ সংখ্যা)

স্বামীজী-প্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী অন্নদানন্দ-সংকলিত

স্বামী অখণ্ডানন্দের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অভিন্ন, একই আত্মা যেন যুগ্ম ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়া প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণে যাহা বীজভূত স্বামীজীতে তাহাই অঙ্কুরিত; স্বামীজী যেন রামকৃষ্ণ-সূত্রের ভাষ্য। একই মহাশক্তি কখনো রামকৃষ্ণরূপে, কখনো বিবেকানন্দরূপে তাঁহার জীবনের সঙ্কট-মুহূর্তে দর্শন ও প্রেরণা দান করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিয়ত চালিত করিত। তাই তাঁহার জীবনে ঠাকুরের মতো স্বামীজীর প্রভাব এত গভীর, এত ব্যাপক!

স্বামী অখণ্ডানন্দের মুখে স্বামীজীর প্রসঙ্গ যে কত মধুর লাগিত তা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার নিজেরই ভাষায় এ-প্রসঙ্গ অধিকতর প্রাণস্পর্শী হইবে ঃ

"বেলুড়ে একদিন তখনো রাত আছে, উঠে পড়েছি, উঠেই স্বামীজীকে দেখতে ইচ্ছা হলো। স্বামীজীর ঘরের দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছি, ভেবেছি স্বামীজী ঘুমুচ্ছেন। উত্তর না আসলে আর জাগাবো না। স্বামীজী কিন্তু জেগে আছেন—ঐটুকু টোকাতেই উত্তর আসছে গানের সুরে...

"Knocking knocking who is there?
Waiting, waiting Oh brother dear!"*

* * *

সারগাছি আশ্রমে একদিন স্বামীজীর কথা বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিতেছেন ঃ

"স্বামীজীর কথা কি বলব? তাঁর কাছে আমি এতটুকু। দেখ, মঠে এমন দিনও গেছে যে, আলোচনা করতে করতে রাত দুটো বেজে গেছে স্বামীজী বিছানায় শোন নাই, চেয়ারে বসেই বাকি রাতটা কাটিয়েছেন। আমাদের সকলের আগে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে জামাটা পরে গঙ্গার ধারে পূর্বদিকে বারান্দায় বেড়াচ্ছেন।

---

*গানটির বাকি অংশ ঃ

"Once for all—Oh brother receive me!
Once for all Oh sinner believe me!
Into the cross thy burden fall;
Once for all, Oh, once for all!

"আমি চিরকালই ভোরে উঠি—অতি ভোরে উঠে দেখি তিনি ঐ রকম বেড়াচ্ছেন। স্বামীজীর গর্ভধারিণীর মুখেও শুনেছি বালককালে এবং বড় হয়েও (ঠাকুরের কাছে যাবার আগেও) কখনও বেলা অবধি ঘুমান নাই, কখনও নয়; অতি ভোরে উঠতেন।

"মঠে স্বামীজী ভোরে উঠে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যান করবার নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন। নিজেও আমাদের সঙ্গে গিয়ে ধ্যান করতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের চারদিন জ্বর; জল-সাগু খেয়ে আছেন। স্বামীজী ধ্যান করতে ঠাকুরঘরে যাবার সময় তাঁকেও ডাকলেন, বললেন, 'ওরে আয়, জ্বর—তার আর কি? ধ্যান করবি চল। তোরা যদি জ্বর হয়েছে বলে ধ্যান না করিস—লোকে তোদের দেখে কি শিখবে?' বলে তাঁকে সঙ্গে করে ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন।"

আর একদিনের কথা বলিতেছেন ঃ "মঠ তখনও নীলাম্বর মুখুয্যের বাগানে—একদিন দুটো পর্যন্ত বেদ-বেদান্ত আলোচনা হয়েছে ঃ পুনর্জন্ম আছে কিনা—মানবাত্মার অধোগতি হয় কি না। স্বামীজী তর্ক লাগিয়ে দিয়ে মধ্যস্থ হয়ে চুপ করে হাসছেন। আর যে পক্ষ পারছে না—তাদের নতুন যুক্তি দিয়ে উসকে দিচ্ছেন। দুটোর পর আলোচনা ভেঙে দিলেন। তারপর সব ঘুম। চারটে বাজতে না বাজতেই স্বামীজী আমাকে তুলে দিলেন—দেখলুম এর মধ্যেই তিনি সব সেরেসুরে পায়চারি করছেন, আর গুন্‌গুন্ করে গান গাইছেন। আমায় বললেন, 'লাগা ঘণ্টা; সব উঠুক, শুয়ে থাকা আর দেখতে পারছি না।' আমি তাও একবার বললুম—'এই দুটোর সময় সব শুয়েছে, ঘুমোক না একটু।' স্বামীজী কঠোর স্বরে বলছেন—'কি, দুটোর সময় শুয়েছে বলে ছটার সময় উঠতে হবে নাকি? দাও আমাকে, আমি ঘণ্টা দিচ্ছি—আমি থাকতেই এই! ঘুমোবার জন্যে মঠ হলো না কি?'

"তখন আমি খুব জোরে জোরে ঘণ্টা দিলাম। সব ধড়মড় করে উঠেই চীৎকার—'কে রে, কে রে?' আমায় বোধহয় ছিঁড়েই ফেলত; কিন্তু দেখে আমার পেছনে স্বামীজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। তখন সব উঠে পড়ল।"

* * *

জনৈক আশ্রমবাসীকে বলিতেছেন ঃ "দেখ, তোমাদের মতো বয়সে আমাদের কেউ মারলে একটি কথা বলতাম না। স্বামীজী কত গালমন্দ দিতেন। সব চুপচাপ হজম করতাম। স্বামীজী মহাবুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর রাগ একেবারেই ছিল না। তিনি 'অক্রোধপরমানন্দ' ছিলেন। রাজপুতানায় গেছি। সেখানে নাপিত আমায় কামাচ্ছে আর বলছে, 'মহারাজ, আপনাদের স্বামীজীর তুলনা নেই, আমরা মূর্খ, তার পাণ্ডিত্যের বিষয় কি বুঝব? অমন ক্রোধ সম্বরণ করতে কাউকে দেখিনি। পণ্ডিতেরা তাঁকে বিচারে পরাস্ত করতে এসেছে, অপমানসূচক উত্তর দিচ্ছে—আর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। শেষে যারা তার নিন্দা করতে এসেছিল তারাই তাঁর গোলাম হয়ে গেল।

"কোন বিষয় শিক্ষা করতে হলে আমাদের মনে হতো না, ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট, ওর কাছে কি শিখব? স্বামীজীর মতো পণ্ডিত, তিনিও খেতড়িতে নারায়ণদাসের নিকট পাণিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। খেতড়িতে তাঁর চেয়ে সম্মানের যোগ্য কে ছিল? রাজার গুরু বলেও বটে, আবার নিজের ত্যাগ তপস্যা পাণ্ডিত্যেও বটে। তিনি আমায় বলেছিলেন, 'নারায়ণদাসের কাছে ছাত্রের মতন পড়া শুরু করে দিলাম।'

"মন একাগ্র হলে বাহ্যজগতের সম্বন্ধ লোপ হয়ে যায়। স্বামীজীর এই অবস্থা হতো। যখন রাজেন্দ্র মিত্রের লেখা বৌদ্ধযুগের ইতিহাস পড়তেন তখন কিছুক্ষণ পড়ার পর বই পড়ে থাকত। তাঁর মন এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলে যেত। স্বামীজী বলতেন—'ঘর, বাড়ি, বই, চেয়ার বেঞ্চ সব উড়ে যেত—কিছুই নেই—এক অনন্ত রাজ্যে আমার সত্তা হারিয়ে যেত।' শঙ্করাচার্য ও বুদ্ধদেবেরও এই অবস্থা হতো।"

* * *

১৮৯৮ খ্রীঃ যখন কলিকাতায় ভয়াবহ প্লেগ শুরু হয় স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন স্বামীজীর সঙ্গে দার্জিলিং-এ ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ

"স্বামীজী অমন রসিক পুরুষ ছিলেন, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি—একেবারে গম্ভীর। সারাদিন কিছু খেলেন না, চুপচাপ। ডাক্তার ডেকে আনা হলো, কিন্তু তাঁর রোগ নিরূপণ করতে পারলেন না। একটা বালিশে মাথা গুঁজে বসে রইলেন সারাদিন! তারপর শুনলাম কলকাতায় প্লেগ—তিনভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে—শুনে অবধি এই! সে সময় স্বামীজী বলেছিলেন, সর্বস্ব বিক্রি করেও এদের উপকার করতে হবে। আমরা যে গাছতলার ফকির সেইখানেই যাব।

"স্বামীজীর কি প্রাণ! তার শতাংশের একাংশ আমাদের কারও নেই। আমরা তো তাঁর গুরুভাই, অন্য পরে কা কথা। দেশের দুঃখ কষ্টের কথা বলতে বলতে স্বামীজী কেমন হয়ে যেতেন। আমি তখন তাঁকে জিগ্যেস করতাম, ভাই, কেন দেশ জাগছে না? তার উত্তরে তিনি বলতেন, 'ভাই, এ যে পতিত জাত! এদের লক্ষণই এই।' আহা স্বামীজীর তুলনা নেই!"

* * *

স্বামীজী-প্রসঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দ আরও বলিয়াছেন ঃ "স্বামীজী যখন যে ভাবের উপর জোর দিতেন, তখন মনে হতো সেইটিই সত্য, একমাত্র সত্য। মঠে প্রায়ই এ-রকম হতো। তাই হঠাৎ কেউ এসে তাঁর ভাব ধরতে পারত না।

"যেদিন সেবাধর্মের কথা উঠল সেদিন এমন বললেন যে মনে হলো—নিষ্কাম কর্মযোগই একমাত্র পথ—আর সব মিথ্যা, ভুল। যেদিন শাস্ত্রপাঠ কি ধ্যান-ধারণার কথা উঠল সেদিন আবার আর এক ধরন, মনে হতো জ্ঞানের পথ বা ধ্যানের পথই পথ, আর সব বাজে কাজ। সেদিন স্বামীজীকে মনে হতো—বুঝিবা সাক্ষাৎ শঙ্কর অথবা বুদ্ধ। আর যেদিন তিনি রাধারাণী,

গোপীভাব বা প্রেমভক্তির কথা বলতেন সেদিন তিনি সম্পূর্ণ আর একটি মানুষ—বলতেন ঃ 'Radha was not of flesh and blood. She was a froth in the Ocean of love.' (শ্রীমতী রাধা রক্তমাংসের নয়, তিনি প্রেমসমুদ্রের একটি বুদ্বুদ!)

"এ-কথা তাঁকে বহুবার বলতে শুনেছি; হয়তো আপন মনে বলছেন, আর জোরে জোরে পায়চারি করছেন। অথচ সাধারণত কেউ রাধাকৃষ্ণ বা গোপীপ্রেম আলোচনা করলে থামিয়ে দিতেন, বলতেন, 'শঙ্কর পড়, শিবের ভাবে ভরে যাও।' ত্যাগ, জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম—এগুলির ওপরই জোর দিতেন।"

* * *

স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণের কথায় বলিতেছেন ঃ "এক জায়গায় স্বামীজী গেলেন বনের পথ দিয়ে, আমাকে বললেন—একটু ঘুরে যেতে; কিছু দূরে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা, দেখি স্বামীজী একা—কিন্তু হাসছেন, কার সঙ্গে যেন কথা কইছিলেন, চোখে মুখে কি এক আনন্দের ভাব! জিগ্যেস করলাম, 'ভাই, কার সঙ্গে কথা কইছিলে?' তিনি চুপ করে শুধু মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

"স্বামীজী ও আমি একসঙ্গে যেতে যেতে পাহাড়ে এক জায়গায় দেখি এক সাধু ধ্যান করতে বসেছে—বেশ কাপড়চোপড় মুড়ি দিয়ে মাথা পর্যন্ত, আর সজোরে নাক ডাকাচ্ছে। স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠেছেন, 'ওরে! বেটা বসে বসে ঘুমুচ্ছে—দে বেটার কাঁধে লাঙ্গল জুড়ে। তবে যদি এর কোন কালে কিছু হয়।'

"এই সব দেখে শুনেই তিনি বলতেন, 'সত্ত্বের ধুয়া ধরে দেশ তমঃ-সমুদ্রে ডুবতে বসেছে, এদের বাঁচাতে হলে চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় বিদ্যুৎসঞ্চারী রজোগুণ'। তাইতো কর্মের ওপর এত জোর!

"পরোপকারে কাহার উপকার?—আমার নিজের—এইতো স্বামীজীর কর্মযোগ—সেবাধর্ম। ...সেবায় চিত্তশুদ্ধি, সেবায় হৃদয়ের বিস্তার, সেবায় সর্বভূতে আত্মদর্শন। আত্মজ্ঞান হলে পর বিশ্বপ্রেম। তখন বোঝা যায় সেই অনুভূতি—'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু—সর্বভূতে সেই প্রেমময়'!"

* * *

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

"জীবসেবা শিবসেবা। জীব আর আছে কে?—সবই তো শিব!"

* * *

স্বদেশী-যুগে দেশপ্রেমিক ছাত্র-যুবকের দল তাঁহার নিকট স্বামীজীর কথা শুনিতে

আসিত—তাহাদের স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া স্বামীজীর কাজে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাহারা বৎসর বৎসর আশ্রমে আসিয়া নিজেরাই স্বামীজীর জন্মোৎসব করিত। এই-প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, "সারারাত স্বামীজীর গান গাইতে গাইতে তারা উৎসবের আয়োজন করত।

"'গুরুগত প্রাণ, গুরু ধ্যান জ্ঞান, গুরুপদে মন দেহ সমর্পণ' এই গানটি তিনি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, নিজেও তন্ময় হইয়া গাহিতেন, গাহিতে গাহিতে তাঁহার অন্তরে স্বামীজীর স্বরূপটি যেন ফুটিয়া উঠিত।"

স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর কথা উঠিলে প্রায়ই বলিতেন ঃ "এ-যুগে ঠাকুর স্বামীজীই প্রত্যক্ষ দেবতা! ঠাকুর যে সাক্ষাৎ ভগবান এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বামীজীর দেখা পাওয়া সহজ, তিনি দেখা দেবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল! ঠাকুর কিন্তু এত সহজ নয়।

"এ-যুগের লোক স্বামীজীর ভেতর দিয়েই ঠাকুরকে বুঝবে। এইজন্য দেখছ না—লোকে স্বামীজীর ভাব আগে নিচ্ছে। এই সব সেবাকার্য, রিলিফ, দেশপ্রেম—এর ভেতর দিয়েই field (ক্ষেত্র) তৈরি হবে, চিত্তশুদ্ধি হবে। তারপর Spiritual (আধ্যাত্মিক)—সবে তো জীবসেবা আরম্ভ—প্রেম এখনো বহুদূর!

* * *

"Hand, Head and Heart (হাত, মস্তিষ্ক ও হৃদয়)—তিনটিরই চর্চা করতে হবে—স্বামীজীর ভিতর তিনটিই ফুটেছিল, আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রথমটি থেকে। স্বামীজীর মতো Spiritual (আধ্যাত্মিক) আমরা না হতে পারি—তাঁর মতো heart or intellect (হৃদয় ও বুদ্ধি) না থাকতে পারে, কিন্তু হাতের কাজটার দিক দিয়ে তো আমরা তাঁর অনুসরণ করতে পারি। মঠে তিনি এত-বড় হাণ্ডা মেজেছিলেন, এক ইঞ্চি পুরু ময়লা! আমরা কি একটি বাটিও পরিষ্কার করতে পারি না?

"তিনি মঠের পায়খানা পরিষ্কার করেছেন। তা জানো? একদিন গিয়ে দেখেন খুব দুর্গন্ধ—বুঝতে আর বাকি রইল না—গামছাটা একটু মুখে বেঁধে দু-হাতে বালতি নিয়ে যাচ্ছেন, তখন সব দেখতে পেয়ে বলে, 'স্বামীজী আপনি!' স্বামীজী হাসি হাসি মুখ, বলছেন, 'এতুক্ষুণে স্বামীজী আপনি!!'

"'স্বামীজী, স্বামীজী' কর—স্বামীজী তো Principle-এর (উচ্চনীতির) একটি প্রতিমূর্তি—কালো slide-এ যে-সব কথা তাঁর দেখলে—তিনি তাঁরই প্রতিমূর্তি! তিনি রক্ত-মাংসে তৈরি ছিলেন না—idea (ভাব) দিয়ে গড়া—তিনি রাধা সম্বন্ধে যেমন বলতেন, 'Radha was a froth in the Ocean of love. She was not of flesh and blood'—তেমনি তিনিও! Principle (নীতি) বড় ভয়ানক জিনিস! তার জন্য সব ত্যাগ করতে হয়—Principle-ই তো ideal (নীতিই তো আদর্শ)।"

একটু পরে আবার বললেন—"স্বামীজীর যে এই দেশপ্রেম—এ অত সোজা নয়। এ Patriotism (প্যাট্রিয়টিজম্) নয়—এ দেশাত্মবোধ। সাধারণ লোকের হচ্ছে দেহাত্মবোধ, তাই দেহেরই সেবাযত্নে বিভোর। তেমন স্বামীজীর হচ্ছে দেশাত্মবোধ—তাই সারাদেশের সুখ-দুঃখ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নিয়ে তাঁর চিন্তা। দেশাত্মবোধই তাঁর শেষ নয়, এর পরও আছে বিশ্বাত্মবোধ—জগতের সকল জীবের জন্য চিন্তা—তাদের জ্ঞান ভক্তি মুক্তি কি করে হবে—সেও তাঁর চিন্তা। সবার মুক্তি না হলে তাঁর মুক্তি নেই।"

স্বামীজীর সর্বজীবে ভালবাসা সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ

"স্বামীজী শেষ দিকটায় মানুষের সংস্রব এক রকম ছেড়ে দিয়েছিলেন—মঠে এক প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা করেছিলেন—চিনে হাঁস (যশোমতী), রাজহাঁস (বোম্বেটে), পাতিহাঁস, নানা রকমের পায়রা, কুকুর, সারস, বেড়াল, মেড়া ইত্যাদি পুষেছিলেন। তাদের যত্ন করে খাওয়াতেন, আদর করতেন—একদৃষ্টে সস্নেহে তাকিয়ে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ গোধন নিয়ে কি রকম খেলা করতেন—এই দৃশ্য দেখলে তার অনেকটা ধারণা হয়। তখন স্বামীজীর মুখচোখের ভাব কি অদ্ভুত রকম বদলে যেত—তা আর কি বলব! একেই বলে জীবে প্রেম, বিশ্বপ্রেম!"

*　　　*　　　*

স্বামীজীর কথা বলিতে স্বামী অখণ্ডানন্দ এতই তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডল এক অবর্ণনীয় প্রেম-প্রীতির স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত। বক্তার জীবন্ত অনুভূতি প্রাণস্পর্শী বর্ণনাভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের অপূর্ব গাম্ভীর্য—সব মিলিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে গভীরভাবে আকৃষ্ট ও অধিকতর আগ্রহান্বিত করিত। আশ্রমে কাজের জন্য বেলুড় মঠে তিনি বেশি থাকিতে পারিতেন না, কিন্তু যখন আসিতেন তখন মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ তাঁহার মুখ হইতে স্বামীজীর কথা শুনিতে চাহিতেন। একদিন এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া সমাজ গঠনসম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারা ব্যক্ত করিতেছেন ঃ

"স্বামীজী ইসলামের সামাজিক উদারতা পছন্দ করতেন। তিনি বলিতেন ঃ 'Islamic body with Vedantic brain' — তার মানে মুসলমান হয়ে বেদান্ত পড়া নয়; এর মানে সমাজ হবে ওদের মতো উদার, ওদের সমাজে গ্রহণ আছে, বর্জন নেই; যদি একবার গৃহীত হয়, তা হলে ত্যাগ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে গ্রহণ নেই—যেমন ইহুদীদের, পরন্তু ত্যাগ আছে। ফলে আমরা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি। জাঠরা, শিখরা ঠিক ঠিক উদার বটে, কিন্তু তাদের সমাজ খুব ছোট এবং অশিক্ষিত। তিনি মুঘল রক্তকে বলতেন, 'আত্মার সুরা'—তলোয়ারের মতো খর, আগুনের মতো উষ্ণ। স্বামীজী— শরীর ও মস্তিষ্ক ঐ দুটোর সমবায় চাইতেন, বলতেন, 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক চাই, সে হলো হিন্দু ব্রাহ্মণদের, কিন্তু তাদের Physique নেই,

অর্থাৎ চিন্তাকে কাজে পরিণত করার দৈহিক শক্তি নেই, হাজার বছর দাসত্ব করে দেহে ঘুণ ধরে গেছে'।''

স্বামী অখণ্ডানন্দ বলিতে লাগিলেন ঃ

''স্বপ্নে দেখলুম—স্বামীজী বহরমপুরের রাস্তা দিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে চলেছেন—প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ মুসলমান ফকিরের দেহ—কোমরে কেবল লোহার শিকল ও কৌপীন, হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা—তার মাথায় একটা লোহার বল—সেই বলটা থেকে ছোট ছোট শিকল ঝুলছে। সেইটি বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন। সঙ্গে চার জন শিষ্য।

''জিগ্যেস করলুম, 'এরকম বেশ কেন?' বললেন, 'এরকম শরীর নইলে কাজ করব কি করে? তোদের বাংলার ভেতুড়ে শরীর সামান্য কঠোরতায় ভেঙে পড়ে। জানলি, আমি বসে নেই, আমি এদের মধ্যে ঠাকুরের উদারভাব ছড়াচ্ছি, তাই এদের ফকির সেজে এদের সঙ্গে মিশি।' বললাম, 'ওরা কারা?' এক এক করে চারজনকে দেখাতে লাগলেন—ইরাণ, তুরাণ, খোরাশান, আফগান। জিজ্ঞেস করলুম, 'ওদের দিয়ে তোমার কি হবে?'

''বললেন, 'এইরকম শরীরে বেদান্ত পড়লে তবে ধারণা করতে পারবে।' জিজ্ঞেস করলুম, 'এখন তুমি কি করতে চাও?' বললেন,—'যাতে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এদের মিল হয়। বেদ, মহাভারত পড়ে দেখ এরা তোদেরই জাতভাই। কিন্তু আর একটা শক্তি ক্রমাগত চেষ্টা করছে যাতে মিলটা না ঘটে উঠে।' ''

এই স্বপ্নটি স্বামী অখণ্ডানন্দের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং ইহার কথা তিনি বারংবার বলিতেন ও বুঝাইতেন ঃ ''এইবার তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানের জাগরণ হবে। পাশ্চাত্য জাতিদের সহিত সংঘর্ষে প্রাচ্য জাতিদের জাগরণ হচ্ছে এবং চীন জাপান ও ভারতের অগ্রগতি কেহ রোধ করতে পারবে না।''

(উদ্বোধন ঃ ৬০ বর্ষ ৩ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকণা

স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত

১৯২৭ খ্রীঃ, সারগাছি, শীতকাল। কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবা চা-পানের সময় স্মৃতিকথা আলোচনা করিতেছেন ঃ

"তখন সারগাছিতে আশ্রম করবার জন্য জমির চেষ্টা হচ্ছে। ২২ বিঘা জমির জন্য বহরমপুর কালেকটরিতে ১২৬০ টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও জমি পাওয়া গেল না, আর এক জায়গায় ৪ বিঘা দান-হিসাবে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু আশ্রমের উপযোগী হলো না। শেষে এই ৫০ বিঘা বাৎসরিক ২০০ টাকা খাজনায় কায়েমী বিলি বন্দোবস্ত করবার জন্য প্রস্তুত। পুষ্করিণী খনন, ইমারত প্রস্তুত, বৃক্ষ রোপণ-ছেদন আদি জমিদারের সমস্ত অধিকার (rights) বিলি করতে রাজি—এই মর্মে দলিল লেখাপড়া হবে, বহরমপুরের উকিল বৈকুণ্ঠবাবু দলিল লিখে দেবেন। আমি বললাম, 'আমার নামে জমি নেওয়া হবে না, এ তো আমার নিজের কিছু নয়—এ মিশনের—এ ঠাকুরের। মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে নেওয়া হবে।' বৈকুণ্ঠবাবুকে বেলুড় মঠ থেকে 'মিশনের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী'র নকল আনতে বললাম। সব দেখেশুনে তিনি মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ ও আমি—এই তিন জনকে ট্রাস্টি (অছি) করে দলিল তৈরি করে দিলেন।

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন পুরীতে। তাঁর কাছে দলিল পাঠানো হলো; বাৎসরিক ২০০ টাকা খাজনার দায়িত্ব নিতে তিনি রাজি নন, বৈকুণ্ঠবাবুকে বাৎসরিক খাজনা কমাবার জন্য পত্র দিলেন। আমাকেও লিখলেন। উপরন্তু বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি পুরীর আইনবিদ্‌রা কিছু অদল-বদল করেছিলেন। এই কথা শুনে জমিদার অসন্তুষ্ট। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সব কথা বুঝিয়ে বলবার জন্য আশ্রমের এক ভক্ত-সেবককে পুরী পাঠালাম। ব্রহ্মানন্দ স্বামী তাঁকে বললেন, 'আমি কলকাতায় গেলে, গঙ্গাধরকে আমার কাছে আসতে বলবে—তার মুখে সব শুনে আমার যা বলবার তাকে বলব।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলকাতায় এলে, আমি সব বলে এলাম। সেই সময় ভাগলপুরে রিলিফের কাজ ফেরত স্বামী শঙ্করানন্দ (অমূল্য মহারাজ) স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে জমি দেখতে সারগাছির পুরানো আশ্রমে এসে হাজির; তিনি আশ্রম-স্কুলের শিক্ষক—আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ—কালী ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে শিবনগর থেকে জমি দেখতে গেলেন। জমি দেখে পছন্দ করলেন বটে, কিন্তু বললেন, 'মহারাজ ২৫ বিঘা জমি নিন, ৫০ বিঘা আয়ত্তে রাখা বড় শক্ত—অর্ধেকটা নিন।' অমূল্য মহারাজ মঠে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ-মর্মেই পত্র দিলেন। বিকালবেলা আমি পোস্টকার্ডখানি পেলাম।

"এত কাণ্ড করে জমি নেবার সব ঠিকঠাক হলো, এখন যদি অর্ধেক নেবার প্রস্তাব করা যায়—তাহলে জমিদার অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠবে। এই সব অবস্থা কিভাবে সামলানো যাবে—এই চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। মাঝরাত্রি কেটে গেল, ঘুম এল না—তারপর তন্দ্রাভাব এসেছে, এমন সময়ে স্বপ্নে দেখি—স্বামীজী, মহারাজ, হরি মহারাজ, এঁরা সব এসেছেন, সঙ্গে অমূল্য মহারাজ—উনি দূতী কিনা! স্বামীজী এসে বলছেন, 'গ্যাঞ্জেস্, একটু তেলমাখা গরম মুড়ি আর দুটো লঙ্কা নিয়ে আয়।'—স্বামীজীকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। অমূল্য মহারাজকে বললাম, 'যাও অমূল্য, রান্নাঘরে যাও—লুচি, আলুর দম, হালুয়া—যা যা তুমি জানো তা কর গিয়ে, ভাঁড়ারঘরে সব আছে—যাও, শিগগির যাও।' স্বামীজী বললেন, 'গ্যাঞ্জেস্, দে, মুড়ি দে, আগে নিয়ে আয়।' মুড়ি লঙ্কা এনে দিলাম, স্বামীজী খেতে আরম্ভ করলেন। বললেন, 'হাম্ এক লোটা ভাঙ লেঙ্গে—৫০ বিঘার কম নেশা হবে না।' স্বামীজী বলছেন আর মুড়ি খাচ্ছেন—স্বামীজীর মুড়ি খাওয়া হয়ে গেলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সব চিন্তার অবসান হয়ে গেল, সব মীমাংসা হয়ে গেল। পরদিন মঠে পত্র লিখে দিলাম স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে। আর কোন কথা উঠল না। ৫০ বিঘা জমিই নেওয়া ঠিক হয়ে গেল। এবার দলিল রেজিস্টারির পালা। মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ) তখন কনখলে চলে গেছেন। দলিল প্রস্তুত করে সই করবার জন্য মহারাজের কাছে পাঠানো হলো। ৯০ দিন কেটে গেল। শেষে আমিই গেলাম কনখলে আমমোক্তারনামা (Power of Attorney) সই করাতে। ওটি বাংলায় লেখা ছিল। উত্তরপ্রদেশে রেজিস্টারি করা হবে, তাই সেটি ইংরাজী করতে উকিলবাড়ি ছুটতে হলো। তারপর রুরকীতে মহারাজকে নিয়ে গিয়ে রেজিস্টারি করানো হলো।

"এখন শরৎ মহারাজের পালা। 'উদ্বোধনে' গিয়ে তাঁকে ধরায় তিনি বললেন, 'ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নাম আছে, আবার আমার নাম ঢুকিয়েছ কেন?' যাই হোক তাঁর মত করিয়ে কলকাতায় রেজিস্টারি করিয়ে নিয়ে সারগাছিতে ফিরলাম। ১৯১২ খ্রীঃ আগস্ট মাসে বহরমপুরে দলিল রেজিস্টারি করা হলো।

"'হাম্ এক লোটা ভাঙ লেঙ্গে' ব্যাপারটা কি জানো?—কাশীতে চিমটাধারি একপ্রকার নাগা সন্ন্যাসী গৃহস্থদের বাড়িতে ঢুকে চিমটে পুঁতে দিয়ে বলেন—'এক লোটা ভাঙ লেঙ্গে'—এক লোটা ভাঙ নিয়ে তবে চিমটে মাটি থেকে তুলবেন। এই রকম তাঁদের জোর-জুলুম। স্বামীজী তাদের ভঙ্গিতে বলেছিলেন।

"দেখ, সারগাছি আশ্রমের ছাপ এখানকার মুসলমানদের ওপরও বেশ একটু পড়েছে। আশ্রমের কাছাকাছি এমন সব পরিবারও দেখা যায়, যারা নিরামিষ খায়।

"এই প্রসঙ্গে ১৯০৩ খ্রীঃ দেখা এক স্বপ্নের কথা বলি ঃ বহরমপুরে (রামদাস সেনের

বাড়িতে) গেছি, সেখানে স্বামীজী এসেছেন ; লম্বা দাড়ি, কোমরে লোহার শিকল, হাতে চিমটে, সঙ্গে তিনজন—গৌরবর্ণ, লম্বা, খুব চওড়া বুক, খুব বড় দাড়ি, হাতে খড়পা। স্বামীজীর চেহারা অন্যরকম হলেও ধরে ফেলেছি, ইনি স্বামীজী স্বয়ং। স্বামীজী বললেন, 'আমি এখন অন্য শরীর ধারণ করেছি, আমার সঙ্গে ইরান, তুরান, খোরাসান।' স্বামীজী বললেন, 'যা, এদের গঙ্গা স্নান করিয়ে নিয়ে আয়।' তাদের তিনজনকে নিয়ে বহরমপুরের বাবুদের ঘাটে গেলাম। গঙ্গাজল স্পর্শ করে তাঁদের জলে নেমে স্নান করতে ইঙ্গিত করাতে তাঁরা স্নান করলেন। তাঁদের ভাবভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। স্নানান্তে তাঁদের নিয়ে স্বামীজীর কাছে ফিরলে স্বামীজী বললেন, 'কেমন দেখলি?' আমি বললাম, 'এরা তোমার সাহেব বিবির ওপরে গেছে।'

"আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি, বহু সাধু ফকির সন্ন্যাসী দেখেছি। আগ্রায় দু-জন মুসলমান ফকিরের কথা বেশ মনে পড়ে। একজন 'হাফেজ'ও ছিলেন। সমস্ত কোরান যাঁর মুখস্থ তাঁকে 'হাফেজ' বলে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'কি উপলব্ধি করেছেন?' তিনি বললেন, 'লবণ-সমুদ্রে এক খণ্ড কাঠ। কাঠটা জরে জরে নুন হয়ে গেছে।' গুজরাটে আর একজন বৃদ্ধ মুসলমান ফকির দেখি। তখন রোজার সময়। বিকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, বৃদ্ধের চমৎকার বর্ণ ও গঠন, লম্বা দাড়ি। ফরাসে বসে আছেন, হাতে সাদা মালা। সামনে সরবৎ ইত্যাদি রয়েছে রোজা ভাঙবার জন্য। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব-ধর্ম-মত-অনুযায়ী সাধন-ভজনের কথা বলায় বৃদ্ধ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মালার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'আরবের মাছের দাঁতের মালা, এখন রোজার সময় সর্বদা জপ করতে হয়, ছাড়তে পারি না। অন্য সময় হলে আপনাকে দিতাম।' এমনি তাঁর শিষ্টাচার। সূর্য ডুবু ডুবু দেখে ফকির জপ করতে লাগলেন। কী তাঁর ভাব!"

১৯২৭ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে সারগাছিতে সরসীলাল সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তদের অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবা কিছুদিন চা-পানের পর তাঁহার জীবনকথা আলোচনা করিতেন। একদিন বলিতেছেন ঃ "রিলিফের কাজের শেষে অনাথ আশ্রমটি কিছুদিন মহুলায় থাকার পর, ১৪ বৎসর জমিদারের (মধুসূদন বর্মণীর) বাড়ি ছিল। এখন সে বাড়ির দোতলাটা পড়ে গেছে, একতলারও ভগ্নাবস্থা। ঐ বাড়ির একপাশে জমিদারের গোমস্তা একখানি ঘরে থাকত, আর সমস্ত বাড়িটাই আশ্রমের কাজে ব্যবহৃত হতো। ১৯১২ খ্রীঃ আশ্রমটিকে ওখান থেকে এখানে আনা হয়।

"সারগাছি অঞ্চলে সাধারণ মানুষ আমাকে 'দণ্ডীঠাকুর', 'দণ্ডীবাবা' বা 'বাবা' বলত। শোনা যায়, আমার আগে মহুলা গ্রামে গঙ্গাতীরে এক সাধু থাকতেন। তাঁকে ঐ অঞ্চলের লোকেরা 'দণ্ডীবাবা' বলে ডাকত। ঐ সন্ন্যাসীর প্রতি স্থানীয় লোকেদের বড়ই প্রীতি ছিল। তিনি দেহরক্ষা করলে গ্রামবাসীরা বিশেষভাবে তাঁর অভাববোধ করেন। আমাকে পেয়ে তাদের সেই অভাব দূর হলো ও আমাকে সেই পুরানো নামেই ডাকতে থাকে।

"একবার, ১৮৯৮ খ্রীঃ অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে, এই দণ্ডীবাবা নাম নিয়ে বড় মজার ঘটনা ঘটে। আমি তখন পুরানো আশ্রমে (শিবনগরে)। আশ্রমের জন্য সৈয়দাবাদ অঞ্চল থেকে তিনশ মণ কয়লা আনতে হবে। বহু গরুর গাড়ি দরকার, একসঙ্গে পাওয়া কঠিন। বর্তমান আশ্রমভূমির জমিদার হাজিশেখ আব্দুল আজিজের বাবা হাজিশেখ মহরম আলির সাহায্য চাইলাম। তিনি খান পঁচিশ গাড়ি যোগাড় করে দিলেন বটে, কিন্তু গাড়োয়ানরা শহরে যেতে একেবারে নারাজ। শেষে রফা হলো দণ্ডীবাবাকে অর্থাৎ আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে হবে, আর শেষরাত্রে রওনা হয়ে সকালেই সৈয়দাবাদ পৌঁছতে হবে। রাত ২/২॥ টা নাগাদ গাড়োয়ানরা গাড়ি যুতে এসে ডাকাডাকি করছে 'দণ্ডীবাবা' 'দণ্ডীঠাকুর'। আমি তখন জেগেই ছিলাম।

"সে-সময় আমি প্রায়ই সারা রাত জাগতাম। রাত্রে পড়াশুনা, প্রবন্ধ লেখা প্রভৃতি কাজ চলত। দিনের বেলা আশ্রমের কাজকর্ম, অনাথ বালকদের দেখাশুনা—এতেই দিন কেটে যেত। স্থির হয়ে বসে লেখাপড়া করবার সময় কোথায়? কাজেই রাত্রে ছেলেরা ঘুমুলে দিনের ও সন্ধ্যার কাজকর্মের জের চুকে গেলে তবে ফুরসত মিলত। লিখতে লিখতে পড়তে পড়তে কত দিন সকাল হয়ে গেছে। এই-রকম কত রাত্রি উপরি উপরি জেগে কেটে গেছে। লেখবার সময় অন্তর থেকে কেবলই ভাব ও ভাষা জুগিয়ে আসত, অথচ এদিকে ফরসা হয়ে গেছে, বাতি টিমে হয়ে গেছে, ছেলেদের তুলতে হবে, এক-একবার ঘুমন্ত ছেলেদের দিকে চাইতাম, মন ব্যস্ত হয়ে উঠত—কাজে সব দেরি হয়ে যাবে। অথচ ভাব সব এসে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে না লিখে ফেললে, কাজকর্মে সমস্ত দিন ও সন্ধ্যার পর—১৬/১৭ ঘণ্টা পরে আবার কি সব মনে থাকবে? এমনটি কি তখন বেরুবে?—এই ভাবনা—আর তাড়াতাড়ি কলম চলছে। দিন গেছে, সন্ধ্যা গেছে, রাতও গেল, ২৪ ঘণ্টাতেও কুলোয় না—ঘুমাবার ফুরসত কই? কাজেই ঘুম যেন নিজেই ঘুমিয়ে পড়ত।

"ঘুমের কথায় একটা কথা মনে পড়ছে। তখন স্বামীজীর সঙ্গে ঘুরছি। দুজনে একটা পাহাড়ের কাছে এসেছি। আমি তো পাহাড়ের পোকা—কথা হলো—আমি পাহাড় ডিঙিয়ে উপর দিয়ে ওপারে যাবো, আর স্বামীজী তলা দিয়ে ঘুরে ওপারে যাবেন—দুজনে এক জায়গায় দেখা হবে। সেই মতো কাজ। দুজনে ছাড়াছাড়ি হবার পর যখন স্বামীজীর নিকট আবার এসে পৌঁছলাম, স্বামীজী তখন 'চোখ চেয়ে' দাঁড়িয়ে আছেন একটা ঝোপের কাছে। ডাকতেই স্বামীজী চমকে উঠলেন। স্বামীজী আসলে চোখ চেয়ে ঘুমতেন।

"গাড়োয়ানরা ডাকতেই সাড়া দিলাম। কাপড়-চোপড় পরে বেরুলাম। তখন গেরুয়া লম্বা আলখাল্লা গায়ে দিতাম, মাথায় বড় গেরুয়া-পাগড়ী, পায়ে কাশ্মীরী স্যাণ্ডাল। সকালেই সব সৈয়দাবাদে পৌঁছলাম। রাস্তার উপর এতগুলো গাড়ি গরু একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব, তাই গাড়োয়ানদের বললাম, গঙ্গার ধারে গিয়ে গাড়ি খুলে দাও, গরুদের খাওয়াও। আমি, কুমুদবাবু,

ওভারসিয়ার প্রভৃতি কাশিমবাজার মহারাজের কর্মচারীদের কাছে গেলাম কয়লার মাপ-জোক-আদি ব্যবস্থা করতে। কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম, ২/৩ জন গাড়োয়ান রাস্তায় এদিক ওদিক ছট্ ফট্ করছে, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, 'আর বাবা, নতুন কালেকটার সাহেবের সব মাল গঙ্গার ঘাটে এসে লেগেছে। চাপরাসী পুলিশ সব গাড়ি ধরছে, একখানা গাড়িতে মাল বোঝাই করে ফেলেছে। আমরা এ-সব দণ্ডীবাবার কয়লা নেবার গাড়ি বলায় তারা বললে, 'লে তেরা দণ্ডী না ফণ্ডী এখন চল্'। বাবা রক্ষা কর, এই জন্যই তো আমরা শহরে বাজারে আসতে চাই না।' তাড়াতাড়ি গঙ্গার ধারে গেলাম—এত করে শেষে বুঝি তীরে এসে তরী ডোবে। স্বয়ং কালেকটার সাহেবের মাল, যিনি জেলার সেরা, জেলার লাট—তাঁর লোক গাড়ি ধরছে। আমি কি করি না করি, তা দেখবার জন্য আশপাশের লোক জমায়েত হয়ে গেছে। গাড়ির কাছে যেতেই সব পুলিশ চাপরাসীরা ছুটে আমার কাছে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। সাহেবের বুড়ো আরদালি আতাপজানও ছিল, সে বললে, 'স্বামীজী আপনি? এ-সব আপনার গাড়ি? এরা বলছিল কে দণ্ডী-ফণ্ডীর গাড়ি। স্বামীজী আপনার গাড়ি আমরা নেব না, আপনার গাড়ি কেড়ে নিয়েছে শুনলে সাহেব আমাদের উপর চটে যাবেন।' যে গাড়িটিতে মাল বোঝাই হয়েছিল, সেই গাড়োয়ানকে বললাম, 'যা কুঠিতে মাল পৌঁছে দিয়ে আয়, ভাড়া পাবি ওখানে—এসে আবার কয়লা নিয়ে যাবি—ডবল লাভ হবে।' গাড়োয়ান বললে, 'না, দণ্ডীঠাকুর, না বাবা।' আবার বললাম, 'গাড়িতে মাল সাজিয়েছে, যা আমি তোকে আট আনা বকশিস দেব। তিনগুণ রোজগার হবে।' গাড়োয়ান বললে, 'আমার গলায় ছুরি দিলেও যাব না—জবাই হবো, তবু সাহেবের কুঠিতে যাব না। বাঁচাও বাবা, দোহাই দণ্ডীঠাকুর।' শেষ পর্যন্ত গাড়ি থেকে মাল নামিয়ে নিতে হলো। গেঁয়োলোক কালেকটারকে এমনই ডরায়। যমের বাড়ি বহুত আচ্ছা, তবু সাহেবের কুঠি নয়।

"আশ্রমের ঠাকুর-ঘর ছিল না। ঠাকুরের ছবি তিথিপূজার দিন নামিয়ে তাতেই পূজা-অর্চনা হতো। অন্যদিন ভজনাদি হতো। ঠাকুরকে বলেছিলাম, ঠাকুর এ অনাথ আশ্রমে বিধিপূর্বক তোমার সেবাপূজা করতে পারব না, তাতে আমার সেবা অপরাধ হবে। তাই তোমাকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি—ওখানে রেখেই তোমার স্মরণ-মনন করি।

"১৮৯৮ খ্রীঃ আমি রিলিফের কাজে ব্যস্ত। আশ্রমের প্রথম পত্তন হয়েছে—তিনটি অনাথ বালকও এসে জুটেছে। এখনকার বেলুড় মঠ তখনও হয়নি। আলমবাজার থেকে মঠ সবে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানে উঠে এসেছে। স্বামীজীও সেখানে রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এদিকে ঠাকুরের জন্য বহরমপুরের ছানাবড়া পাঠাবার ইচ্ছা হরিবাবুর (বনবিহারী রায়)। তিনি ময়রাকে ডেকে এক মোন ওজনের একখানা ছানাবড়া করতে বললেন। কিন্তু এত বড় কড়া না পাওয়ায় দুখানি ছানাবড়া হলো, মোট ওজন এক মোন চৌদ্দ সের। নিয়ে যাওয়ার অসুবিধার জন্য একটি টিনেই দুখানি ছানাবড়া পুরে নিয়ে মঠে রওনা দিলাম। ঠাকুরের

উৎসবের দিনেই—বালী স্টীমার-জেটিতে নেমে সকাল দশটা নাগাদ মঠে পৌঁছলাম। সকলে শুনে অবাক। ঐ ছানাবড়া দুখানি ঠাকুর-ঘরে দেওয়া হলো। উপরি-উপরি বসিয়ে আনা হয়েছিল, তাই টিন থেকে ঢালতেই ছানাবড়া-দুখানি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি আনন্দে বিভোর। দেখি তাঁর গায়ে-কপালে ছাইয়ের দাগ—শুনলাম, সেদিন তাঁকে শিব সাজানো হয়েছিল। সেবার উৎসবের আয়োজন হয়েছিল 'দাঁ-দের' বাগানে।

"মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম ঠাকুরের উৎসব হয় ১৮৯৯ খ্রীঃ। সেবার বৈকুণ্ঠবাবুর ছেলে ননী কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে। বৈকুণ্ঠবাবু সারা বহরমপুর শহরের লোকদের খাওয়ান। অবশ্য ভোজে আশ্রম নিমন্ত্রিত হয়নি। হরিবাবু আমাকে বললেন, 'ননী একদিন আশ্রমের ছেলেদের খাওয়াক না কেন?' ননী এইকথা শুনে আশ্রমের সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়। হরিবাবু আমাকে বললেন, 'আপনি বলবেন, আশ্রমের ছেলেদের আশ্রমে এসে খাইয়ে যাক।' কাজেই কথা হলো—সামনেই ঠাকুরের তিথিপূজা, ঐদিন উৎসব হবে, আর ননীবাবু, হরিবাবু আর একজন আশ্রম-হিতৈষী ঐ-দিনের খরচ বহন করবেন। হরিবাবুই সেই উৎসবের সব ব্যবস্থা করেন। তিনি বললেন, পাড়াগেঁয়ে ধরনে-মুড়ি নারকেল দিয়ে জলখাবার হবে, আর একটা সরবৎ। হলোও তাই। জনৈক ভক্ত তেঁতুল দিয়ে এমন সরবৎ করেছিলেন যে, সকলেই তারিফ করেছিল। হরিবাবু তাঁর পাচক চোবে-ঠাকুরকে এনেছিলেন। ছোলার ডালের খিচুড়ি মোহাবা দিয়ে হবে হরিবাবু ঠিক করলেন। মহুলা গ্রামের এক ভক্ত একঘড়া ঘি পাঠিয়েছিল—ঐ অঞ্চলে তখন ভাল গাওয়া ঘি টাকায় পাঁচপোয়া পাওয়া যেত। হরিবাবু চোবেকে বলে দিলেন, সব ঘি-টা খিচুড়িতে ঢেলে দিতে—উৎসবের জন্য পাঠিয়েছে, এর শেষ রেখে কাজ নেই। প্রসাদ পাবার সময় কলাপাতায় ঘি আর আটকে রাখা যায় না—ঘি ছুটেছে ডাল-ভাতের বাঁধন ভেঙে। চিঁড়ে-দই খাবার সময়, দই যদি পাতলা হয়, তা হলে তাকে যেমন চিঁড়ের বেড়া দিয়ে আটক রাখা যায় না, খিচুড়িতে ঘিয়ের দশাও তাই হলো। পরের বছর উৎসবে যখন ফর্দ হয়, তখনও সকলে বলেছিল, হরিবাবু যদি গত বছরের মতো ঘি ছাড়েন, তা হলে আমরা পেরে উঠব না। ঐকতান-বাজনার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। পর বৎসরের উৎসবেও হরিবাবু ছিলেন প্রধান পাণ্ডা। এ বৎসর সকলে বললেন, ঠাকুর মাছ খেতেন, অতএব উৎসবে মাছ করতে হবে। সে বৎসর মাছের পোলাও-কালিয়া খুব হলো। হরিবাবুর পাচক সূর্য-ঠাকুর সব রান্না করল। তখন রেল খোলেনি, মোটর হয়নি। ঘোড়ার গাড়িতেই হরিবাবুরা এসেছিলেন। আর সব সাইকেলে। এই দুই বৎসর যে উৎসব হলো, তা বাবুদের (Aristo-cratic)—'দরিদ্রনারায়ণ' প্রায় কিছুই ছিল না। তৃতীয় বৎসর (১৯০১) থেকে উৎসবে সাধারণের (দরিদ্রনারায়ণের) আবির্ভাব হলো।"

সারগাছিতে ১৯২৮ খ্রীঃ একদিন দিনাজপুরের বিশিষ্ট ভক্ত গোপালকৃষ্ণ ঘোষকে

'শ্রীশ্রীবাবা' বলেন, "দেখ, রাস্তায় ধুলোবালি নিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা কত রকম খেলা করে। ধুলো দিয়ে ঘর বানাচ্ছে—তা দিয়েই রান্না করছে, ধুলোর ভাত, ডাল, তরকারি, অম্বল—আবার তারা ধুলোর ঠাকুর-ঘরে ফুল দিয়ে ঠাকুরকে সাজাচ্ছে। তখন সেগুলিকেই তারা সত্য মনে করে। তারপর তারা বড় হয়ে যখন সত্যিকারের ঘরকন্না করে, তখন তাদের কাছে আবার তখনকার সবকিছুই সত্য, জীবন্ত, বাস্তব হয়ে ওঠে। —বাহ্যপূজাও সেইরকম জানবে। প্রথম প্রবর্তক অবস্থা। তারপর যত তুমি সাধনায় এগিয়ে যাবে—ততই ভগবানকে মনের মন, প্রাণের প্রাণ জেনে তোমাকে ভাবের পূজা, প্রাণের পূজা করতে শিখতে হবে।"

তখন সারগাছি আশ্রমে খুব ছোট ঠাকুরঘর ছিল চালাঘরে। ঐ ঘরটি ছিল আশ্রমের পুরানো পাকা বাড়ির দক্ষিণ দিকের খোলা বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। একদিন জনৈক সেবক পুষ্পপাত্র ইত্যাদি সাজাইয়া পূজা করিতে বসিয়াছে, এমন সময়ে শ্রীশ্রীবাবা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। সেবকটি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি আসনে বসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে বাবার চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটিয়া উঠিল, যেন ঠাকুর জীবন্ত বসিয়া আছেন। কাঁদ কাঁদ হইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি সচন্দন ফুল লইয়া ঠাকুরের পায়ে দিলেন। কোন মন্ত্র নাই, কেবল বলিতেছেন, "ঠাকুর, তুমি এই সব নাও, দয়া কর।" প্রার্থনারত হইয়া খানিকক্ষণ বসিলেন। আধঘণ্টার মধ্যে পূজা শেষ হইয়া গেল। সেবকের মনে সেদিন ভাবের পূজা, প্রাণের পূজার অক্ষয়স্মৃতি সঞ্চিত হইল।

একদিন সকালে একটি সেবক ঠাকুর-পূজার জন্য উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছিল। বাবা দেখিলেন—সেবকটি গাছ শূন্য করিয়া সব ফুল তুলিতেছে। তিনি সেবককে বলিলেন, "ও হে, একেবারে গাছ শূন্য করে ফুল তুলো না, কিছু কিছু ফুল সব গাছেই যেন থাকে। দেখছ না বিরাটের পূজা নিত্য চলেছে।" গাছশুদ্ধ ফুল তিনি ভগবানকে নিবেদন করিয়া থাকেন—তাহাই বিরাটের পূজা।

সারগাছি আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবার কাছে একটা নিরন্তর তপস্যার স্থান। প্রথম হইতে শেষ দিন পর্যন্ত এখানে মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য যে সেবা, তা তিনি ভগবানের পূজার ভাবে করিয়াছিলেন। ফুল ফল সব কিছু উপচার দিয়া নিত্য এইভাবে জীবন্ত ঠাকুরের পূজা করিতেন। নতুন গোলাপ ফুলের চারা লাগানো হইয়াছে। চারা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা আগতপ্রায়। তিনি বলিলেন, "মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, 'মা, যদি ফুল হয় তো তোমায় সাজাবো।' বলব কি! তিথিপূজার ক-দিন আগে কুঁড়ি দেখা দিল। ধীরে ধীরে ঠিক তিথিপূজার দিন ভোরে পাঁচটি ফুল গাছ আলো করে ফুটল, আর মনের আনন্দে মাকে নিবেদন করলাম। মাসখানেক পরে স্বামীজীর তিথিপূজা। আবার ঐরকম ভাবলাম। এবার সাতটি ফুল।

ভাবলাম ঠাকুরের তিথিপূজায় আবার হবে কি? কি আশ্চর্য! বড় বড় বারটি ফুল। সে বছরের মতো ঐ শেষ—।" ফুলগাছও কথা শোনে—হৃদয়ের ভাষা বোঝে।

১৯২৯ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ মিশন-ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বৈষয়িক ব্যাপারে এক অশান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শ্রীশ্রীবাবা তখন মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ। তিনি ঐ সময় ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, যাহাতে মঠ ও মিশনের প্রত্যেক সভ্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর সদা সত্য পথে চালিত করেন, যেন এ বিপদ শীঘ্র কাটিয়া যায়। ২১ জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন মঠ হইতে সংবাদ আসিল সব বিপদ কাটিয়া গিয়াছে—সত্যেরই জয় হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা পাঁচ সিকার বাতাসা আনাইলেন—হরির লুট হইবে। সন্ধ্যারতির পর তিনি মন্দিরে আসিলেন। একটি ধূপকাঠি জ্বালিয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া ঠাকুরের একটি স্তোত্র পাঠ করিলেন। তাহার পর ঠাকুরের মন্দিরের বাইরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় আসিয়া নিজেই ভজন আরম্ভ করিলেন, 'ওয়া গুরুজী, সবে বল ওয়া গুরু, ওয়া গুরু, ওয়া গুরুজী।' এই কীর্তনটির পর 'জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল, কেশব মাধব দীন দয়াল'—এই ভজনটি জমিয়া গেল। সকলেই সমস্বরে গাহিতেছে। শ্রীশ্রীবাবা ভাবাবেশে নীরব হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শুধু 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া আখর দিতে লাগিলেন। কীর্তন চলিতে লাগিল—

"এমন দয়াল ঠাকুর আর নাই নাই নাই রে!
এমন দয়াল ঠাকুর আর হবে না, হবে না,
দয়ালের শিরোমণি. এমন দয়াল দেখি নাই।"

এইরূপ কীর্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবার সারা শরীর কাঁপিতেছে। তাহার পর কীর্তন সমাপ্তির বোল ধরিলেন—

"বোল হরিবোল, রামকৃষ্ণ বোল
বোল হরিবোল, রামকৃষ্ণ বোল।"

এই সময়ে কিছুক্ষণ তিনি দিব্য ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে জয় দেওয়া হইল—'জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কি জয়! জয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব কি জয়! জয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কি জয়!'

ঠাকুরের প্রসাদী বাতাসার থালা তাঁহার সম্মুখে ধরা হইলে তিনি সকলের মধ্যে বাতাসা হরির লুঠ দিলেন। শেষে বলিলেন ঃ 'মঠেও আজ আনন্দের ধুম লেগে গেছে।'

সারগাছিতে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা একদিন বলিলেন, "মনে মনে ভাবছি—ঠাকুরের মঙ্গলারতি কি করে হবে। খুব চিন্তিত আছি। শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্বপ্নে সাধারণত কমই দেখি। কিন্তু এই সময় একদিন স্বপ্নে দেখলাম—তিনি বলছেন, 'বেশিকিছু করতে হবে না;

একটি ধূপকাঠি জ্বেলে দিলেই হবে।' স্পষ্ট দেখলাম সেই মূর্তি, সেই দক্ষিণেশ্বরের ঘর, সেই খাট, সব—। তাঁর জিনিস তিনিই জোগাড় করে নেন।''

তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতির সময় থেকে একটি আশ্রম-বালক হিন্দুস্থানী সাধুদের মতো গাঁথি দিয়া কাপড় পরিয়া সাধুদের মতোই ভাব ও নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, সন্ধ্যারতি ইত্যাদি করিয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীবাবা ইহা লক্ষ্য করিয়াও এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন। এবার সেবকগণের আগ্রহে আশ্রমে মহোৎসব হইবে। ভারপ্রাপ্ত সেবকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ২ চৈত্র ১৩৩১ সাল, মহোৎসবের দিন স্থির করিলেন। আয়োজন চলিতেছে কিন্তু এখনও আশানুরূপ কিছুই হয় নাই। অনেককে পত্র দ্বারা জানানো সত্ত্বেও ভারপ্রাপ্ত সেবকের অনুরোধে ২ চৈত্রের পরিবর্তে ৮ চৈত্র মহোৎসবের দিন স্থির করিলেন। নিমন্ত্রণ পত্রও ছাপানো হইল। ২৯ ফাল্গুন বেলা বারোটার সময় পূজক শ্রীশ্রীবাবাকে জানাইল, ''বাবা, ঠাকুরের ভোগের বাতাসা ফুরিয়ে গেছে, আনিয়ে দেন, ভোগ দিব।'' তিনি খুব বিরক্ত হইয়া পূজককে বলিলেন, ''হ্যাঁরে, তোর তো আচ্ছা আক্কেল! এই ভর দুপুরবেলা বাতাসার কথা বলতে এলি? যা, এখন অন্য কিছু দিয়ে ভোগ সেরে ফেল।'' পূজারী ছেলেটি চলিয়া গেল এবং বাবার নির্দেশ মতো কাজ সমাধা করিল।

শ্রীশ্রীবাবা কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তর্যামী ঠাকুরকে প্রার্থনা জানাইলেন, ''ঠাকুর, তোমার যদি ঠিক ঠিক মিষ্টি খাবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে তুমি তার ব্যবস্থা কর।'' ঐ দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে বলরাম-মন্দির হইতে স্বামী ধীরানন্দ (কৃষ্ণলাল মহারাজ) ঠাকুরের ভোগের জন্য আবার খাব, নবীনের রসগোল্লা, কড়াপাকের সন্দেশ প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া সারগাছি পৌঁছিলেন। ধীরানন্দ স্বামী বেলুড় মঠের মহোৎসবের একজন প্রধান পাণ্ডা। তিনি পূর্ব পত্রানুযায়ী ২ চৈত্র মহোৎসবে যোগদান করিতে এই প্রথম সারগাছি আসিলেন। শ্রীবাবা তাঁহাকে পাইয়া যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। বিস্ময়ের কারণ প্রসঙ্গে আশ্রম-বালকের ঠাকুর পূজার কথা বলিলেন। তখন বাবা কৃষ্ণলাল মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুক কৃপার বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন, ''ঠাকুর আমার সব প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন, আমি এক গুণ চেয়েছি তো ঠাকুর বিশগুণ দিয়েছেন। আজ সত্যই এই আশ্রমের বালকদের ঠাকুর-ঘরের বেদিতে ঠাকুর বসেছেন, আর সত্যই তাঁর ভোগ নেবার ইচ্ছা হয়েছে। তিনি নিজেই এইভাবে সন্তানের প্রার্থনা পূর্ণ করেন।'' ৮ চৈত্র মহোৎসব সুসম্পন্ন দেখিয়া স্বামী ধীরানন্দ কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন।

একবার আমের সময় (১৯২৪ খ্রীঃ জুন) শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমবাসীদের উৎকৃষ্ট আম পরিতোষপূর্বক খাওয়াইয়া আনন্দ করিলেন। সকলকে তাঁহার সম্মুখে বসাইয়া নিজে ছুরি দিয়া আম ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। এই কাজ তিনি খুব দ্রুত ও কৌশল করিয়া করিতে পারিতেন, যাহাতে সমগ্র আমের খোসাটি একটিমাত্র চক্রাকারে খসিয়া পড়িত। এইভাবে দিনের পর দিন আশ্রমবাসীরা অন্নগ্রহণ না করিয়া আমই খাইত। শ্রীশ্রীবাবার সেই মাতৃবৎ সেবা যে পাইয়াছে,

সে জীবনে তাহা ভুলিতে পরিবে না। শিবরাত্রির ব্রত উদযাপনে নিজে উপবাসী থাকিয়া সকলকে উপবাস করিতে উৎসাহিত করিতেন। তাহার ফলে আশ্রমবাসীরা শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ করিয়া ধ্যান-ভজন করিত। আবার গঙ্গাস্নান করিয়া ভস্ম মাখিয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা দিয়া, যখন শিবের স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন, তখন মনে হইত সাক্ষাৎ শিব। ছেলেদেরও ভস্ম মাখাইতেন। সমস্ত দিন উপবাসের পর রাত্রে ঠাকুর-ঘরে গিয়া সকলের সঙ্গে 'হর হর বম্, হর হর বম্' বলিয়া নৃত্য করিতেন। সকালে নিজে উপবাসীদের সম্মুখে বসাইয়া প্রাণ ঢালিয়া সেবা করিয়া পরম তৃপ্তিবোধ করিতেন। সকলের শেষে তিনি নিজে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। দোলপূর্ণিমাতেও আবির দিয়া সকলের সঙ্গে কত আনন্দ করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে বরাহনগর মঠে তাঁহাদের শিবরাত্রির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "একদিন আমরা গিরিশবাবুর—

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে,
বববম্ বববম্ বাজে গালে।
(কিবা) রজত ভূধর নিন্দি কলেবর,
শশাঙ্ক সুন্দর শোভে ভালে।।
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল,
ফণী ফন্ন ফণা জাহ্নবী কল কল,
জটা মাঝে জলদজলে।। (সিন্ধু মিশ্র—একতাল)

—এই গান গাইতে গাইতে ভাবোন্মত্ত হয়ে আমরা নাচতে লাগলাম। পরে স্বামীজী বললেন, 'কি রকম দেখলি?' আমি বললাম, 'শিবের নৃত্য দেখলাম।' স্বামীজী, 'ঠিক দেখেছিস' বলে সমর্থন করলেন।"

বেলুড় মঠে প্রথম মহাসম্মেলন হয় ১৯২৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে। এর পর বেলুড় মঠে একদিন 'যাজ্ঞবল্ক্য' অভিনীত হয়। পরে, ২৯ মে, শ্রীবাবা দুইটি পিতৃমাতৃহীন ৫।৬ বৎসরের বালককে লইয়া সারগাছি আশ্রমে ফেরেন। সে সময়ে রেঙ্গুন সেবাশ্রমের জনৈক ভূতপূর্ব কর্মী সারগাছি আশ্রমে সেবকরূপে আসেন। আশ্রমের কার্যাবলী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আশ্রমের গোয়ালঘরের পূর্বভাগে অবস্থিত একটি বড় চালা-ঘরে দাতব্য চিকিৎসালয় সাজাইয়া আর্ত নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হন। এদিকে শ্রীশ্রীবাবাও আসিবার সময় কাশীপুরস্থ জনৈকা আশ্রম-হিতৈষিণী প্রদত্ত এক দুগ্ধবতী গাভী ও একটি ভাল জাতের 'বৃষ' সঙ্গে আনেন ও এই লইয়া পল্লী অঞ্চলে গোজাতির উন্নতি সাধনে লাগিয়া যান। তিনি গবাদির জন্য তৎপর হইয়া যান। যথা নেপিয়ার ঘাস, জাপানী মিলেট ঘাস ইত্যাদি চাষের প্রবর্তন তিনি করেন; বৃষ পরিপালনের জন্য মাসিক ১০্ টাকা সরকারী অনুদান পাওয়ার ব্যবস্থা করেন ও কৃষি সংস্থা হইতে বীজ সার ইত্যাদি সংগ্রহও তিনিই করিতেন।

১৯২৬ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীবাবা একবার সর্দি-কাশিতে পীড়িত হইলে, আয়োডাইড মিকশ্চার সেবনে চোখ-মুখ ফুলিয়া যায়, কোনরূপ পথ্য গ্রহণ ও কথা বলাও প্রায় বন্ধ হইয়া যায়! ভক্ত ও সেবকেরা ভীত হইয়া পড়েন, তিনি কিন্তু নির্বিকার। একটি শ্লেটে লিখিয়া ভাব প্রকাশ করিলেন ঃ "আমার শরীর গেলে 'দণ্ডী যম জিনতে যায়, দণ্ডী যম জিনতে যায়' এই কীর্তনটি গাইতে গাইতে যেন মহুলার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়।" অবশ্য দুই-তিন দিনের মধ্যে তিনি সুস্থ হইয়া ওঠেন।

আমেরিকার বেদান্ত কেন্দ্রের বোহেমিয়া দেশীয় এক সন্ন্যাসী, স্বামী যোগেশানন্দ, ১৯২৮ খ্রীঃ মে-জুন মাসে বেলুড় মঠে আসিলে একবার শ্রীশ্রীবাবাকে দর্শন করিতে সারগাছি আসিয়াছিলেন। বিদেশী হইলেও বাংলার আহার ও জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের বেশ অনুকূল হইয়াছিল। বাংলায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতও বেশ পড়িতে পারিতেন। শ্রীশ্রীবাবার আদর-আপ্যায়ন ও অপার্থিব স্নেহ ভালবাসা তাঁহাকে মুগ্ধ করে। তিনি আশ্রমের কৃষিকার্যে সুবিধার জন্য কলিকাতা হইতে একটি পাম্প ও কতকগুলি পাইপ কিনিয়া আনিয়া নিজেই বাগানের কাজ কিছু কিছু করিতেন। মাসাধিক কাল পরে ফিরিবার সময় তাঁহার কোডাক ক্যামেরাটি শ্রীশ্রীবাবার কাছে রাখিয়া যান। শ্রীশ্রীবাবা খুব যত্ন করিয়া উহা ঘরের দেওয়াল-আলমারিতে স্বামীজীর চিঠিপত্রের বাক্সের উপর রাখিয়া দেন। কিছুদিন পরে ফিরিয়া একদিন ফটো তুলিবার ইচ্ছা হওয়ায় ঐ ক্যামেরাটি শ্রীশ্রীবাবার নিকট হইতে আনিতে যান। ঘটনাটি ঘটে বিকাল বেলায়। শ্রীশ্রীবাবা সন্তর্পণে উহা বাহির করিয়া নতজানু স্বামী যোগেশানন্দের হাতে দিতে উদ্যত, এমন সময় দেখিলেন ক্যামেরাটিতে উই পোকা লাগিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা শিশুর মতো কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন ঃ "দেখ, বাবা, আমি খুব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।" বিদেশী সন্ন্যাসী করজোড়ে, সানন্দে, বাবার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন ঃ "মহারাজ, আমার জীবনের একটা বড় বাধা আজ দূর হয়ে গেল। ছবি তোলার প্রতি আমার আসক্তি এত প্রবল ছিল যে, অনেক চেষ্টা করেও তা আমি ত্যাগ করতে পারছিলাম না। এই বন্ধন থেকে আজ আমি মুক্ত হলাম।" স্বামী যোগেশানন্দ আরও কয়েক দিন শ্রীশ্রীবাবার পূতসঙ্গে বাস করিয়া তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় উত্তরকাশীতে তপস্যায় যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে শ্রীশ্রীবাবা অনুমতি দেন। কয়েক বৎসর উত্তরকাশীতে ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিয়া বৈরাগ্যবান পাশ্চাত্য সন্ন্যাসী সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

ভক্তদের অনুরোধে ১৯২৭/২৮ খ্রীঃ সারগাছিতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্যের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলেন, "দেখ, যারা সত্যি সত্যি great man (মহাপুরুষ) তাদের ভুল চাল হবে না। কিছুই ভুল হবে না। স্বামীজী বলতেন, 'এই দেখ না, শঙ্করের—ননু, খলু, তু—একটি অব্যয়ের পর্যন্ত ভুল নেই—বৃথা কিছুই

লেখেননি—সবেরই importance (আবশ্যকতা) আছে; নেপোলিয়ান নাকি বলেছিলেন একশ বছরের মধ্যে জগৎ থেকে monarchy (রাজতন্ত্র) উঠে যাবে—তা তো ঠিকই হয়েছে—এক শ্যাম আর নেপাল ছাড়া আজকাল monarchy আর কোথাও নেই,—ইংল্যাণ্ডের monarchy তো ঠিক monarchy নয়'।"

অন্য একদিন শ্রীশ্রীবাবা বলিতেছেন, "এই দেখ, বুড়ো হয়েছি, পড়ে গিয়ে পা মচকে গেছে, পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা একটু বেশি দূর একসঙ্গে চলতে পারি না। বেলা ১২টার সময় খেয়ে উঠি, তারপর একটু শুই, তিন কোয়াটার গড়িয়েই মনে হয় তিন ঘণ্টা কেটে গেল। সেবক হয়তো বলল, 'এই তো এখনও তিনটে বাজেনি, আর একটু শুয়ে থাকুন।' পাশ ফিরে রইলাম হয়তো, কিন্তু কি আশ্চর্য পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই বলে উঠছি 'দেখতো ঘড়িটা, অনেকক্ষণ হয়ে গেল।' সেবক হয়তো বলল, 'বাবা, এই তো পাঁচ মিনিট সবে পাশ ফিরলেন।' 'তাই নাকি' বলে আবার চার-পাঁচ মিনিট কাটিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম যেন এক যুগ। বিশ্রামের পর উঠে যদি দেখি যে সবাই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত হবার জন্য তৎপর—তাহলেই মনটায় বেশ ভাল লাগে।"

১৮৯৭ খ্রীঃ রিলিফের ব্যাপারে শ্রীশ্রীবাবা বলেন, "ব্রহ্মচারী সুরেনকে (স্বামী সুরেশ্বরানন্দ) যখন বলি, 'সাধারণ লোক দুষ্টামি করতে পারে, তা-বলে তাদের শাসন বা দণ্ড দেওয়ার কথা তোমার ভাবা উচিত নয়।' সে তা মেনে নিতে পারেনি। তখন বিদ্যাসাগরের জীবনের এই ঘটনাটি বলি—'বিদ্যাসাগর মশায় বর্ধমানে একবার দুঃস্থদের কাপড় বিলি করাচ্ছেন। একজন দুঃস্থ একবার কাপড় নিয়ে আবার আসে কাপড় নিতে। বিদ্যাসাগর মশায়ের এক বহু পুরানো ও দৃঢ়কায় ভৃত্য ঐ চালাকি ধরে ফেলে এবং ভর্ৎসনা করে। বিদ্যাসাগর মশায় ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সব শুনে সেই ভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। তার মাসিক দু টাকা পেনসনের ব্যবস্থা করলেন, তথাপি তাকে বহাল রাখলেন না।' এঁদের কাজ-কর্ম সাধারণ বুদ্ধির মাপকাঠিতে মাপা চলে না।"

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "পৃথিবীতে ভারতেই এখন কলিকাল—কলিকাল মানে মানুষ যখন ঘুমিয়ে কাটায়। দ্বাপরে জাগরণ, ত্রেতায় কার্য, সত্যে বিচরণ।* স্বামীজীও এ-কথায় সায় দিতেন। ভারতেই শুধু inert men (নিশ্চেষ্ট মানুষগুলো), lump of earth (এক তাল কাদার) মতো পড়ে আছে। পশুর মতো লোক জীবন কাটাচ্ছে; নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝে নেবারও ক্ষমতা নেই।"

---

* মনু ঃ কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি, স জাগ্রৎ দ্বাপরং যুগম্।
কর্মস্বভ্যুদিতস্ত্রেতা, বিচরন্তং কৃতং যুগম্।।

শ্রীশ্রীবাবা আলস্য, ঘুম, জড়তা একেবারে দেখিতে পারিতেন না। একদিন দুপুরবেলা খুব ঝড়বৃষ্টি হইতেছে। আশ্রমে অনেক লোক। লাইব্রেরি ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া অনেকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য সে-সময়ে বাইরের কোন কাজ করিবার উপায় ছিল না। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি মহা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "এই ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, আর সব ঘুমুচ্ছে। এই কি ঘুমুবার সময়? ঝড় উঠলে আমি স্থির থাকতে পারিনা; কেবলই প্রার্থনা করি—'ঠাকুর ঝড় থামিয়ে দাও, কত লোকের ঘরের চালের খড় উড়ে যাবে, কত গাছপালা পড়ে যাবে, কত ক্ষতি হবে।' লোকহিতে, লোক-কল্যাণের জন্য জীবন দিয়েছি, আর লোকের যখন ক্ষতি হতে পারে, সেই সময় ঘুমুবো?"

আবার ১৯১৩ খ্রীঃ এক রাত্রিতে প্রচণ্ড ঝড়ের প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি বলিলেন, "ঝড় আরম্ভ হলো রাত্রিতে। সকলকে তুলে দিয়ে প্রার্থনা করতে বললাম। আমি ছোট চালাটিতে আছি। আশ্রমে পাকাঘর তখন ছিল না। এত দূর থেকে অন্য ঘরের কারুর খবর নেবারও উপায় নেই। আমার মন তখন কম্পাশের কাঁটার মতো একেবারে ঠাকুরের দিকে হয়ে আছে। মাটিতে বসে প্রার্থনা করছি। জোর প্রার্থনা করছি আর হাওয়া কমছে— প্রার্থনা একটু কমলেই ঝড় যেন বেশি বাড়ে। এমনি করে রাত কাটলো। সকালে একটি ছেলে এসে বলল, 'বাবা, ভাগ্গিস ঘুমুতে বারণ করেছিলেন, নইলে মরে যেতাম। যেখানে মাথা রেখে শুয়েছিলাম, ঠিক সেখানে একটা মাটির চাঁই ভেঙে পড়েছে।' তাই বলি, ঘুমিয়ে কাল কাটাবি না। দেখ না আমেরিকার Rockefeller কত বড় ধনী, অথচ ছাতা বগলে এ-কারখানা থেকে সে-কারখানা করে বেড়াচ্ছেন। জাপান যে এত বড় হয়েছে—তা কি ঘুমিয়ে? জাপানি ছেলেরা কাঁদে না। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপান সম্বন্ধে পড়েছিলাম। একজন ইংরেজ লিখেছেন ঃ পাথরের উপর থেকে খড়ম পায়ে একটি জাপানি ছেলে পড়ে গেল, কী লাগাই লাগল! অথচ উঠে চলে গেল, একটুও কাঁদলে না। জাপানে মা তার কচি ছেলেকে উলঙ্গ করে বরফের ভিতর খেলা করতে পাঠায়। অন্ধকারে রাতে হত্যাভূমিতে ছেলেকে একলা পাঠায়—সেখানে মড়ার খুলিতে কালি মাখিয়ে রেখে আসে। ঠিক গিয়েছিল কিনা দিনের আলোয় দেখে আসে। জাপানে কচি কচি ছেলেদের দু-দিন রাত্রে ঘুমুতে দেয় না—সারারাত জেগে পড়তে হবে, পরদিনও দিনের বেলা ঘুমুতে পাবে না। এইরকম সব ওদেশে শিক্ষাদীক্ষা। সব মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়—মায় বিজ্ঞানচর্চা পর্যন্ত; সামান্য রিক্সাওয়ালাও ফাঁক পেলেই খবরের কাগজ থেকে পৃথিবীর খবর সংগ্রহ করে। ওখানে শহর পল্লীগ্রামে ভেদ নেই। সব জাপানটাই যেন একটা শহর—সব জায়গাতেই মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ি সব সাজানো গোছানো, যেন থিয়েটারের সিনের মতো। স্বামীজী যখন জাপানে যান তখন কুক কোম্পানীর কাছে তাঁর হাজার তিনেক টাকা ছিল। সেখানকার একখানি ছবি দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পুঁজি পাটা দিয়ে ঐ ছবি কিনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজে

বলেছিলেন, 'এমনি মনে হলো, আর আমেরিকা গিয়ে কাজ নেই, যা কিছু আছে তা দিয়ে ঐ ছবিখানি কিনে কলকাতায় ফিরে যাই।' জাপানের পরিবেশ এমনই সুন্দর।"

তিনি বলিতেছেন, "আমি স্বামীজীকে বলেছিলাম, 'পুরাণ পড়ে ভারতের কিছু হবে না—তার চেয়ে travelogue (ভ্রমণকাহিনী), ইতিহাস পড়লে ভারতের ঢের বেশি কাজ হবে—সব মানুষ হবে।' স্বামীজী আমার কথার তারিফ করেছিলেন।"

শ্রীশ্রীবাবা সাহেবদের খুব প্রশংসা করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "চীনে ভাষা কি শক্ত ভাষা। সেই ভাষা শিখে তারা ফা-হিয়েন, হোয়েং থাসেং প্রভৃতির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত উদ্ধার করেছেন। তবেই তো বুদ্ধযুগের শিক্ষাদীক্ষার কাহিনী জানতে পেরেছি। নইলে পুরাণে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের নামই শুধু পাওয়া যায়—ইতিহাসের আর কি আছে? ম্যাক্সমূলার কত চেষ্টা করে বেদ উদ্ধার করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার পঙ্ক উদ্ধার করেছে। বিলাতী মনীষীরাই বার বার প্রতারিত হয়েও ঠিক করেছিলেন—জয়পুর লাইব্রেরিতেই বেদের আসল text পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা ঠিক ধারণা করেছিলেন—জয়পুরের সঙ্গে বাদশাদের বিবাহ-সম্বন্ধ ছিল। ওখানে অত্যাচার লুঠতরাজ হয় নাই। আসল text ওখানেই মিলবে। রাণা প্রতাপ সিং খুব শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর কাছে থেকে সংগৃহীত হয়ে বেদ আজ বাজারে এসে পড়ছে।"

"শূদ্রের বেদ পড়তে নেই। এই এক ধুয়া আমাদের দেশের হাওয়ায়। এই মত খণ্ডনের জন্য স্বামীজী সব শ্লোক সংগ্রহ করতেন। মহাভারত থেকে খুঁজে খুঁজে আমি একটা শ্লোক বার করি। বশিষ্ঠের চার শিষ্য, সবাই প্রচার করতে বেরিয়েছেন। তিনি একলা আশ্রমে আছেন। নারদ এসেছেন। সেখানে একটি শ্লোকে আছে—অন্য সব বর্ণের সভায় দু-একজন ব্রাহ্মণ থাকলেই বেদ পড়ানো যেতে পারে।"

শ্রীশ্রীবাবা আবার বলিলেন, "স্বামীজীর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছিলাম—একজন সাধু ধ্যান করতে বসেছেন, কাপড় দিয়ে মুখ মাথা ঢেকে ধ্যানে বসে ঘুমুচ্ছেন, নাক ডাকছেন। স্বামীজী বললেন, 'ধ্যান করতে যখন বসি, কত জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারগুলো সিনেমার ছবির মতো হুড়হুড় করে মনে এসে হাজির হয়—পানা পুকুর গাবানোর মতো কত রকম ফুট ওঠে। ধ্যান বললেই ধ্যান! এদের সব লাঙলে জুড়তে হবে।' এখনও পুরানো লোক আছেন, তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন—শ্রীশ্রীঠাকুর বার বছর ঘুমান নাই। তিনি লোকশিক্ষার জন্যই তো এসেছিলেন। হাতে লাঙ্গল, মাথায় গীতা—এই নিয়ে যখন ভারতের লোক দাঁড়াবে তখনই ভারতের উন্নতি হবে।"

চায়ের আসরে শ্রীশ্রীবাবা একদিন বলেন, "যারা নিজেই আগে থেকে সব ছেড়ে দেবে, তারাই সুখী হবে। এমন দিন আসতেও পারে, যখন পাশ্চাত্য দেশের বাজে জিনিসগুলো বর্জন করে আমরা তাদের ভালোগুলোই নেব, কারণ আমরা যে তাদের চেয়ে বড় হব।"

গুরুনানক-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "গুরুনানক যখন হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য দু-জন মহাপুরুষ খুব শিলাবৃষ্টি করালেন। নানকের তবু কোন বিকার হলো না, যেমন তপস্যা করছিলেন তেমনি করে যেতে লাগলেন। তাঁরা তখন মহাসন্তুষ্ট হয়ে গুরুনানকের নিকট গিয়ে বললেন, 'তোমার উপর মহাপ্রসন্ন হয়েছি—কি শক্তি চাই, বলো?' গুরুনানক উত্তরে বলেছিলেন, 'আমার কোন ক্ষমতার দরকার নেই—আমি গরিবী চাই।' তাঁরা তখন মহা আশ্চর্য হয়ে তাঁদের গুরুর কাছে গিয়ে সব বলতে গুরু বললেন, 'মহাপুরুষ, যাও, তোমরা তাঁর পায়ের ধূলা নাও'। "

শ্রীশ্রীবাবা একদিন গল্পচ্ছলে বলিতেছিলেন, "দেখ, লেখাপড়া জানা অনেক লোক পাওয়া যায়। কিন্তু common sense-ওলা (কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন) লোক খুব কম দেখা যায়। Common sense হলো নিজের ভিতরের বুদ্ধির বিকাশ। বিদ্বান হওয়া, সে তো পরের বুদ্ধি। এক রাজা আর তার উজিরের মধ্যে তর্ক হলো। রাজা বললেন, 'common sense-টাই আসল,' উজির বললেন, 'লেখাপড়ারই দাম বেশি।' উজির নিজে খুব বিদ্বান, রাজা কিছুতেই তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারছিলেন না। শেষে রাজা বললেন, 'দেখ, তোমায় তিনটি কাজ আমি দেবো—(১) আকাশেতে কত তারা আমায় গুনে বলবে, (২) পৃথিবীর কেন্দ্র আমায় বার করে দেবে, (৩) পৃথিবীতে কত লোক গুনে, কত নারী আর কত পুরুষ আমায় বলবে। —তুমি সর্ববিদ্যা বিশারদ, তোমায় সাতদিন সময় দিলাম, তোমার কাছে ঐ সময় যথেষ্ট।' উজির 'যে আজ্ঞা' বলে চলে গেলেন। এদিকে তো তাঁর আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে হৈ চৈ উঠল—উজির বুঝি ভেবে ভেবে মারা যান। এমন অবস্থায় উজিরের ধোপা এসে উপস্থিত—সে উজিরের সঙ্গে দেখা করতে চায়। বহু কষ্টে উজিরের কাছে যাবার অনুমতি পেল। সেই ধোপা বলল, 'হুজুর, আপনি যখন রাজসভায় যাবেন, আমি সঙ্গে যাব, আর রাজার তিনটি প্রশ্নের উত্তর আমিই দেব।' উজির তো অবাক, ধোপা ব্যাটা বলে কি? উজির নিজেও কিছু মীমাংসা করতে পারেননি, তাঁর মাথার ঠিক নেই। কাজেই অগত্যা, ধোপা সঙ্গে যাবে ঠিক হলো। ধোপার কথা মতো রাজার সভা গোল করে সাজানো হলো, চারদিকে বড় বড় লোক বসল, আর মধ্যের আঁকা জায়গায় গাধা সমেত ধোপা হাজির হলো।

"সভার কাজ আরম্ভ হলো। আকাশে কত তারা—এর উত্তরে ধোপা বলল, 'আমার এই গাধার গায়ে যত রোঁয়া ততগুলি।' রাজা বললেন, 'কি করে?' ধোপা বলল, 'গুনে নিন।'

"তারপর পৃথিবীর কেন্দ্র নিরূপণ। ধোপা গাধার পিঠে চড়ে বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগলো। কতক্ষণ ঘুরে হাতের ছিপটিটা এক জায়গায় পুঁতে ফেলে বললে, 'মহারাজ এইখানে।' রাজা বললেন, 'কি রকম।' 'মেপে নিন'—উত্তর দিল ধোপা।

"সকলেই চুপ—পৃথিবীটা মাপা কম কথা নয়। তারপর তৃতীয় প্রশ্নের কথা উঠল। ধোপা

বলল, 'ওটাতো কোন প্রশ্নই নয়, কারণ স্ত্রী পুরুষ ছাড়া পৃথিবীতে হিজড়ে আছে। তাদের কোন্ ধারে ফেলব।'

"রাজা খুব তারিফ করলেন। উজিরকে বললেন, 'দেখছ তো common sense কি রকম দরকার।' "

এবার sincerity-র কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা এইপ্রসঙ্গে স্বামীজীর কথা পাড়িলেন, "আর sincere হতে হবে, শ্রীশ্রীঠাকুর যখন দেহ ছেড়ে দিলেন আমরা তখন ছেলে মানুষ, পাছে বাড়ি চলে যাই, এদিক ওদিকে ছটকে পড়ি—এই ভয় হয় স্বামীজীর। তখন তিনি আমাদের বললেন—'sincere হবি। যেকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে পড়েছিস, আর বাড়ি ফিরে যাসনি। ভগবানকে পাস ভাল কথা, নতুবা যেমন আছিস, তেমনি থাকবি। আবার ফিরে গিয়ে সংসার করবি? বিয়ে করে মাগ-ছেলে নিয়ে থাকবি?' ...ভগবানের সঙ্গে যে-সম্বন্ধ তা ঈশ্বর-সৃষ্ট, আর স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে যে-সম্বন্ধ তা জীব-সৃষ্ট।"

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "স্বামীজী বলতেন, চাকরি করো না—চাকরি শ্ব-বৃত্তি—কুকুরের কাজ। চাকরি আপদ ধর্ম, আপৎকালে কেবল চাকরি করা যায়। ফকিরিও ভাল, তবু চাকরি করা উচিত নয়।"

ভগিনী নিবেদিতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা একদিন বলেন, "স্বামীজী যেদিন শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিবেদিতাকে নিয়ে যান আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নিবেদিতাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পরিচয় করিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, 'মা, একটি আকাশের ফুল এনেছি। পৃথিবীর ধূলিকণা মলিনতা একে স্পর্শ করেনি।' নিবেদিতা যেদিন জাহাজ থেকে ভারতে নেমেছিলেন, সেদিন তাঁর কাছে মাত্র দুটি টাকা ছিল। ওপারের কোন সম্বলই যেন তিনি এপারে আনেননি। ...একজন সাহেব তাঁর রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়ে যায়, তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়। সেই সাহেব এমন কি মঠ অবধি ধাওয়া করে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নিবেদিতা চটপট vow (দীক্ষা) নেন। স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্য দেন।"

(উদ্বোধন : ৮৪ বর্ষ ৮,৯,১০ ও ৮৫ বর্ষ ৯ সংখ্যা)

অখণ্ডানন্দজীর কথা*

স্বামী অন্নদানন্দ

১৬.১১.১৯২৮। সারগাছি আশ্রম

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের আদরযত্ন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা (স্বামী অখণ্ডানন্দ) বলিলেন, "আমাদের খাওয়া-দাওয়ার যত্ন এখন আর কে করবে? যাঁরা ছিলেন একে একে সব চলে যাচ্ছেন। মঠে এক মহাপুরুষ-দাদা রয়েছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিয়া চলিলেন, "বাবুরাম মহারাজ আমাদের মঠের মা ছিলেন, কি আদরযত্ন করেই না খাওয়াতেন! শশী মহারাজের যত্নেরও তুলনা নেই। শেষ শরৎ মহারাজ খাওয়া-দাওয়ার যত্ন নিতেন, তিনিও চলে গেলেন। এখন দাদা—মহাপুরুষ-দাদা—মঠে থাকলে খবর নেন, জিজ্ঞাসা করেন—কি খাবে ইত্যাদি।"

ইহার কিছু পূর্বে শ্রীশ্রীবাবা সেবককে বলিতেছিলেন, "বিধি আমার অদৃষ্টে আজ মাপেন নি। ...বললাম এক, করল এক। এমন তো একদিন নয়, প্রায়ই হয়ে থাকে। এই তো সেদিন খাব বললাম, কিন্তু খাওয়া হলো না। ...দেখ আমরা সাধু, মিথ্যা কথা বলি না। এটা তো বিশ্বাস কর? আমাদের মন মুখ এক। যেটি খাব বলব সেটি না এনে অন্য কিছু আনলে আর খেতে পারি না।"

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন, "...লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের জন্য স্বামীজী এক সময় জনৈক সেবককে মঠ থেকে বের করে দেন। হরি মহারাজও শেষ সময়ে সেবকদের খুব বকাবকি করতেন। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর military spirit (সৈনিকের মনোভাব) পূর্ণমাত্রায় ছিল...।"

২২.১১.১৯২৮, বৃহস্পতিবার, ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

আশ্রমের সাধু ও ব্রহ্মচারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীবাবা তেজ ও বীর্য-প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, "স্বামীজী বলতেন—

Cannon to the right,
Cannon to the left,
Cannon in front,
Cannon behind,
Ours is to do and die,
And not to question why.**

---

* সারগাছি আশ্রমের ডায়েরি হইতে সংকলিত

** মূল কবিতার পাঠ ঃ 'Theirs not to reason why,/Theirs but to do and die. ...Cannon to right of them,/Cannon to left of them,/Cannon in front of them,/Cannon behind them,/Volleyed and thundered.

"মৃত্যুই জীবনের পরিণাম। মরব তো বীরের মতো মরব। মৃত্যুর পরেও হাড়ে হাড়ে ভেলকি খেলবে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস চাই।

"আমি কি রকম লোক জান তো? আমি স্বামীজীর ভাই—যে সে লোক নই। আমার কাছে থেকে তোমাদের হলো কি? কাছা ছেড়ে ফের দিয়ে কাপড় পরলেই কি হয়? আমার কাছে যারা থাকবে তাদের খুব কর্মী হতে হবে। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ঠাকুরের কাজে প্রাণপণ লেগে যেতে হবে। যদি নিজের সুখভোগ কি আরামের দিকে লক্ষ্য রাখো, তা হলে কিছুতেই শান্তি পাবে না। আশ্রমেরও কোন উপকারে আসবে না।

"আমি কিছু পারি না, পারব কি পারব না, এরূপ ইতস্তত করা অন্যায়। সব কাজে এগিয়ে যাবে। না পারলেও চেষ্টা করে দেখবে। গুরুর প্রতি অচল বিশ্বাস থাকলে বিপদ কিছুই করতে পারবে না, সাপে কাটবে না, আগুনে পুড়বে না, বাঘে খাবে না।

"মহাবীর (হনুমান) জন্মেই বললেন, 'সূর্য খাব।' রাম লক্ষ্মণ বালক-বয়সেই তাড়কাকে মেরে জগতে শান্তি স্থাপনে লেগে গেলেন।

"পরিব্রাজক-অবস্থায় যে পথে বাঘ, ভালুক সেই দুর্গম পথ দিয়েই যেতাম। একটা নিশ্চিত মৃত্যুর পর আর একটা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটতাম। ভাবতাম, বাঘের সামনে পড়লে গাছে উঠে পড়ব আর ভালুকের সামনে পড়লে মড়ার মতো পড়ে থাকব। ভালুক মড়া মনে করে চলে যাবে। আমার অর্ধেক কি সিকি করতে পারিস?"

* * *

আজ সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধ্যানের পর শ্রীশ্রীবাবা প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, "আমি দশের মুখে খাই, হাড়হাবাতে সাধু নই। নেংটা বেলায় সাধু হয়েছি, কিন্তু মাথায় জটা নেই, শিংও বেরোয়নি, অষ্টসিদ্ধাইও নেই। তবে হৃদয় আছে। ঠাকুরের কৃপায় এইটুকু হয়েছে। তার বলেই না খেয়ে, না পরে, আশ্রম চালিয়ে এসেছি। আমরা এরকম না করলে জগতে এই revolution (বিপ্লব) হলো কি করে? ...অহঙ্কারে লোকে পাগল হয়ে যায়। কর্তৃত্ব করা কি সোজা কথা? ঠাকুর আমায় ছাপোষা সাধু করে এখানে রেখেছেন, তাই এখানে পড়ে আছি। এখানে কিসের সুখ? না আছে তেমন ভক্ত পরিবার, না আছে তেমন শ্রোতা—সারাদিন খালি বকে বকে মরি, না আছে সেবা। দম বন্ধ হয়ে গেলেও কেউ খোঁজ নেবার নেই।

"একবার স্বামীজীকে বলেছিলাম, আমি তোমার গুরুভাইদের মধ্যে কেউকেটা নই বটে। তবে তুমি যেমন আমেরিকায়, ইউরোপে বক্তৃতা দিয়ে সাহেবদের কাছে বেদান্ত প্রচার করেছ, আমি—তোমার ছোট ভাই—তেমন ভারতবর্ষে থেকেই Anglo-Indian (ইঙ্গ-ভারতীয়) কুঠিয়াল সাহেবদের কাছে হাতে-কলমে বেদান্ত প্রচার করেছি।"

১.১২.১৯২৮

বিকালে আমেরিকার Booker T Washington-এর (বুকার টী ওয়াশিংটনের) প্রসঙ্গ উঠিলে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন ও আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'তুমি সারগাছি আশ্রমে যেভাবে কার্য করিতেছ, সেইভাবে কার্য করিয়া এখানকার (আমেরিকার) একজন নিগ্রো যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন।' পূজনীয় শরৎ মহারাজই আমাকে 'Up from Slavery' (দাসত্ব মোচন) পুস্তকখানি পড়িতে দেন। 'Character building' (চরিত্র গঠন) বইখানি পূজনীয় কালী মহারাজ উপহার পাঠান।"

৩.১২.১৯২৮

সকালে কয়েকজন মুসলমান গ্রামবাসীর সঙ্গে ফুলবাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রীশ্রীবাবা আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লা ও তাঁহার রানীর খুব প্রশংসা করিয়া ইউরোপে তাঁহাদের সমাদরের কথা বলিলেন। পহলবী রেজা শা ও মুস্তাফা কামাল পাশার দেশের উন্নতির চেষ্টার বিষয়ও আলোচনা করিলেন। শেষে বলিলেন, "তোমাদের জাতভাইরা এইসব করছে, তোমরা এইসব জানবার চেষ্টা করবে, পড়বে। দেখবে আগামী বিশ বছরের মধ্যে এশিয়ার সব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করবে।"

৭.১২.১৯২৮

জনৈক ব্রহ্মচারীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "এ তো কাশ্মীর কি কেদার-বদরীর পথ নয় যে বলে দেব কতটা বাকি। সাধনায় কতদূর অগ্রসর হলে, আর কতটা বাকি—এরূপ প্রশ্নে প্রশ্নকর্তার অভিমান ও রাগই প্রকাশ পায়। দেখ, আজ না হোক, কাল না হোক, একদিন না একদিন তাঁকে অবশ্যই লাভ করবে। স্বামীজী বলতেন, 'দেখ ভাই, আমাদের গুরু সমস্ত করেছেন, আমাদের কিছু করবার প্রয়োজন নেই সত্য, তবু আমাদের পরিশ্রম করে সব যোগাড় করে নিতে হবে।' আরও বলতেন, 'লোকের শ্মশানবৈরাগ্য হয়। দুদিন পরে যে কে সেই। শ্মশানে গেলে অতি সংসারী লোকেরও বৈরাগ্য হয়। কিন্তু স্থায়ী হয় না। আমাদের ওরূপ বৈরাগ্যের প্রয়োজন নেই। আমরা sincere (অকপট) হব, মরণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকব, কায়মনোবাক্যে তাঁর কাজ করে যাব।'

"বড় মহারাজ বলতেন, 'পাল তুলে স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দাও। গন্তব্যস্থলে একদিন না একদিন পৌছবেই। পিছু ফিরে তো যাবে না।'

"প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করবে। আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে; ভোরবেলা না উঠে কিছুতেই থাকতে পারি না। যদি ত্রিসীমানায় কেউ ঘুমন্ত থাকে তো ভিতরটা কিরূপ তোলপাড়

করে। ...দেখ বেলা পর্যন্ত ঘুম, এ-সব, ঠাকুরের আমরা কেউই প্রশ্রয় দিই না, বা অন্যকে দিতে দিই না। তা না হলে আমাদের ১২। ১৪টির দ্বারা জগতে যুগান্তর আনা কি সম্ভব হতো।"

১৭.১২.১৯২৮

কথাপ্রসঙ্গে আশ্রমের একটি ব্রহ্মচারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কোন কাজে হটবে না। অজ্ঞেয়, দুর্বোধ্য, puzzling (ধাঁধা) বলে কিছু নেই। যে বুদ্ধির দ্বারা মানুষ—ভগবান কি? পরলোক কি? পুনর্জন্ম আছে কি না? আত্মা কি বস্তু?—প্রভৃতি নিগূঢ় তত্ত্বের সমাধান করেছে সেই বুদ্ধি যদি সামান্য কার্য সমাধানে বিব্রত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে তাহলে ভগবান লাভ হবে কি করে?

"আমার কাছে থেকে কি শিখেছ? আমার কাছে থেকে যদি তোমার কিছু না হয়, তাহলে বড়ই পরিতাপের বিষয়। তোমাদের সামনে তো একটা আদর্শ রয়েছে। কথা উঠল তাই বলছি।

"ঠাকুরের দেহরক্ষার ছমাস পরে বেরিয়ে পড়লাম, তখনও গোঁফের রেখা দেখা দেয়নি, হিমালয়ে ৫। ৬ বছর কাটিয়ে দিলাম। ১৫ দিনে তিব্বতের spoken language (কথ্য ভাষা) শিখে ফেললাম। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এদেশে এলাম।

"হিসাবপত্র কি করে লিখতে হয় কিছুই জানতাম না। নরেন ভট্চার্যের খাতা যেই দেখা, অমনি শিখে ফেললাম। জানতাম না ঠাকুর আমাকে এরূপ ছাপোষা করবেন।

"৺কাশীতে স্বামী ভাস্করানন্দ বলেছিলেন, 'তোমাকে ৫। ৬ বছর বেদ পড়াব, তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠবে।' বড় মহারাজ ৺কাশীতে বেদ পড়বার জন্য জেদ করেছিলেন, বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত পড়তে যত টাকা লাগে দেবেন বলেছিলেন। ৺কাশীতে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে শুনে সংস্কৃত উচ্চারণ এমন শিখে ফেলাম যে, আমার গীতা পড়া শুনে শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্র মশায় জিজ্ঞাসা করেন, '৺কাশীতে আসার পূর্বে বাংলা দেশেও কি আপনি এরূপ বিশুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়তেন'?"

উপসংহারে ব্রহ্মচারীটিকে বলিলেন, "সমস্ত কাজ শিখে রাখবে। হয়ত সে কাজের ভার তোমার উপর পড়বে না। তবু শিখে রাখবে।"

১.১.১৯২৯, ১৭ পৌষ ১৩৩৫

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "আজ তোমাদের নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করব।" জনৈক ব্রহ্মচারী দীক্ষার জন্য মঠে গেল। মুর্শিদাবাদ হইতে দুইটি ভক্ত ছেলে আসিয়াছে, উহাদের পাইয়া বাবা অতিশয় আনন্দিত। উহাদিগকে আশ্রমের নূতন ঘর দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ দেখি কী মনোরম দৃশ্য! চারিদিকে কৃষকের বাস। ভদ্রলোকের বসতি এখানে একঘরও দেখতে পাবে না।

আমি কৃষকদের বড় ভালবাসি। ওরাই আমার প্রাণ, বড় প্রাণের লোক। জীবনের ৩২ বছর ওদের নিয়ে এইখানে কাটিয়ে দিলাম।" স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট জমি, আশ্রমের বাগান, নার্শারি সব দেখাইলেন।

সময়ান্তরে তিব্বতের প্রসঙ্গে বলিলেন, "ওদের মধ্যে ২। ৪টি জাতিস্মর বালক দেখেছি।"

২.১.১৯২৯, বুধবার, ১৮ পৌষ ১৩৩৫

আজ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি পূজা। অতি প্রত্যূষে ঠাকুরের মঙ্গলারতি ও উৎসবাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হইল।

দেশের কথাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার পর শ্রীশ্রীবাবা আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লার কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমীর ও রানী পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরলে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান হয়। আমীরও পিতৃসিংহাসন পাবার সময় নিজের বহুমূল্য আসবাবপত্র সব বিক্রী করে ঐ অর্থ শিক্ষাপরিষদকে দান করেন। পাশ্চাত্যে তিনি প্রভূত সম্মান লাভ করেন। প্যারিসে নেপোলিয়ানের পালঙ্কে তাঁকে শুতে দেয়। উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেই এই সম্মান তাঁকে দেখিয়েছিল। আজ পর্যন্ত কোন প্রাচ্যদেশীয় রাজাকে এরূপ সম্মান দেখান হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে এরূপ মহান নৃপতি অনেক কাল দেখা যায়নি।

"আমীর ভারতেরও যথার্থ কল্যাণকামী। এশিয়ার অধিবাসীদের যতটুকু স্বাধীনতা প্রাপ্য তা পাবে। আমীরই সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার অগ্রদূত।" এই সম্পর্কে পহলবী রেজা শা, মুস্তাফা কামাল পাশার কথা বলিয়া সোসালিস্ট আন্দোলন-প্রসঙ্গে বলিলেন, "ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, কেন এই পার্থক্য হলো? বড়লোক গরীবদের সব শুষে নিচ্ছে, তুমি কেন এসব equally distribute (সমভাবে বণ্টন) করছ না?"

১১.১.১৯২৯, শুক্রবার, ২৭ পৌষ

আশ্রমের কোন অনাথ বালকের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "দেখ মানুষের মতো নিমকহারাম আর কেউ নয়। বরং গোখরো সাপ পোষ মানে, তবু মানুষ বশে আসে না। স্বামীজীও শেষ দিকটায় মানুষের ওপর বিরক্ত হয়ে, শরীর ছাড়বার আগে মায়ার বন্ধন কাটাতে মানুষের সংস্রব একরকম ছেড়ে দিয়েছিলেন। মঠে এক চিড়িয়াখানা করেছিলেন—চিনে হাঁস (যশোমতী), রাজহাঁস (বোম্বেটে), পাতিহাঁস, নানা রকমের পায়রা, কুকুর, সারস, ছাগল (মটরু) ইত্যাদি পুষেছিলেন।

"স্বামীজী এদেরই যত্ন করে খাওয়াতেন, আদর করতেন, একদৃষ্টে সস্নেহে তাকিয়ে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ গোধন নিয়ে কিরকম খেলা করতেন এ-দৃশ্যে তার অনেকটা ধারণা হয়।

তখন স্বামীজীর মুখের ভাব কি অদ্ভুত রকম বদলে যেত—তা আর কি বলব। একেই বলে জীবে প্রেম, বিশ্বপ্রেম।"

৭.৩.১৯২৯, ২৩ ফাল্গুন

পূজনীয় শঙ্করানন্দ মহারাজ মন্দিরের জন্য সুবর্ণ তবক দেওয়া মঙ্গল কলস লইয়া আসেন। কয়দিন থাকিয়া ২১ ফাল্গুন কলস স্থাপনের পর ৯।। টার ট্রেনে কলিকাতা রওনা হইলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "অমূল্য মহারাজের স্বভাব কি সুন্দর হয়েছে! আমাদের আশ্রমের প্রতি ওর খুব টান। Relief (সেবাকার্য) -এর সময় আরও ২।৩ বার এসেছিল। কি সুন্দর feeling (ভাব) আর appreciation (গুণবোধ)! ওরা পাকা সাধু হয়েছে। মহারাজের হাতে গড়া। কিছুই খেতে পারে না, শরীর খুবই খারাপ। এই অসুস্থ শরীর নিয়ে মন্দিরের কলস ও মার্বেলের জন্য কি পরিশ্রমটাই না করেছে! শরীর এত খারাপ জানলে আমি বলতুম না। কী আর যত্ন করেছি। তাতেই কি সন্তুষ্টি! সামান্য কলা খেয়ে বললে, 'মহারাজ, মুখটা জুড়িয়ে গেল।' দেখ এখানেই মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব।"

একটু পরেই বহরমপুর হইতে Settlement Officer (জমি-ব্যবস্থাপক) রায় বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, বাবু শৈলেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি আশ্রমে আসিলে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদিগকে আশ্রমের পূর্ব ইতিহাস-প্রসঙ্গে বলিলেন, "ঠাকুরের প্রত্যাদেশ ও দুর্ভিক্ষের শোচনীয় দৃশ্যই আমাকে এ-কার্যে প্রণোদিত করে। অন্নপূর্ণাপূজার দিন মহুলা গ্রামে এক পূজাবাড়ীতে মা অন্নপূর্ণার নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করি, 'বেটী, এই দুর্ভিক্ষের দিনে কোথায় লোকের মুখে অন্ন দিবি, তা না করে নিজে অন্ন খেতে এসেছ? কেমন করে তুমি খাও আমি দেখব।' ভাবতা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাত্রিবাসের পর ভোরবেলা প্রত্যাদেশ পাই, 'গঙ্গার তীর, ব্রাহ্মণের বসতি, সুভিক্ষ স্থান, এখানে তোর অনেক কাজ, থেকে যা, থেকে যা, থেকে যা।' তিন তিনবার স্পষ্ট এইরূপ শুনি।

"মস্তিষ্কের ভ্রম বলিয়া প্রথমে ঐ প্রত্যাদেশ উড়াইয়া দিতে চাহিলাম, কিন্তু তিন তিন-বারই উঠিতে গিয়ে উঠিতে পারি নাই, কে যেন মহা গুরুভার আমার কোমরে বাঁধিয়া দিয়াছিল। তখন আমার মনে হইল—Surely I am reserved for something great here (নিশ্চয়ই আমি এখানে কোন মহৎ কাজের জন্য চিহ্নিত)। কিন্তু এ সকল কথা কাহাকেও খুলিয়া না বলিয়া শুধু স্কুলের পণ্ডিত উমেশ বাবুকে বলি, 'মশায়, আমার এ-যাত্রা এখান থেকে যাওয়া হলো না। আমি এখানে কিছু দিন থাকতে চাই, তবে আমি অলসের মতো বসে থাকব না।

"অন্নপূর্ণাপূজার দিন আমার চণ্ডীপাঠ শুনে স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে আমার সেবা করতে উৎসুক হলো।

"ঐ দিন সন্ধ্যায় বেদেরা মায়ের নিকটে গাইতে থাকে, 'অন্ন ব্যাগারে প্রাণ গেল, জল ব্যাগারে প্রাণ গেল' এবং মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। আগেই দাদপুরে দুর্ভিক্ষের দৃশ্য দেখেছিলাম,

এখানে স্থির বিশ্বাস হয় যে দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেছে। ঐ গানটি লিখে মঠে বাবুরাম মহারাজের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি উহার একটি নকল দার্জিলিঙে স্বামীজীর কাছে পাঠান ও আমাকে লিখেন, 'তুমি সত্বর মঠে ফিরিয়া আইস। You are a penniless mendicant (তুমি কপর্দকহীন সন্ন্যাসী) তুমি উহাদের কি উপকার করিবে? বরং আর কিছুদিন থাকিলে উহাদের গলগ্রহ হইয়া পড়িবে।'

"পত্রের উত্তরে লিখলাম, 'এখানে অযাচিতভাবে যাহা পাই, তাহাতে একজনেরও যদি ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারি তো নিজেকে ধন্য মনে করিব। জান তো আমি ৫। ৭ দিন অনায়াসে উপবাস করিতে পারি। এই দৃশ্য দেখিয়া কাপুরুষের মতো পৃষ্ঠ-প্রদর্শন আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মরি সে-ও স্বীকার, এর একটা বিহিত না করিয়া যাইব না।'

"এই সময়ে ঠাকুরের নিকট খুব কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতাম—'প্রভু, আমি কর্মফল মানি না, তোমার রাজ্যে এ অবিচার কেন? এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কি পাপ করেছে যে তারা দুটি না খেতে পেয়ে মরছে? তুমি যদি এর একটা বিহিত না কর তো আমি এইখানে প্রাণত্যাগ করব। প্রভু, আমি কপর্দকশূন্য পথিক সন্ন্যাসী, তুমি আমাকে এ-দৃশ্য কেন দেখালে?

"মাদ্রাজ থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সংগ্রহ করে টাকা পাঠান। বহরমপুরের মহানুভব E.V. Levinge সাহেব অনেক রকমে সাধ্যমত সহায়তা করেন; তার স্মৃতি এই আশ্রমের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

"দুর্ভিক্ষের পর একদিন সাক্ষাৎ করতে গেলে লেভিঞ্জ সাহেব বলেন, 'What do you intend to do now, Swami (স্বামী, আপনি এখন কি করিতে চান)?' আমি বলি 'To start an orphanage and give the boys primary education along with technical, agricultural and religious training, so that they may become pious bread-winners in the society. I mean education of 3 H's and 3 R's that is, Hand, Head and Heart along with Reading, Writing and Arithmetic. (একটি অনাথ আশ্রম স্থাপনা করে ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা ও তার সঙ্গে কারিগরি, কৃষি ও ধর্মীয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করব, যাতে তারা পরে সমাজে সৎভাবে অন্নসংস্থান করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। এই শিক্ষায় ছেলেদের হাত, মাথা আর হৃদয়ের বিকাশ হবে আর তারা পড়তে, লিখতে ও গুণতে শিখবে)।' সাহেব যখন শুনলেন যে, আমি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বালক নিতে প্রস্তুত তখন মহা আনন্দে বলে উঠলেন, 'Laudable scheme indeed, Swami. (স্বামী, ইহা সত্যই প্রশংসনীয় প্রস্তাব)।'

"তিনি একটি মুসলমান বালিকা দিতে চাইলে আমি ছেলেদের আশ্রমে মেয়েদের রাখার অসুবিধা বুঝিয়ে দিলে, সাহেব পরদিনেই অনাথ বালক সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক থানার দারোগার নামে নোটিশ দেন। প্রথম বালক বহরমপুর থেকেই আসে, তার নাম 'নটু'।

"বহরমপুরের রেশমবিজ্ঞানী নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। তিনি একসময়ে বলেন—'সরকারি কাজ থেকে অবসর নিয়ে এই আশ্রমে কাঠ ফাড়ব আর চাষ আবাদ দেখাশুনা করব; আশ্রমটিকে 'World epitomised' (ক্ষুদ্র জগতে) পরিণত করতে হবে।' "

কিছু পরে শ্রীশ্রীবাবা হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করেন ও বলেন, "আগ্রার মসজিদে জনৈক সুফীকে জিজ্ঞাসা করি—'এখন কি বুঝছেন?' তিনি উত্তর দেন—'নিমক পর নিমক ডাল দিয়া।' "

তারপর হৃষিকেশের কথা উঠিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—"আর সে হৃষিকেশ নেই, বিরক্তদের সে ঝাড়ি সব কৃত্রিম হয়ে গেছে। তখন হৃষিকেশে যে কেউ যেতে পারত না। আমার অদৃষ্টে তখনকার সাধু মহাপুরুষদের দর্শনলাভ যে-রকম ঘটেছিল—সে-রকম সকলের হয় না। হরি মহারাজ ও স্বামীজী দুই-একজনকে দেখেছিলেন।"

"৺কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করি। তিনি মৌনী ছিলেন, কিন্তু ইশারা করে নিজের কাছে ডাকলেন। ভাস্করানন্দস্বামীকে দেখতে যাই ৺কাশীর জমিদার প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে। প্রমদাবাবু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন fellow ('ফেলো' বা সদস্য) ছিলেন, সংস্কৃতে অনর্গল ২/৩ ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারতেন ও বেদান্তশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ভাস্করানন্দস্বামী আমাকে নিজ হাতে পেঁড়া খাইয়েছিলেন। প্রমদাবাবুকে এক সময় বলেন, 'তুমি তাকে সঙ্গে না নিয়ে আসলে তোমার সঙ্গে কথা বলব না। তাকে দেখে আমার বৈরাগ্য হয়, ইত্যাদি।' তিনি আমাকে চার বছর বেদ পড়াবেন বলেছিলেন ও তাঁর কাছে থাকতে বলেন। আমার তখন হিমালয় দর্শনের জন্য মন ব্যাকুল, তাই সম্মত না হয়ে বলি, 'যে দৃষ্টিশক্তির দ্বারা পুস্তক পড়ে জ্ঞান লাভ করব, আপনি আমার সেই দৃষ্টি অন্তর্মুখীন করে দিন, যাতে আমি আত্মারামের দর্শন পাই।' তখন তিনি বলেন, 'তা হলে দেখছি তুমি যোগী।'

"গয়ার ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে গম্ভীরনাথকে দর্শন করি, তিনি নিজ কুটীরের কাছে স্থান দিতে চান ও বলেন—'বেটা হিঁয়া বৈঠ যাও, সব মিল যায়গা।' আমি উত্তর দিই, 'আমার গুরুদেব বলতেন, সমুদ্র আর হিমালয় না দেখলে অনন্তের ধারণা হয় না। হিমালয় দর্শনের জন্য আমার মন-প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে।'

"এছাড়া হীরাদাস, মায়ারাম অবধূত ও তাঁর বিখ্যাত শিষ্য স্বয়ংজ্যোতির দর্শন পাই। এঁরা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। স্বয়ংজ্যোতি ছাড়া কেউ-ই এখন জীবিত নেই। তিনিও খুব বৃদ্ধ। হীরাদাসের গায়ে পাখিরা উড়ে এসে বসত।

"হৃষীকেশের একটি সাধু কিভাবে বাঘের মুখে প্রাণ দিয়েছিলেন স্বামীজীকে সেই ঘটনাটি বলি—একস্থানে তিনজন সাধু থাকতেন, একদিন বাঘ আসছে দেখে দুজন সাধু চলে গেলেন,

কিন্তু তৃতীয় জন উঠলেন না—বাঘের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'আও নরসিং পাও নরসিং।' যখন বাঘ তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখনও তিনি বলছিলেন,—'সোঽহং সোঽহং।' বাঘ সাধুকে নিয়ে অন্তর্হিত হলো। নক্ষত্রখচিত নিস্তব্ধ রজনীতে সেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কিছুক্ষণ শোনা গেল—তারপর আর শোনা গেল না।

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শেষ অবস্থায় একদিন দেখতে গিয়েছিলাম, গঙ্গাবক্ষে বজরায় থাকতেন, কথা বলতে বলতে মধ্যে মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে যেতেন। আমাকে খুব আদর করেছিলেন। ঠাকুর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'তিনি মায়ের ভক্ত, মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন।' ঠাকুরের মুখ লাল দেখে মহর্ষি খুব আনন্দিত হন।"

অতঃপর বিজয়বাবু আমেরিকায় মিশনের কাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "ফল কিছু হয়েছে, কিন্তু ওরা খড়ের আগুন, জ্বলতেও যতক্ষণ নিভতেও ততক্ষণ। ইংল্যাণ্ড সহজে কিছু নিতে চায় না, কিন্তু যেটা ধরে চরম করে ছাড়ে।"

৭ মার্চ ১৯২৯, ২৩ ফাল্গুন ১৩৩৫। সারগাছি আশ্রম

এই দিন নানা প্রসঙ্গের পর সারগাছি আশ্রম সম্বন্ধে স্বামী শঙ্করানন্দের কয়েকটি সুখ্যাতিসূচক কথা উল্লেখ করিয়া আশ্রমকর্মীদের বাবা বলিলেন, "ভবিষ্যতে যাতে তোমরা আরও ভাল হতে পার তার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি। ধীর স্থির শান্ত ভাবে বাস করবে। কোন রকম গোলমাল ঝগড়া মনোমালিন্য যাতে না হয় তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। কখনও temper lose (মেজাজ গরম) করবে না। হাজার বার রাগিয়ে দিতে গেলেও চুপ করে থাকবে। গায়ে নোংরা মাখিয়ে দিলেও নির্বিকার হয়ে থাকবে—তবেই তো সাধু। সহ্যগুণ মহাগুণ। ঠাকুর বলতেন, 'স' তিনটি। 'শ', 'ষ', 'স'—সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। তাঁর আগে আর কে এরকম বলেছে? যতই সহ্য করবে, ততই তোমার শক্তি বাড়বে।

"দেখ, There is no harm in establishing myself before you now. (এখন তোমাদের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে দোষ নেই)—এ কি সোজা কথা! সন্ন্যাসী মরণের মুখে এগোচ্ছে! জান না কার সঙ্গে কথা বলছ! এ কি আমি! আমার মধ্যে তিনি (বুকে হাত দিয়া), দেখ আমি যা বলব তার অবাধ্য হয়ো না। আমি যা বলব তার উপর চালাকি করো না। আমি জোর করে বলছি—এখানে আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আমার চেয়ে বেশি ভাববে। খোদার ওপর খোদকারী করতে গেলে ঠকতে হবে। দেখছ না কি আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে। এ কি আমার চেষ্টায়! সমস্তই তাঁর ইচ্ছায়। তিনি আমার মধ্যে বুদ্ধি জাগিয়ে দিচ্ছেন; তাই দেখ, যে গড়ে তার দ্বারা কখন ভাঙন হয় না। ঠাকুরের আশীর্বাদে আমি constructive (গঠনমুখী) হতে পেরেছি। ৩২ বছরের মধ্যে আমার হাতে একটা কাঁচের গ্লাসও ভাঙেনি। তোমরা extrav-

agant (অমিতব্যয়ী) হচ্ছ। কপালগুণে আমার জুটেছে ভাল। সব আমার চেয়ে উদার— আমি একগুণ খরচ করতে গেলে তোমরা তা চারগুণ বাড়িয়ে দাও।

"দেখ, ৺কাশী সেবাশ্রমের চারুবাবু একলক্ষ টাকা জমিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু খাবার পর একটি কাবাবচিনি মুখশুদ্ধি দিত। কেউ খেতে এলে অন্যত্র যেতে বলত। বলত, 'এ সেবাশ্রম, অদ্বৈতাশ্রমে যাও।'

"অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) এসে আমার চোখ খুলে দিয়েছে। এ আশ্রমে যদি কেউ ওদের মত থাকে তা হলে ভবিষ্যতে উন্নতি হবে। তার জন্য লিপটনের চা কেনা হয়েছিল বলে অমূল্য বললে 'মহারাজ এক টাকা পাঁচসিকার বেশি দরে চা কিনবেন না। চা খুচরা কিনবেন।' দেখ এ-ও ঠাকুরের সঙ্কেত। বড় মানুষিটা কিছু কম কর। যাতে একটু জিনিসেরও অপচয় না হয় তার দিকে দৃষ্টি রাখবে।

"প্রকৃত ভক্ত যারা তারা কিছু আশ্চর্য দেখলেই মনে করে এ ভগবানের খেলা। তোমরা দেখছ, পাতা নড়ছে, বাতাস বইছে। কিন্তু ভক্ত মনে করে—তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না। আমি কিসের জন্য এতদিন এখানে পড়ে আছি? প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। কাজ করাচ্ছেন তাই আছি।

"আর সেই আদর্শ, এইতো এত সামনে রয়েছে। আমি জোর করে বলছি, যার এখানে হবে না তার কোথাও হবে না। ঠাকুর বলতেন, 'যার হেথায় আছে তার সেথাও আছে।'

"এসব মনে রাখবে, সাধু হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তীক্ষ্ণ ক্ষুরের উপর দিয়ে চলা বরং সহজ। সর্বদা সাম্যাবস্থায় থাকতে হলে এখন থেকে হুঁশিয়ার হও।"

সান্ধ্যভজনের পর কয়েকজন ভক্ত আশ্রমের প্রথম অনাথ বালকদের সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে বাবা বলিলেন, "ছবিলাল, রণবীর, যশবীর ও বাহাদুর—ওরা সব genius (প্রতিভাবান) ছিল। অল্প বয়সে বাহাদুরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বায়না ধরল, 'ঠাকুরঘরে যাব, বেলুড়ের ঠাকুর মন্দিরে।' মাথার কাছে গীতা ও ঠাকুরের ছবি রেখে দিলাম। মৃত্যুর পূর্বে চোবেজীকে বলল, 'কাঁদছ কেন? আত্মা অমর। আমার দেহটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তো মরব না।' ১০/১২ বছরের ছেলে অদ্ভুত প্রশ্ন করত। পাপ কি? পুণ্য কি? মৃত্যুর পর মানুষের কিছু থাকে কি না? বাহাদুর বলেছিল, 'বাবা আমি বেঁচে থাকলে আপনার ভাব নিয়ে আশ্রমের জন্য প্রাণপণ খাটবো।' শেষ সময়ে সজ্ঞানে ঠাকুরের নাম করতে করতে দেহত্যাগ করে।"

২৮ এপ্রিল, ১৯২৯। সারগাছির মন্দির প্রতিষ্ঠার পর এক রবিবার

আজ বৈকালে লালবাগ মহকুমার ডেপুটি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অনুরোধে বাবা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গে বলেন, "দেখুন মশায়, এ-যুগে ঠাকুর ও স্বামীজী প্রত্যক্ষ দেবতা। ঠাকুর

যে সাক্ষাৎ ভগবান তাতে সন্দেহ নেই। তখন কি সব বুঝতে পারতাম! ঠাকুরের কাছে যাই ১৩/১৪ বছর বয়সের সময়। তখনই স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়। ঠাকুরই বলে দিলেন, 'নরেনের সঙ্গে খুব মিশবি, নরেন ১০০টা পান খায়, তাতে কি? যখন রাস্তা দিয়ে যায়, বাড়িঘর গাড়িঘোড়া রাস্তা সবকেই নারায়ণ দেখে।'

"ঠাকুরের ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতার কথা শুনলে অবাক হতে হয়। গঙ্গার ধারে বালিতে মুখ ঘষড়াতেন, রক্ত ঝরে পড়ত। সূর্য পাটে বসলে কাঁদতেন, আর মাকে উদ্দেশ করে বলতেন, 'মা, একটা দিন চলে গেল, তোমার তো কই দেখা পেলাম না, মা দেখা দাও, আর কতদিন লুকিয়ে থাকবে?' এই বলতে বলতে তাঁর অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হতো। প্রার্থনাকালে দরবিগলিত ধারে অশ্রু পড়ে তাঁর বক্ষ ভেসে যেত।

"ঠাকুরের ছবির কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে হয়—'ঠাকুর আমায় শ্রদ্ধাভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, দেখা দাও।' তাঁকে ভালবাসা ও সরলতা দ্বারা লাভ করতে পারা যায়। মন মুখ এক করা চাই। লোক-দেখান ভাবে করলে কিছু হয় না। পিতা, মাতা, পতি, পুত্রকে যে ভাবে ভাল লাগে সেই ভাবে সাধনা করলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

পঞ্চভাবের (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর) যে ভাবটি আপনার ভাল লাগে সেই ভাবে ডেকে দেখুন প্রাণে শান্তি পান কিনা। তারপর আমাকে বলবেন। একটি ভক্ত ঠাকুরকে বলে —'ঈশ্বরচিন্তা করতে পারি না, একটি ভাইপো বড় প্রিয়, তার কথাই মনে পড়ে।' ঠাকুর তাকে বললেন, 'ওকেই সাক্ষাৎ নারায়ণ ভাবে দেখবে।' আশ্চর্য, তাতেই সে শান্তি লাভ করল।

"সকালে শয্যাত্যাগ করবার সময় 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে উঠবেন। সন্ধ্যাবেলা হাততালি দিয়ে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলবেন। প্রার্থনা কালে বালকের মতো সরলতার সঙ্গে তাঁর কাছে আবদার করতে হয়।"

প্রফুল্লবাবু বলিলেন, "যখন বিষ্ণুপুরে ডেপুটি ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীকে দর্শন করতে যেতাম।" উত্তরে বাবা বলিলেন, "আপনি তো মশায় মহা ভাগ্যবান।"

২ মে, ১৯২৯

বাবা বিকালে চা পানের পর তাঁর তিব্বত ভ্রমণ, বিভিন্ন স্থানে মহাপুরুষদর্শন-প্রসঙ্গে বলিলেন, "ঠাকুরকে ফুলের মালা যেন প্রত্যহ দেওয়া হয়, এ-বিষয়ে যেন সকলের হুঁশ থাকে। কিন্তু কই এ-বিষয়ে সকলের লক্ষ্য কই? এত দেখেও চোখ খুলছে না। আক্ষেপ হয় যে, সে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভালবাসা কারও মধ্যে দেখতে পাই না। ঠাকুরকেই মানতে চায় না—তাঁর সন্তানদের তো দূরের কথা।

"হিমালয়-ভ্রমণের সময় এক সাধু জিজ্ঞাসা করে—'শ্রদ্ধা ঘটতী হৈ মহারাজ?' আমি উত্তর দি, 'মেরী শ্রদ্ধা বঢ়তী হৈ,' অর্থাৎ আমার শ্রদ্ধা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে, কমছে না তো!"

বৈরাগ্য কিভাবে হয় ও বাড়ে, এই-প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, "সিদ্ধার্থের যাতে সংসারে বৈরাগ্য না হয় তার জন্য শুদ্ধোধন রাজপুত্রের নিকট দিবারাত্র নৃত্য-গীত-বাদ্যের আয়োজন করেন। যে রাত্রে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করেন সেই রাত্রে দেখেন নর্তকীরা স্বপ্নঘোরে বিড় বিড় করে বকছে, বিকট মুখভঙ্গি করছে। এই দৃশ্য দেখে সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য আরও দৃঢ় হয়। তিনি ভাবলেন, এই তো জীবনের শোচনীয় অবস্থা, একটু আগে যারা হাবভাবে নৃত্যগীতে সকলের মন মুগ্ধ করছিল ঘুমঘোরে তাদের এই অবস্থা। জীব অর্ধচেতন, অর্ধনিদ্রিত, হায় হায় কবে যে এদের জ্ঞান হবে। এই বলে তিনি সংসার ত্যাগ করেন।"

সন্ধ্যায় ভজনের পর প্রণাম করিয়া সকলে তাঁহার কাছে বসিলে বাবা বলিলেন, "দুপুরে সকলেই ঘুমে অচেতন, কারও সাড়াশব্দ নেই। ভোঁস ভোঁস করে ঘুম। কুঁচকি-কণ্ঠা খাবে আর ঘুমুবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে উৎসন্নে গেল, কেউই জেগে নেই। এই তুমি জেগে রয়েছ—কিন্তু যখন ঘুমাচ্ছ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞান।

"যারা আশ্রম supervise (দেখাশুনা) করবে তাদের কি ঘুম শোভা পায়? আমি এরূপ করলে মা-লক্ষ্মী কৃপা করতেন না। এ আশ্রমে মা-লক্ষ্মীর কৃপা দরকার। দেখ না আমি সকালে চৌকাঠে জল দিতে বলি, এ-সব বিষয়ে আমি particular (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনোযোগী), তা না হলে সারগাছি আশ্রম গড়ে উঠত না।

"আমি সকাল থেকে কোদাল কোপাতাম। বাগানের কাজ করতাম। বৈকাল ৩টায় ভিজে ভাত লেবু দিয়ে খেতাম। আমার মুখটা কালো ও চুলের মধ্যে সাদা সাদা দাগ হয়ে গিয়েছিল। দিনের বেলা ঘুম কি জানতাম না। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর সারারাত্রি জেগে পড়তাম। দু-তিন দিন ছাড়া (বাদে বাদে) ঘুমাতাম। আশ্রমের লাইব্রেরির বেশির ভাগ বই-ই আমার পড়া।"

আশ্রম যখন শিবনগর গ্রামে সেই সময়কার কথা বলিতে গিয়া ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা উঠিলে বাবা বলিলেন, "স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এখানে এসেছিল। আশ্রমের records (খাতাপত্র), আমার ডায়েরী, বড় মহারাজের সহিত সমস্ত correspondence (পত্রবিনিময়) পড়ে আমায় বলেছিল, 'পত্রাদি রাখবার এমন ব্যবস্থা আর কোন আশ্রমে দেখিনি। বড় মহারাজের অনেক চিঠিপত্র স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রজ্ঞানন্দ খুব অল্প বয়সে দেহত্যাগ করে। পড়াশুনার কি জেদ! যে কয়দিন এখানে ছিল দিনরাত পড়তো। বলেছিল, 'মহারাজ, ইচ্ছা হয় সারগাছি আশ্রমের book-worm (গ্রন্থকীট) হয়ে থাকি।' আমার আক্ষেপ যে আজ পর্যন্ত একজন studious (পড়াশুনায় আগ্রহী) সেবক

পেলাম না। তোমরা খুব পড়াশুনার চর্চা কর। দরকার হয় তো আমি ভাল আলো কিনে দেব। এ জাগা-ঘর, এখানে ঘুম আসবে কেন? যদি এখানে কারও চৈতন্য না হয় তার কোথাও হবে না। এ আমি স্পর্ধা করে বলছি।”

৪ মে, ১৯২৯

আজ বৈকালে কৃষ্ণনগরের অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন অম্বিকাবাবুর সহিত আলাপের সময় বাবা বলিলেন, “মন একাগ্র হলে বাহ্যজগতের সম্বন্ধ লোপ হয়ে যায়। স্বামীজীর এই অবস্থা হতো। যখন রাজেন মিত্রের বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস পড়তেন তখন কিছুক্ষণ পড়বার পর বই পড়ে থাকত। তাঁর মন এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলে যেত। স্বামীজী বলতেন, ‘ঘর, বাড়ি, বই, চেয়ার সব উড়ে যেত, কিছু নেই, আর অনন্ত রাজ্যে আমার সত্ত্বা হারিয়ে যেত।’ শঙ্করাচার্য ও বুদ্ধদেবেরও ঐ অবস্থা হতো। এক সময়ে আচার্য শঙ্করের সামনে দিয়ে অনেক ময়লার গাড়ি চলে যায়; কিছুক্ষণ পরে এ-বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ‘আমি কিছু দেখি নি বা ঘ্রাণও পাইনি।’

“বুদ্ধদেব এক অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় বসেছিলেন। সেই রাত্রে ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়ে একটি ছোটখাট খণ্ড প্রলয় হয়ে যায়। আনন্দ এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘আমি বিন্দুমাত্রও টের পাই নি।’

“বশিষ্ঠ একটি মত্ত হস্তীর সহিত মনের তুলনা করে রাম-লক্ষ্মণকে অনেক কথা বলেছিলেন। বেদান্তবাদীরা জগতের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে না। এই জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব তারা মানে আবার মানে না।”

সিভিল সার্জন মহাশয় বলিলেন, “এ-সব বিষয় সহজে উপলব্ধি হয় না।” পরে অন্যান্য কথাবার্তার পর তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৫ মে, ১৯২৯, রবিবার

ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের কথায় বাবা আশ্রমের সেবকদের বলিলেন, “যে কাজ তোমরা করছ, এ আমার কাজ নয়, শ্রীশ্রীঠাকুরের। এর দ্বারা তুমি কারও উপকার করছ না, তোমার নিজেরই কাজ হচ্ছে। আমার কাছে কাজই ধর্ম। এ ঠাকুরের কাজ, কত মহান, কত পবিত্র—এই ভাব নিয়ে যদি কিছু করতে পার, তা হলেই হবে। নচেৎ গঙ্গাজলের কলসীতে একফোঁটা কূয়োর জল পড়লে যেমন কলসীসুদ্ধ জল নষ্ট হয়ে যায়, সেই রকম তোমাদের সব কাজ সর্বৈব মিথ্যা হয়ে যাবে।

“প্রভুর কি অপার মহিমা! নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এখানে রয়েছেন। পদে পদে তাঁর লীলা দেখছ—এতেও তোমাদের চোখ খুলছে না তো খুলবে কি করে?

"নিদ্রা জয় কর। রাত্রে একঘণ্টা জেগেছ বলে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে সুদে-আসলে শোধ নেবে? দিনের বেলা ঘুমিও না। রাত্রের ঘুমও কমাও। এত বড় পাঠাগার রয়েছে কারও পড়বার ঝোঁক নেই। শুধু ভোঁস ভোঁস ঘুম।

"নিদ্রা তমোগুণের লক্ষণ। বড়ই পরিতাপের বিষয়, ঠাকুরের ভাব সমগ্র পৃথিবীর সভ্যজাতিরা গ্রহণ করছে, আর তোমরা প্রতিদিন সে আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। যদি তোমরা এইভাবে চল তা হলে ভবিষ্যতে কি অবস্থা দাঁড়াবে তা দিব্যচক্ষে দেখছি।

"আগুন চারিদিকে ধরে গেছে। এ আগুন এক স্থানে নিভলেও অন্য স্থানে জ্বলে উঠবে। সারা জীবন প্রাণপাত করে আমরা যা করলাম, তা কিছুদিন চলবে, তারপর আর সে প্রতিপত্তি থাকবে না। যেমন কুমোরের চাকা একবার ঘুরিয়ে দিলে সেই momentum-এ (ভর-বেগে) খানিকক্ষণ ঘোরে।"

৯ মে, ১৯২৯

আজ সূর্যগ্রহণ। বাবা বলিলেন, "গ্রহণের পর গঙ্গায় মুক্তিস্নান করে আসবে, আর গঙ্গাজল আনবে।" ...নানাবিধ আসনের কথায় বলিলেন, "এখনও সময় আছে, সংযম অভ্যাস কর। স্বামীজী বলেছিলেন—শিবের কথা—'যদি কেহ একাগ্রচিত্তে, নিদ্রা আর আলস্য ত্যাগ করে একাসনে কোন মূর্তি চিন্তা করে বা [মূর্তি-] ধ্যানশূন্য অবস্থায় থাকতে পারে, সে শীঘ্র পরম যোগী হয়ে পড়ে।' এ মহাদেবের বাক্য।"

আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে, বাবা গঙ্গাজল মাথায় ও শরীরে দিলেন এবং পতিতপাবনী মা গঙ্গার নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। পরে স্বামীজীর গঙ্গাভক্তি ও 'পরিব্রাজকে' তাঁর গঙ্গা-বর্ণনার উল্লেখ করিলেন।

গঙ্গাস্নান ও পাপপুণ্য-প্রসঙ্গে বলিলেন, "এক সময়ে অর্জুনের মনে অহঙ্কার হয় যে, তাঁর মতো নিষ্পাপ দেহধারী কেহ নাই, তাঁর মতো কৃষ্ণভক্তও আর নাই। এদিকে তিনি দেখেন, এক ব্রাহ্মণ ভক্ত জীবহত্যার ভয়ে শুষ্ক ঘাস খান, কিন্তু সব সময়ে একটি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করে থাকেন। অর্জুন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি জীবহত্যা করবেন না বলে শুকনো ঘাস খাচ্ছেন, তা কোমরে একটা তরবারি ঝুলছে কেন?' উত্তরে ব্রাহ্মণ বলেন, 'আমি তিন জনকে হত্যা করতে চাই। প্রথমে—অর্জুনকে, কারণ সে ভগবানকে সারথি করে কষ্ট দিয়েছে। দ্বিতীয়—দ্রৌপদীকে, সে ভগবানকে খেতে দেয় নি, ভগবান খেতে বসেছেন এমন সময়ে সে তাঁকে ডেকেছে আর তিনি না খেয়ে দ্রৌপদীকে রক্ষা করবার জন্য ছুটেছেন। আর একজন—প্রহ্লাদ, সে বিপদে পড়লেই ভগবানকে ডাকছে, আর তিনি ছুটে আসছেন।' ভক্ত ব্রাহ্মণ যখন এই কথাগুলি বলছেন, ভগবান তখন শক্ত ঘাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। অর্জুনেরও দর্পচূর্ণ হলো। শ্রীশ্রীঠাকুর এই গল্পটি বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন আর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে যেত।" ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল আসিয়া গেলে আমাদের দিতে লাগিলেন।

দিনাজপুরের সুরেনবাবু বাবাকে বলিলেন, "সেই অনাথ বালকটি যথার্থ কাজ করেছে।" উত্তরে বাবা বলিলেন, "ও আমাকে চিনে ফেলেছে, বড় বুদ্ধিমান।" তারপর বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরের সন্তান আমরা, তাঁর কৃপায় কি হয়ে গেছি! তাঁকে দর্শন স্পর্শন করেছি, পদসেবা করবার সময় তাঁর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মাথায় টিপ দিয়েছি; আমায় ভালবেসেছেন, আশীর্বাদ করেছেন, আর কি বাকি আছে! ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান, অবতারবরিষ্ঠ—স্বামীজী বলেছেন। তাঁকে সমস্ত অর্পণ কর। ঠাকুর স্বয়ং এখানে বসেছেন; আমি তাঁকে যত দূরে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছি, তিনি তত জোর করে এসে বসেছেন। যদি এতেও তোমাদের না হয়, তাহলে কি করে হবে! এই সব কথা হৃদয়ঙ্গম করবে, বিশ্বাস করবে। এটি গোপনীয় কথা তোমাদের বললাম।"

১৫ মে, ১৯২৯, মঙ্গলবার সকাল

আজ সকালে চা-পানের সময় বাবা তাঁর তিব্বত ভ্রমণের কিছু কাহিনী বলিলেন, "আমি লাসা যেতে পারিনি। কাশ্মীরের এক শালওয়ালা আমাকে বলে, 'আপনাকে একটি মাত্র মিথ্যা কথা বলতে হবে যে, আপনি লাদাকী মুসলমান, তাহলে আপনাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব। পথে কেউ সন্দেহ করবে না।' এই প্রস্তাবের উত্তরে আমি বলি, 'কভী নেহি হোনে সকতা।' কোন অবস্থাতেই মিথ্যাচরণ করিনি।

'ট্যাসি লামা আমাকে খুব ভালবাসতেন। এরূপ তিন চার জন জাতিস্মর লামাকে দেখেছি। একজন লামা আমাকে ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে আরতি করেছিলেন।

"তিব্বতে থাকাকালে আমাকে কি বিপদেই না দিন কাটাতে হতো। লামারা একবার ঠিক করেছিল আমার গাল কেটে দেবে, যাতে আমি ফিরে গিয়ে তিব্বতের খবর বলতে না পারি। আমায় মেরে ফেলবে, না হয় যাবজ্জীবন কারাগারে রাখবে—এ-কথাও তারা বলেছিল। পরে যখনই মেরে ফেলার চেষ্টা করত, তখনই পাহাড়ী ব্যবসায়ীরা জামিন হয়ে বাঁচাত।

"সেখানকার মঠে খুব কঠিন ও কঠোর নিয়ম। সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে লামারা শিষ্যদের মঠ থেকে তাড়িয়ে দিত। এমন দু-এক জনকে গৃহস্থ হতে দেখেছি।

"শরৎ দাসের কীর্তির পর লামারা বাঙালীদের বিশ্বাস করত না। তিনি সাধু বলে পরিচয় দিয়ে তিব্বতের ছবি তুলে আনেন এবং ইংরেজের কাছে অনেক গুপ্ত কথা বলে দেন। পরে তিব্বত সম্বন্ধে একখানি বইও রচনা করেন। যে লামা শরৎ দাসকে আশ্রয় দেন, অন্য লামারা তাঁকে দুবার হত্যা করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারেনি; তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। লামারা আমাকে বলত, 'তুমি যে বিশ্বাসঘাতক নও তা কেমন করে জানব?'

"তিব্বত থেকে ফেরবার পর কলকাতার গোয়েন্দা পুলিসের একজন বড় কর্তা (যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র) আমাকে অনেক প্রলোভন দেখান ও স্বামীজীকে বলেন, 'আপনি এঁকে বলুন যেন ইনি তিব্বত ভ্রমণের বৃত্তান্ত গভর্নমেন্টকে লিখে জানান। সবে তো আপনাদের মঠ হয়েছে, টাকাপয়সারও

একান্ত অভাব। আপনাদের 'lump sum' (থোক টাকা) পাইয়ে দেব। আর ওঁরও তো নাম হয়ে যাবে, জায়গীর খেতাব মিলে যাবে।' স্বামীজীকে আরও বলেন, 'দেখুন, ধর্ম কি জগতে আছে? এমন অন্যায় কাজ নেই যা আমি করিনি, অথচ দিন দিন আমার পদোন্নতি হচ্ছে। কত নিরপরাধকে আসামী সাজিয়ে ফাঁসি কাঠে লটকেছি।' বলা বাহুল্য, ঐ মহাত্মা কৃতকার্য হতে পারেননি।

"ইচ্ছা হয় শরৎ দাস কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে একবার তিব্বতী ভাষায় কথা বলে দেখি তিনি কেমন তিব্বতী ভাষায় কথা বলেন। এ-প্রস্তাবে স্বামীজী বলেন, 'তুমি সাধু, ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবে কেন? ও একজন traitor (বিশ্বাসঘাতক)।'

"পরে দার্জিলিঙে অদ্ভুতভাবে শরৎ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। 'লাসা ভিলা-য় থাকতেন। সেই সময়ে তিনি তাঁর তিব্বত সম্বন্ধে লেখা দেখতে দেন ও মন্তব্য করতে বলেন। 'না দেখলে কেউ এরকম লিখতে পারে না'—এইটুকু বলায় তিনি বলেন, 'যা হোক মহারাজ, আপনার কথা শুনে অনেকটা শান্তি পেলাম। পুলিসের জনৈক ইংরেজ কর্মচারী আমার সংগৃহীত সব তথ্য মিথ্যা বলে জায়গীর কেড়ে নেবার ভয় দেখায়।'

"তিব্বত থেকে ফেরার পর কলকাতায় সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে লোক হিমালয়ে তিব্বত ভ্রমণের কথা পিপাসিত চাতকের মতো শুনতে আসতেন। কেউ কেউ বা বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন।

"স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ভ্রমণ-কাহিনী শুনে বলেন, 'Admiral Lovelock-এর বৃত্তান্তের মতো interesting (আকর্ষণীয়)। তিব্বত এখনও অজানা, ওখানকার মঠে যে মণি-মাণিক্য আছে তা কোথাও নেই।' স্বামীজী তিব্বত ভ্রমণের কথা কাউকে বলতে নিষেধ করেন। পরে যখন উদ্বোধন পত্রিকা বেরুল, স্বামীজী তখন আবার তিব্বত সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে আমাকে বলেন। আমি বলি, 'ভাই তুমি তো বারণ করেছিলে, এখন আবার লেখবার জন্য জেদ করছ কেন?' স্বামীজী বলেন, 'আমি বলছি, তোমাকে লিখতে হবে, এখন লোকে জানুক।' " এই সব প্রসঙ্গের মধ্যে বাবা তিব্বতের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেন।

১৫ মে, ১৯২৯, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা

আজ সন্ধ্যায় আমাদের ইতিহাস-চেতনা সম্বন্ধে বাবা প্রশ্ন তোলেন, "বল কে কে কতবার ভারত আক্রমণ করেছে।" আবার নিজেই বলতে থাকেন, "সিকান্দার সাহেবের পূর্বে শিশোদিয়রা ভারত আক্রমণ করে। তারপর Queen Sumerani (রানী সুমেরানী), তারপর দারায়ুস, তারপর সিকান্দার। আলেকজাণ্ডারের ঘোড়ায় চড়ার কথা Megasthenes Indica-তে (মেগাস্‌স্থিনিসের ভারত ভ্রমণে) কি আছে?' মগধের সমৃদ্ধি ও মহারাজ অশোকের কথাও আলোচনা করিলেন। আবার বলিলেন, 'আমি ইতিহাসের বই অনেক পড়েছি। জয়পুর ও খেতড়িতে মহারাজার লাইব্রেরির, তারপর মীরাটের লাইব্রেরির বই-এর পোকা ছিলাম।

রাতের পর রাত জেগে পড়তাম, তাই স্বামীজী আমাকে অত রাত জাগতে নিষেধ করেন। তোমাদের এত বড় লাইব্রেরি পড়ে রয়েছে, বইগুলো পচছে। কারও পড়বার তেমন জেদ দেখছি কই? পড়লে একটা সুন্দর intellectual pleasure (বুদ্ধিগত আনন্দ) পাওয়া যায়।'

"তোমাদের মধ্যে কেউ কি সমুদয় মহাভারত রামায়ণ পড়েছ? পড়নি। কি পরিতাপের কথা! আমার মনে হয় যদি কেউ আমায় রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, আর আমি তার যথাযথ উত্তর দিতে না পারি, তা হলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। কেমন করে হিন্দু বলে পরিচয় দেব? মহাভারত পড়লে একজন আদর্শ সন্ন্যাসী, আদর্শ গৃহী, আদর্শ রাজা বা আদর্শ মন্ত্রী, যেমন চাইবে, তাই হতে পারে। মনুস্মৃতি পড়ে দেখ, ব্রহ্মচারীর কি কর্তব্য, গুরু-শিষ্যে কি সম্বন্ধ, শিষ্য গুরুর নিকট কিরূপ আচরণ করবে—সব লেখা আছে। পড়ে দেখ।"

২৫ মে ১৯২৯, ১০ জ্যৈষ্ঠ, বুদ্ধপূর্ণিমা

ভজনের পর সন্ধ্যায় প্রণাম করিতে সমবেত হইলে বাবা সকলকে তাঁহার নিকট বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা, ভগবান বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলব। বুদ্ধ ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু নারী হয়ে কখনও জন্মাননি। ৫০ কি ৫৫ বার সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এমন কথাও আছে যে, বুদ্ধদেব শ্রীরামচন্দ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'শাক্য' নামটি কি করে হয়েছে জান? 'শক্যম্' এই কথাটি থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। বংশের মধ্যে ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধ থাকলেও বিবাহ হতে পারে, এই অর্থে 'শক্যম্'। স্বামীজী বুদ্ধদেবের কথা বলতে আরম্ভ করলে কেমন গম্ভীর হয়ে যেতেন।" কপিলের সাংখ্যদর্শনের কথাও দু-একটি হইল।

পরে কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য করিয়া বাবা বলিতে লাগিলেন, "দোষ করে কখনও আত্মপক্ষ সমর্থন করো না। তাহলে কিছু শিখতে পারবে না। এরকম করলে স্বামীজী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন, ভীষণ বকতেন।

"ঘুম কম কর, ঘুমকে আমি একেবারে দুচক্ষে দেখতে পারি না। এ জাগা-ঘর, এখানে ঘুম আসবে কেন? আসল কথা, সে ব্রহ্মচর্য নেই। সামান্য একটু রাত জেগেছ তো কি হয়েছে? যৌবনে যে যতটা শক্তি রক্ষা করতে পারে, সে তত কাজ করতে পারে। এই বুড়ো বয়সে এখনও আমার মনে হয়, চন্দ্র সূর্য পেড়ে খাই; মনের এত শক্তি ও সাহস তিন তিন বার মৃত্যুকে বরণ করে তিব্বতে গেছি। কোন বিপদকেই ভ্রূক্ষেপ করিনি। ব্রহ্মচর্যই আদত।"

১৬ জুন ১৯২৯, ১ আষাঢ়

বাগানে কাজ করিবার সময় বাবা একটি কর্মীকে বলিলেন, "দেখ বাবা, যা বলি সব সময়ে serious হয়ে (গুরুত্ব দিয়ে) বলি না। কখনও semi-serious হয়ে (আধা গুরুত্ব দিয়ে) কখনও বা রহস্য করে বলে থাকি। আমাদের ঠাকুর ছিলেন রসিক-চূড়ামণি, আমরা তাঁর

সন্তান, কাঠখোট্টা সাধু নই। পোড়া কাঠের মতো থাকবে কেন? ঠাকুরের দরবারে এসেছ, তাঁকে লাভ করবার জন্য—এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য—এসব জয় করতে না পারলে কি হলো?"

সেই কর্মীটি বাগানের কাজ শেষ করিয়া আসিলে বাবা তাহাকে আবার বলিলেন, "তুমি অমন করে গা আড়াল দিয়ে থাক কেন? কোন্ রাজ্যে থাক, পাত্তাই পাওয়া যায় না। প্রতিদিন খানিকক্ষণ করে আমার কাছে বসবে। বুদ্ধিশুদ্ধি খুলে দেব। মরে গেলে এসব শুনবে কোথা থেকে?"

রাত্রে স্টেশনে যাইতে আপত্তি করায় তিরস্কার না করিয়া ঐ কর্মীটিকেই আবার বুঝাইতে লাগিলেন, "সাধু ব্রহ্মচারী, পারব না, এ কি কথা!

'পারিব না এ-কথাটি বলিও না আর,
পাঁচজন পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা
পার কি না পার তাহা দেখ একবার,
এক বারে না পারিলে কর বার বার।'

তোমরা রামনাম কর, এই কি তার ফল! তোমাদের বয়সে আমাদের মনের অবস্থা মহাবীরের মতো—যেন চন্দ্র সূর্য পেড়ে খাই, এই ভাব। তোমরা কাজের ভয়ে সামনে ভিড়তে চাও না। আমি স্পষ্ট কথা বলছি, আমার মন মুখ এক। আমি তোমাদের বেশি খাটিয়ে নিতে চাই। যাকে দিয়ে কাজ হবে, তাকেই বেশি চাই। চার-কাটিতে মাছ খাবলাবে, তবে তো গাঁথব। স্বেচ্ছায় যে ভিড়বে, তার হবে। যে দূরে চোখের আড়ালে থাকতে যাবে, তার সব তাতেই ফাঁকি। ফাঁকি কাকে দেবে? যে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে, সে নিজেই ফাঁকে পড়ে, সে নিজেই ঠকে।"

১ আষাঢ় ১৩৩৬, ১৬.৬.২৯

আজ সকালে বাবা ১৮৯০ খ্রীঃ তিব্বত হইতে ফিরিবার সময়ের কিছু ঘটনা বলিলেন, "কাশ্মীরে আমাকে নজরবন্দী করে জেলে রাখে, পাঁচদিন hunger-strike করি। সঙ্গে তিব্বতী raw tea যা ছিল তাই এক এক কাপ খেতাম। ১৪ দিন রেমিটেন্ট জ্বরে ভুগে শরীর খুব খারাপ হয়। সেই শরীর দেখেও লোকেরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো, টকটকে লাল rosy hue—ওটা climatic influence। বালি স্টেশনে[১] এক পুলিশের লোক বলে—তোমাকে হাওড়া

---

১. কাশ্মীরে রামবাগে নজরবন্দী অবস্থায় গঙ্গাধর মহারাজ (ভাবী স্বামী অখণ্ডানন্দ) বরাহনগর মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সব কথা জানাইয়া পত্র দেন। বরাহনগর মঠ হইতে এবং কাশী হইতেও কাশ্মীরে পত্র প্রেরিত হইলে কিছুকাল পরে গঙ্গাধর মহারাজকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার পর তিনি কাশ্মীরের তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিয়া রাওলপিণ্ডি, লাহোর ও কাশী হইয়া ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৯ জুন বালি স্টেশনে পৌঁছেন। স্বামী অন্নদানন্দ লিখিত 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' গ্রন্থ, ১ম সং, পৃঃ ৫৯-৬১ দ্রষ্টব্য।—সঃ

যেতে হবে। আমার গুরুভাইদের সংবাদ দিতে বলায়, সংবাদ দিলে; হাওড়া নিয়ে গেল। তখন আমার পরনে তিব্বতী পোশাক। 'Statesman'-এ আমার সংবাদ উঠেছিল—এক mysterious সাধু এসেছে, তিব্বত আফগানিস্থান ভ্রমণ করে—ঐ-সব দেশের ভাষা জানে, ইত্যাদি।

"আমি কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাব সব জানবার পর, সঙ্গে একজন পুলিশ কর্মচারী দিয়ে আমাকে বরাহনগর মঠে পাঠিয়ে দিল। মঠে এসে কর্মচারীটি স্বামীজীকে বললে, 'আপনি দয়া করে লিখে দিন ইনি আপনাদের একজন গুরুভাই ও এঁর সম্বন্ধে...।'

"মহাপুরুষ মহারাজ কলম ধরে আছেন—স্বামীজী বলামাত্র লিখতে আরম্ভ করবেন। এমন সময়ে স্বামীজী কাগজখানা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, 'লিখে দেব আবার কি?' তাঁর তীব্র কটাক্ষ ও ভ্রূকুটি দেখে বেগতিক বুঝে কর্মচারীটি চম্পট দিল। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ কাশ্মীরের Resident-কে একখানি পত্র দিলেন—সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি এরূপ ব্যবহার হলে, আমরা বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে কোথাও 'কলোনী' করব। আমরা সাধু-সন্ন্যাসী, purely religious। যাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ অত্যাচার না হয় তার বিহিত করবেন। এরপর পুলিশ আর হয়রানি করেনি। কাশ্মীরের Resident কলিকাতার পুলিশ দপ্তরে লিখেছিলেন—গঙ্গাধর বাবাকে আমরা জানি, তিনি সাধু, কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত নন, তাঁকে সন্দেহ করবার কোন কারণ নাই, ইত্যাদি।"

* * *

১৯০৭ সালে আসামের ভীষণ বন্যার কথায় বাবা বলিলেন, "সে রকম বন্যা অনেকদিন হয়নি। এ সময় আহারাদির সংযম অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন। কত লোক খেতে পাচ্ছে না, পরনে কাপড় নেই। যদি এ সময়ে আমাদের প্রাণে না লাগে, তাহলে হলো কি? আমরা কি লোক ঠকাতে সাধু হয়েছি? যখন লালগোলা রাজবাড়িতে যেতাম—কত লোক আমার কাছে তাদের দুঃখ জানাত। সে সময় ওখানকার লাইব্রেরি থেকে নিয়ে ম্যাটসিনির জীবনী পড়ছিলাম। ইটালীর স্বাধীনতার জন্য তিনি কী না করেছেন! তিনি কালো পোশাক পরে থাকতেন—sign of grief। খেতে পারতেন না। খাবার সময় তাঁর সামনে ভেসে উঠত hungry millions-এর মুখচ্ছবি। আর তিনি দরবিগলিত ধারে কাঁদতেন। মনে হলো পরের দুঃখে আমার প্রাণ তো এর শতাংশের একাংশও কেঁদে উঠল না।

"তখন এ অঞ্চলেও দুর্ভিক্ষ চলেছে। অথচ কিছু করতে পারছি না। প্রায়োপবেশন শুরু করি। পাঁচ মাস শাকপাতা খেয়েছিলাম। আমরা কাঠখোট্টা সাধু নই। তোমাদের সে feelings-এর একান্ত অভাব।"

* * *

বৈকালে চা খাবার সময় বাবা কচ্ছে ডাকাতের হাতে কিরূপ বিপন্ন হন তাহা বলিলেন।

নারায়ণ সরোবরের পথে স্বামীজীর সন্ধানে যাইতেছিলেন। সঙ্গে কিছু অর্থ থাকিলে ডাকাতরা নিশ্চয় তাঁহাকে মারিয়া ফেলিত। আর এক সময় এক ডাকাতই রাত্রে বাবাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়।

১৮৯৯ সালে কলিকাতায় প্লেগের সময় বিজ্ঞাপন বিলি করিতে গিয়া কিভাবে তাঁহার জীবন দুইবার বিপন্ন হয় সেই কথার পর বাবা বলিলেন, "স্বামীজী অমন রসিক পুরুষ ছিলেন, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি, একেবারে গম্ভীর—সারা দিন কিছু খেলেন না। চুপচাপ! ডাক্তার ডেকে আনা হলো, কিন্তু তাঁরা রোগনিরূপণ করতে পারল না। একটা বালিসের উপর মাথা গুঁজে বসে রইলেন সারাদিন। তারপর শুনলাম, কলকাতার প্লেগে তিন ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে গেছে শুনে অবধি এই! সে সময় স্বামীজী বলেছিলেন, 'সর্বস্ব বিক্রি করেও এদের সেবা করতে হবে। আমরা যে গাছতলার ফকির সন্ন্যাসী, সেইখানেই যাব।'

"স্বামীজীর কী প্রাণ! তার শতাংশের একাংশও আমাদের কারও নেই! আমরা তাঁর গুরুভাই, অন্যে পরে কা কথা! ভবিষ্যৎ বড়ই খারাপ দেখছি। দেখ এ movement-এর আগুন একদিকে নির্বাপিত হলেও অন্যদিকে ধরে উঠবে। সমগ্র এশিয়া জেগে উঠেছে। টার্কির Pan-Islamic movement, রাশিয়ার Bolshevic movement তার সাক্ষী। জারের দুর্দান্ত প্রতাপ আজ কোথায়? পহল্লবী রেজা শা, সান-ইয়াৎ সেন তাঁদের দেশে নতুন জীবন এনেছেন। এদেশ থেকে সব উদ্ভুত হলেও এ দেশ উঠতে এখন দেরি। আমরা তাঁর সন্তান, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন—এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে তাঁকে একবার দেখেছে বা তাঁর কাছে গেছে, তার জীবন বদলে গেছে। যাকে স্পর্শ করেছেন, তার ঈশ্বরদর্শন হয়ে গেছে। সেই তাঁর ছেলে আমরা—ধ্যান, জপ, অদ্বৈতজ্ঞান শিকেয় তুলে রেখে দেশ জাগাতে কর্মে নেমেছি। কিন্তু কিছু হলো না। বাংলাদেশ জাগতে অনেক বাকি। বাংলাদেশের হৃদয়, হৃদয় মুখুজ্যের হৃদয়! হৃদয় ঠাকুরের এত সেবা করলে কিন্তু পেল কি? সব গুলিয়ে গেল। আর যে তাঁকে স্বপ্নে দেখেছে, তাঁর কাছে এসেছে, সে তরে গেছে।"

কিছু পরে বাবা বলিলেন, "স্বামীজী যখন আমেরিকায় লেকচার দিচ্ছেন—'ভারত রুটি চায়, ধর্ম চায় না। যদি তাদের মুখে রুটি দিতে পারা যায়, তবে তারা ধর্ম সম্বন্ধে জগৎকে অনেক শুনাতে ও শেখাতে পারে।' ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে যে দেশপ্রেমের বন্যা এসেছিল তা কল্পনাতীত। তখন আমি রাজপুতানার খেতড়ি রাজ্যে রাজার State guest ও স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই অর্থাৎ রাজার চাচাগুরু; চার জন তুরক সোয়ার অনবরত আমার হুকুমের জন্য দণ্ডায়মান। কোথাও যেতে হলে আগু-পাছু ঘোড় সোয়ার তুরক সোয়ার।

"খেতড়ির বৈদিক চতুষ্পাঠী ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য বিদেশ থেকে ভাল ভাল বাছাই করা শিক্ষক আনা, গ্রামে গ্রামে গিয়ে দাস-বালক সংগ্রহ করে তাদের দুঃখ-কষ্টের

কথা জানা—এই সব ছিল আমার কাজ। এই ছিল অহর্নিশ চিন্তা। ৫০ জন দাস-বালকের free education with meals-এর বন্দোবস্ত করেছিলাম।

"এখানে যখন কাজ আরম্ভ করি, তখন কী না opposition আমার ওপর দিয়ে গেছে। মঠ থেকেও কম বিরোধিতা হয়নি। তখন মনে হয়েছিল, স্বামীজী যদি আমাকে এ-বিষয়ে উৎসাহিত না করেন তবে চিরদিনের জন্য বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাব। তারপর স্বামীজীর এক উৎসাহপূর্ণ চিঠি পেয়ে প্রাণে সহস্রগুণ সাহস বেড়ে গেল। তিনি লিখেছিলেন, 'সাবাস বাহাদুর! ওয়া গুরুজীকী ফতে!! কাজ করে যাও, যত টাকা লাগে আমি দিব।'

"দেশের দুঃখকষ্টের কথা বলতে বলতে স্বামীজী কেমন হয়ে যেতেন। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'ভাই, কেন এ দেশ জাগছে না?' উত্তরে তিনি বলেন, 'ভাই, এ যে পতিত জাত, এদের লক্ষণ-ই এই।' আহা! স্বামীজীর তুলনা নেই, অমন মহাপুরুষ আর হবে না! অমন যদি না হবে তো যুগাচার্য বলে লোক মানবে কেন?

"পরে স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাচ্ছেন, সেই সময় বলরামবাবুর বাড়িতে তাঁকে বলেছি—'ভাই, তুমি যখন আমেরিকায় বলেছিলে—ভারত রুটি চায় ধর্ম চায় না, তখন সেই ধাক্কা আমার মধ্যে যেমন এসেছিল এমন আর কারু মধ্যে আসেনি, ঠিক কিনা বল ভাই? আর আমি তোমার অন্যান্য গুরুভাইদের মধ্যে কেউকেটা নই। তুমি আমেরিকা ইউরোপে লেকচার দিয়ে তোলপাড় করেছ, আমিও এদেশে bureaucrat Anglo-Indian civilian-দের পটিয়ে নিচ্ছি নিজের কাজ দেখিয়ে।' তারা আমায় বলত, 'স্বামীজী, আপনি আমাদের ধারণা বদলে দিয়েছেন। আমাদের ধারণা ছিল Indian sages are speculative, কিন্তু আপনাকে দেখে ধারণা হলো আর্যঋষিরা কিরূপ ছিলেন'।"

১৯ আষাঢ, বুধবার, একাদশী; ৪.৭.২৯

আজ বাবার শরীর অত্যন্ত খারাপ, পেটের অসুখ, খুব দুর্বল, সারাদিন কিছুই আহার করেন নাই। রাত্রের ট্রেনে সুরেনবাবু (সুরেন কুণ্ডু, দিনাজপুর) কলিকাতার ভক্ত বিনোদবাবুর প্রেরিত ফল মিষ্টি ও আশ্রমের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া আসিলেন।

বৈকালে বাবা আশ্রমের পুরাতন কথা-প্রসঙ্গে পাহাড়ী বালক বাহাদুরের অদ্ভুত জীবনকাহিনী আমাদের বলিলেন, "বাহাদুর বাস্তবিকই সকল কাজে বাহাদুর ছিল। বাহাদুরের মৃত্যুসংবাদ শুনে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও বহরমপুরের হরিবাবু কেঁদেছিলেন। বাহাদুর দুবার ৮/১০ বছরের জলমগ্ন বালকের প্রাণরক্ষা করে। বহরমপুরের বিখ্যাত উকিল বৈকুণ্ঠবাবু বলেছিলেন, 'বাহাদুরকে Victoria Cross দেওয়া উচিত।'

"বাহাদুরের গলা অতি মিষ্টি ছিল। এক সময়ে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় গান শেখাবার জন্য তাকে চেয়েছিলেন। বাহাদুরের বয়স যখন ১১ বছর, তখন ৩ মণ গুরুভার সে

অক্লেশে বইতে পারত। তার strong common sense ছিল। একবার ভগীরথপুরের জমিদারবাবুদের বাড়িতে ওকে নিয়ে যাই। ১৪ দিন ছিলাম। সে সময়ে বাহাদুরের গান শুনে, কুস্তি দেখে সকলে বিমুগ্ধ।

"বাহাদুরের পিতা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে। নেপালের কি রকম শাসনপদ্ধতি, criminals-দের কি রকম শাস্তি দেওয়া হয়, নেপালের ভেতরকার অনেক বিষয় এমনভাবে আলোচনা করেছিল যে, জমিদারবাবু বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—মহারাজ, এর আগে আমরা এরূপ অদ্ভুত বালক দেখিনি, বাহাদুর নেপালের ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে দেখিয়ে দিল।"

বাহাদুরের প্রশংসায় বাবা বলিলেন—"কি উচ্চমনা ছিল! আমার চেয়েও দাতা, দরদী—ওরূপ ছেলে আর হয় না। বৈকুণ্ঠবাবু, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, হরিবাবু প্রভৃতি বলেছিলেন—'স্বামীজী, বাহাদুর ঋষি।'

"বাহাদুর এক এক সময়ে ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন করত যে, বলতে বাধ্য হতাম—'এর উত্তর এখন বললে বুঝতে পারবে না; বড় হও, তখন বলব।' কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট বলতাম—'বাহাদুর, মনে হয় এ-প্রশ্নের উত্তর এই, তবে সঠিক বলতে পারছি না।' এগার বছরের বালক বলত—'স্বামীজী, আশ্রমের এসব ছেলেরা কেউই থাকবে না তা আমি জানি। আমি বড় হয়ে আপনার সেবা করব—আর প্রাণপাত চেষ্টা করব যাতে আশ্রমের উন্নতি হয়। আমি আপনার কুকুর হয়ে পড়ে থাকব, যাতে আপনি শান্তি ও বিশ্রামের অবকাশ পান তার চেষ্টা করব।'

"বাহাদুরের চোখ খারাপ ছিল। বড় বড় সাহেব ডাক্তাররা দেখে বলেছিল, 'স্বামীজী, ওকে পড়তে দেবেন না, গান শেখাবেন।' রাত্রে ওকে একেবারে পড়তে দিতাম না। তাতে সে বলত, 'স্বামীজী, আমার সমবয়সীরা লেখাপড়া করবে আর আমি মূর্খ হয়ে থাকব? এ আমার সহ্য হবে না।'

"বাহাদুর ভয় কাকে বলে জানতো না। কেউ অন্যায়ভাবে গাল-মন্দ দিলে এমন রুখে দাঁড়াত যে, সেই সময় তার মুখচোখের ভাব দেখে জোয়ান লোকেরাও তার সামনে ভিড়তে পারতো না। তার প্রশ্নগুলো মনে পড়ছে, 'স্বামীজী, আকাশের কোন রঙ নেই, কিন্তু কেন নীল দেখায়? নক্ষত্রের আলো কোথা থেকে আসে? আচ্ছা স্বামীজী, মরে গেলে শরীরটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু মানুষটা আবার কিরূপে জন্মায়?' প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে, কোন কোন দিন বা পায়ে হাত বুলুতে বুলুতে এই সব প্রশ্ন করত।

"রান্নাঘরে গিয়ে চোবেজীর (কান্যকুব্জী পাচক ব্রাহ্মণ) সঙ্গে এইসব আলোচনা করত। চোবেজী অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না, ধমক দিত, 'তুই বাচ্চা, তুই আবার কি জানিস?' দূর থেকে সব শুনে বলতাম, 'চোবেজী, তুমি ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছ না আর ধমক

দিচ্ছ।' তখন বাহাদুর হেসে বলত, 'আপনি এসব শুনেছেন?' আমিও হেসে বলতাম, 'শুনেছি, তুমিই ঠিক বলছিলে।'

"থাইসিস রোগে বাহাদুর ৮ মাস কাল শয্যাশায়ী থাকে। শরীরের উপর কেবল চামড়া ও হাড় কখানি ছিল। কিন্তু সে-সময়ও তাকে খাইয়ে দিতে চাইলে খেত না, বিছানায় উঠে বসে তবে খেত। বলত, 'জীবন থাকতে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই খেতে পারব না; তবে যদি স্বামীজী আমাকে খাইয়ে দেন, তবে সে আলাদা কথা, তা হলে শুয়েই খাব।'

"দেহ যাবার ২/৩ দিন পূর্বে বাহাদুরের অবস্থা দেখে চোবেজী চোখের জল সামলাতে পারল না, তাই দেখে সে বললে, 'চোবেজী, কাঁদছ কেন? আমার দেহটা চলে যাবে আমি তো মরব না।'

"মৃত্যুর কিছু আগে বিকার হয়, বায়না ধরল, 'আমি ঠাকুরঘরে যাব, আমার শিয়রে গীতা রেখে দেন।' গীতা নিয়ে মাথায় বুকে স্পর্শ করলো।

"মঠ যখন নীলাম্বরবাবুর বাগানে তখন একবার পাহাড়ী ছেলেদের সেখানে নিয়ে যাই। তাই বায়না ধরল, 'আমি ঠাকুরঘরে যাব।' ঠাকুরের ছবি দেখালেই শান্ত হয়ে যেত।

"আমি তার গুণের কথা একমুখে কি বলব? ওদের ত্যাগ তপস্যা ও শ্রদ্ধা দ্বারা এই আশ্রম গড়ে উঠেছে, নচেৎ সারগাছিতে আমি পড়ে থাকতে পারব কেন?"

২০ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ৫.৭.২৯

লালবাগের লোকেরা জনৈক কর্মীর পিছনে লাগিয়াছে শুনিয়া বাবা মহুলার লোকেরা তাঁহার সহিত একদিন কিরূপ শত্রুতা করিয়াছিল তাহার উল্লেখ করিলেন।

২৭ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১২.৭.২৯

আজ রাত্রে জনৈক কর্মী বাবাকে বাতাস করিতেছিলেন। আমরা হৈহয়ের (আশ্রম বালক) রন্ধনের কথা তুলিলে বাবা বলিলেন—"কিরূপ শ্রদ্ধা করে পবিত্রভাবে রাঁধছে, দেখছ তো? এই রকম শ্রদ্ধা চাই। এই যজ্ঞ আহুতি। বুঝলে? কর্মযোগ বড়ই কঠিন। কাজ করেই যেন মনে করো না যে মাথা কিনে ফেলেছ। আর বেজার হয়ো না। যারা প্রকৃত কর্মযোগী তারা কাজ করে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। যতই কাজ করুক না কেন, মনে করে—কিছুই করতে পারলাম না, তোমরা সর্বদা ঐ ideal সামনে রেখে কাজ করবে।"

৩০ শ্রাবণ, ১৩৩৬

জনৈক কর্মী আজ বৈকালে ৬-টার ট্রেনে বহরমপুর যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বাবা বলিলেন, "আজ দিন ভাল নয়।" পরে তাহাকে বলিলেন, "দেখ, আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি

সামান্য মুষ্টি [ভিক্ষা] ও চাঁদা আদায় করবার জন্য আশ্রমের বাইরে বাইরে থাক। আমার কাছে অনেক জিনিস আছে। যদি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন লিখে যেতে পার তাহলে অনেক materials যোগাড় হতে পারে। আমি বলব আর তুমি লিখে যাবে ও তার ইংরেজী করবে। আমার কথা ভবিষ্যতে জগতের লোক উদগ্রীব হয়ে শুনবে।" এই-প্রসঙ্গে বাবা আরও বলিলেন, "আর যদি ভেবে থাক মস্ত বড় একটা কিছু হয়ে পড়েছ, তাহলে সরে পড়। আমি যা বলব, তা শুনবে, কল্যাণ হবে। আমার কাছে এসেছ কি জন্যে? এমন আর সহজে কোথাও পাবে? তোমরা আমার আপনার, তাই তোমাদের বলছি। কই আর কাউকে তো বলতে যাই না। তোমাদের ভালর জন্য বলছি, নইলে আমার লাভ কি? বার বার এই সব বলি, যাতে তোমাদের defect-গুলির প্রতি নজর পড়ে।"

আজ বাবা অন্ন গ্রহণ করেন নাই, কারণ সকলের ধারণা যে, বিচিত্র (আশ্রমবালক) ক্ষুদি গাইয়ের পা ভেঙে দিয়েছে; যাতে বিচিত্রকে এই পাপ স্পর্শ না করে তারই জন্য বাবার এই প্রায়শ্চিত্ত। সারাদিন বাবার কি করুণ মুখখানিই না দেখা গেছে, যেন কাঁদছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বাবা সজল নয়নে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "প্রভু, ওকে এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছি। ও স্বভাবত চঞ্চল ও দুর্দান্ত। যদি অজ্ঞানবশত অসাবধানে ওর দ্বারা এই কর্ম হয়ে থাকে, তাহলে আমি শত গো-হত্যার পাপ নিতে প্রস্তুত। প্রভু, ওর গায়ে যেন বিন্দুমাত্র পাপ স্পর্শ না করে।" সকলকে বলিলেন, "আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান, আর তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তোমাদের যদি কিছু পাপ থাকে তো আমাকে দাও, বিনিময়ে আমার পুণ্য নাও, তোমাদের শত অপরাধ মাথা পেতে নিতে আমি সর্বদা প্রস্তুত। প্রভু আমার মাথায় শত বজ্রাঘাত ফেলুন, তোমাদের যেন একটুও অকল্যাণ না হয়। এই আমার তাঁর কাছে একান্ত প্রার্থনা।"

পরে বলিলেন—"তোমরা অন্যের দোষ দেখতে যাও, তোমরা নিজে কি? তোমাদের রাগ, অভিমান, দ্বেষ পদে পদে। আমি তোমাদের গুরুজন, যদি তোমাদের কিছু অন্যায় দেখে তিরস্কার করি, অমনি মুখখানা ভার হয়ে যাবে, যেন ভারি খারাপ বলেছি। কই তোমাদের সে শ্রদ্ধা ধৈর্য বিশ্বাস? কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি সামান্য রিপু কটাকে যদি দমন করতে না পারলে, তাহলে আর সাধু হতে এসে হলো কি?

৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, ২০ ভাদ্র ১৩৩৬, বৃহস্পতিবার

সান্ধ্য ভজনের পর বাবাকে প্রণাম করা হইলে একজন কর্মীকে বাতাস করিতে আদেশ করিলেন। বাতাস করিবার সময়ে তাহাকে বলিলেন, "কাল ভেবেছিলাম, তোমাকে নির্জনে কিছু বলব। দেখ, ক্রোধ একেবারে ত্যাগ করে ফেল। মাটির মানুষ হয়ে যাও। ক্রোধকে পায়ে দলে ফেল। তোমরা সাধু হতে এসেছ। এখানে এমন কিছু নেই যাতে তোমাদের চিত্তচাঞ্চল্য হতে পারে। একেবারে 'অক্রোধ পরমানন্দ' হয়ে যাও দেখি।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর আমাদের মধ্যে কেউ কোন দিন রেগেছে বলে আমার মনে হয় না। আগে নিরঞ্জন মহারাজ মাঝে মাঝে রেগে যেতেন বটে, আবার তখুনি জল হয়ে যেতেন। কি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, আর সেবা করতেন। তাঁর ভেতর অনন্ত গুণ ছিল। তা না হলে ঠাকুর কি অত ভালবাসতেন।

"মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন—'তোদের মন না ছটাক? মন কেমন ভারি গম্ভীর, আর ছটাক—ছট্ ছট্ ছটাক।' স্বামীজী মহাপুরুষের এই কথা শুনে বড়ই আনন্দিত হতেন; বলতেন, 'দাদা কি সুন্দর বলেছেন।'

"মনটাকে সমুদ্র কি হ্রদের মত করে ফেল। নচিকেতার মন কত বড় ছিল। যমরাজ কত প্রলোভন দেখালেন, কত ভোগ-ঐশ্বর্য—কিন্তু কিছুতেই তাঁকে বিচলিত করতে পারলেন না। আত্মজ্ঞান লাভ ছাড়া অন্য কিছুই তিনি প্রার্থনা করলেন না।

"আমাদের মধ্যে স্বামীজীর তুলনা ছিল না। তিনি 'অক্রোধ পরমানন্দ' ছিলেন। রাজপুতানায় গেছি, সেখানে নাপিত আমায় কামাচ্ছে আর বলছে—'মহারাজ আপনাদের স্বামীজীর তুলনা নেই। আমরা মূর্খ, তাঁর পাণ্ডিত্যের বিষয় কি বুঝব? কিন্তু অমন ধৈর্য ও ক্রোধ-সংবরণ করার ক্ষমতা কারও দেখিনি। পণ্ডিতেরা তাঁকে বিচারে পরাস্ত করতে এসেছে, অপমানসূচক উত্তর দিচ্ছে, আর তিনি মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। শেষে যারা তাঁর নিন্দা করছিল, তারাই তাঁর গোলাম হয়ে গেল।'

"উত্তরকাশীতে এক পীড়িত হিন্দুস্থানী সাধুকে পথ থেকে তুলে কাণ্ডীতে করে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। ধরমশালার সাধুরা আমাকে একজন পাহাড়ী মনে করে গালাগাল করতে থাকে—তাদের অসুবিধা হবে বলে। রুগ্ন সাধুটিকে ধরমশালার এক কোণে শুইয়ে নিজে বেরিয়ে এসে একটা গাছের তলায় ময়লা জায়গায় রাত কাটাই। পরদিন সকালে ঐ সাধুরা আমার কাছে এসে হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও বলে, 'মহারাজ কাল আপনাকে আমরা একজন সামান্য পাহাড়ী মনে করে অযথা গালাগাল দিয়েছি, আমরা তার জন্য অনুতপ্ত। আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন, মহারাজ। আপ্ পরমহংস হৈঁ!'

"আমি ছেলেবেলা প্রার্থনা করতাম—ভগবান আমার অদৃষ্টে অনন্ত দুঃখ কষ্ট দিন, নিজের দুঃখ কষ্ট ছাড়া অন্যের দুঃখ কষ্টটা নিতে চাইতাম। ১৫/১৬ বছর বয়স থেকে ৫/৬ বছর হিমালয়ে অনেক বিপদের মধ্যে কাটিয়েছি; তিব্বতে আমার প্রতি কি অত্যাচারই হয়েছে! তারপর মহুলায় সে-ও চরম।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর আমাদের দিনগুলো কিভাবে যেত তার হুঁশ থাকতো না। ধ্যান হচ্ছে, ভজন হচ্ছে, তারপর স্বামীজী কীর্তন ধরলেন। আর আমাদের মধ্যে নৃত্য, অশ্রু,

পুলক, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হতো। রাত্রে শ্মশানে ধ্যান জপ করতে করতে কত রাতই না কেটে গেছে! কোথায় তখন কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অভিমান!

"যখন তোমার কোন কষ্ট হবে, তখন আমাকে জানাবে। কিছু গোপন করতে চেষ্টা করবে না। দোষ ত্রুটিও স্বীকার করবে। এরূপ না করলে স্বামীজী ভীষণ চটে যেতেন।

"যেবার দার্জিলিঙ থেকে প্রথম অনাথ বালকদের আনি, সেবার গাড়ি ছাড়বার সময় দুটি ছেলে উঠে বলে—'আমরা অনাথ, আপনার সঙ্গে যাবো।' শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে জানতে পারি যে এরা অনাথ নয়। তখনই ফেরত পাঠিয়ে দিই।

"দার্জিলিঙে থাকতে দার্জিলিঙ ও ঘুমের মাঝামাঝি Wilki Hall নামে বাড়িতে Miss Muller-এর কাছে ছিলাম। দার্জিলিঙের Govt. Pleader, M. N. Banerjee কয়েকটি পাহাড়ী ছেলে দেন, অনাথ আশ্রমের জন্য।

"কলকাতায় মায়ের বাড়িতে পৌঁছেই দেখি সামনে স্বামী সদানন্দ (স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য) দাঁড়িয়ে, স্বামীজীর নামে একটি টেলিগ্রাম হাতে, তাতে লেখা ছিল—'যে ছেলে দুটি গাড়িতে উঠেছিল তাদের পিতামাতা তাদের জন্য Govt. Pleader-এর কাছে কাঁদছে। তোমাদের লোক তাদের নিয়ে গেছে... ইত্যাদি।' আমি বললাম, তাদের শিলিগুড়ি থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। স্বামীজী এসেই বললেন—'অনাথ বালকের জন্য লাল গড়িয়ে পড়ছে।' প্রথমে কিছুই বললাম না, পরে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে বলাতে তিনি বললেন, 'এত ব্যাপার হয়ে গেছে? এবার যখন কোথাও যাবে, সঙ্গে চিঠিপত্র (credentials) নিয়ে যাবে।'

"আশ্রমে যতীন ব্রহ্মচারী দুধের প্যান পুড়িয়ে ফেলে কি রকম কেঁদেছিল! কোন অপরাধ করলে frankly বলবে, গোপন করার চেষ্টা করবে না। এ রকম boldness, frankness আমি পছন্দ করি।

"এমন ঘটনা ঘটবে, যাতে ভীষণ রাগ হবার কথা, কিন্তু তবুও রাগবে না। ছোট ছেলেরাও যদি কিছু অন্যায় বলে তবুও রেগ না। তারা দেখবে তুমি মাটির মানুষ।

"গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের কথা পড়েছ। আর ঠাকুর আমাদের কি সুন্দর উপদেশ দিতেন, 'শ, ষ, স' অর্থাৎ সহ্য কর; যত সহ্য করবে, ততই তোমার শক্তি বাড়বে, এমন উপদেশ এ পর্যন্ত কেউই দেন নি। তিনি আরো বলতেন, গীতা মানে কি জানিস? ত্যাগী, ত্যাগী, ত্যাগী। অর্থাৎ ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।

"আমি কোন কথা বললে সমস্ত মন দিয়ে তা শুনবে, আর consider করবে। জানি জানি ভাল নয়।"

৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, ২১ ভাদ্র ১৩৩৬

আজ সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগরের Livestock officer শ্রীঅমূল্যবাবু পলাশী হইতে আশ্রমের

জনৈক ব্রহ্মচারীর সহিত আসিলেন। বাবা তাঁহার সহিত কুঠিয়াল সাহেবদের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমার ধারণা ছিল যে, এরা সেই নীলকর সাহেবদের মতো, কিন্তু তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে জেনেছি, ঐ অপবাদ ওদের সম্বন্ধে খাটে না। ওদের মধ্যে অনেকেই খুব ভাল লোক ছিলেন। কেয়ো (Keogh) সাহেব রোমান ক্যাথলিক হয়েও আশ্রমে চাঁদা দিতেন এবং বলতেন, 'স্বামীজী আপনাকে আমি চাঁদা দিই, এটা আমার principle-এর বিরুদ্ধে। কিন্তু কি করি, আপনি লোকের এত উপকার করেন, তাই আপনাকে এড়াতে পারি না।' স্বামীজী এই কথা শুনে বলেন—'ভাই, তুমি খুব বাহাদুর; Roman Catholic-রা পাদ্রীকেও চাঁদা দেয় না আর তুমি চাঁদা বাগিয়েছ।' "

সাহেবরা মনকরায় (আশ্রমের নিকট একটি স্থান) কিরূপ mock fight (মেকি যুদ্ধ) করিত তাহা বলিয়া বাবা বলিলেন, "সাহেবরাই তো এ আশ্রমের ভিত্তিস্বরূপ, আমার উপর দিয়ে যখন ভয়ানক ঝড় বইছিল, যখন মহুলার ব্রাহ্মণরা আমাকে উচ্ছেদ করার জন্য কৃতসঙ্কল্প, তখন এই কেয়ো সাহেব বহরমপুর Grant Hall-এ আমার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। আমায় বলতেন, 'স্বামীজী তুমি ভাবছ কেন? We are always on your side. Thrash them down. Never yield. (আমরা সর্বদা তোমার পক্ষে। ওদের দাবিয়ে দাও। হার মেন না)'।"

৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, ২২ ভাদ্র ১৩৩৬, শনিবার

আজ রাত্রে জনৈক ব্রহ্মচারীর ভগবানগোলা যাত্রার কিছু পূর্বে বাবা বলিলেন, "ভুলো (কুকুর) কি noble দেখ! আজ সারা দিন কিছু খেতে দিইনি, তবুও একটু কেঁউ কেঁউ করছে না, কি সামনে গেলে কামড়াতে আসছে না। আর তোমাদের? এক বেলা খেতে না পেলে মুখ ভার হয়ে যায়। কুকুরের মতো faithful জন্তু আর নেই।

"স্বামীজী শেষটায় মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে হতাশ হয়ে জীবজন্তু নিয়ে থাকতেন। তাঁর অনেক হাঁস, পায়রা, কুকুর, বেড়াল, মেড়া ইত্যাদি ছিল। দস্তুর মতো একটা চিড়িয়াখানা তৈরি করেছিলেন। নিজের সেবার টাকা থেকে তাদের জন্য ১০০ টাকা খরচ করতেন। তাঁর হাঁসের মধ্যে চীনে, বম্বেটে, পাতিহাঁসও ছিল। কুকুরের নাম Mary, Tiger, মেড়ার নাম মটরু, চীনে হাঁসের নাম যশোমতী রেখেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্বামীজীর দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পশু পাখী সব মরে যায়। তিনি যাকে যা দিয়ে গিয়েছিলেন, তার একটিও বেশি দিন বাঁচেনি। ভক্তেরা বলেন, 'তারা সব উদ্ধার হয়ে গেল।' "

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, ১লা আশ্বিন ১৩৩৬

সকালে চা পানের সময় বাবা জনৈক সেবককে বলিলেন, "কই, আমাকে আজ বিস্কুট খেতে হবে, কেউ বললে না তো? কাল থেকে উপবাসী। দেখ এটা একটা বেশি কথা নয়, আমি

ইচ্ছা করলেই চেয়ে নিতে পারতাম। এ সমস্ত feelings-এর কথা, হৃদয়ের খেলা। আমার কাছে থেকে যদি এসব না হয় তো কোথাও হবে না। আমার চেয়ে feelings-এর পরিচয় কেউই দিতে পারবে না।

"আমার হৃদয় পাষাণের মতো ছিল। তিন বোনের পর আমার জন্ম। কাজেই মা-বাপের কি রকম আদরের ধন ছিলাম—বুঝতেই পারছ। ছেলেবেলায় মা আদর করে সোনার হার পরিয়ে দিয়েছিলেন—আর আমি তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। সাধু হব বলেই জন্মেছি—এ সংস্কার আমার বাল্যকাল থেকেই ছিল। তারপর হিমালয়ে যাই। আমার প্রাণ বড় কঠিন ছিল। তাই মনে হয় হিমালয় পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে তবে আমার হৃদয় ভাঙে। হিমালয় না গেলে আমার কঠিন প্রাণ নরম হতো না। আর রাজপুতানায় পতিত অন্ত্যজ জাতিদের জন্য কেঁদে উঠত না। সেখান থেকে তো আমিই প্রথম স্বামীজীকে লিখি —'My nation first, myself second. I for others.'

"তখন (১৮৯৪ সাল) আমার মনের ভাব এই ছিল—স্বামীজী যদি আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত না করেন, তা হলে এদেশে থাকব না, Central Asia চলে যাব। স্বামীজী আমাকে উৎসাহিত করলেন ও আর সব গুরুভাইদেরও বুঝাতে লাগলেন।

"স্বামীজী সমুদ্র। যখন তিনি আমেরিকায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—'ভারত রুটি চায়, ধর্ম চায় না', তখন সেই দেশপ্রেমের ঢেউ আমায় যেভাবে আঘাত করেছিল এমন আর কাউকে করেনি।

"স্বামীজী যদি আমার চিঠির উত্তরে লিখতেন, 'পরের দরদে তোর হিয়ে বিদরিয়ে যায় কেন? তুই তোর আত্মার স্মরণ মনন নিয়ে থাক, ধ্যান জপ কর। তা হলেই তোর হলো।' তাহলে আমি জন্মের মত এদেশ ছেড়ে Central Asia চলে যেতাম। আমার তখন যেরকম temperament, আমি কিছুতেই এ সহ্য করতে পারতাম না। দেখ, সমস্ত হৃদয়ের খেলা। 'গহনা কর্মণো গতিঃ।'

"চোবেজী হিন্দুস্থানী। প্রথমে পাচক হয়ে আসে, তারপর সাধু হয়ে গেল। সুরেশ্বরানন্দের সঙ্গে প্রথমে বনত না—বলত কায়স্থ সাধুর সকড়ি নেব না। পরে সেই লোক আশ্রমের ছেলেদের মলমূত্র দু হাতে সাফ করেছে। রাস্তা দিয়ে অভুক্ত কেউ গেলে নিজের বাড়া ভাত খাইয়ে নিজে ফেন খেয়ে দিন কাটিয়ে দিয়েছে, এমন এক দিন নয়—আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিত না। বেচারা শেষে যক্ষ্মারোগে মারা গেল। এরূপ আর কে করবে?

"আজকালকার ছেলেদের কাছ থেকে এরূপ আশা করতে পারি না। স্বামীজীকে যখন ওর কথা বলি, তিনি বললেন—'ধন্য ভাই তোমার চোবেজী! তুমি এমন এক worker তৈরি করেছ যে, নিজের বাড়া ভাত অভুক্তকে দিয়ে অম্লান বদনে ফেন খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে! এ কি কম "প্রাণের" কথা। ওর মতো worker কজন আছে! তোমার কাছে থেকে ও অত বড় হয়ে গেল'।"

বাবা শেষে বলিলেন—"সাধু হতে এসেছ পারব না বললে চলবে না। তোমাদের হৃদয়ে একটু মাত্র স্পন্দন নেই—সব callous!"

১৩ মে ১৯৩০ ; ৩০ বৈশাখ ১৩৩৭, মঙ্গলবার

আজ সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর বাবাকে প্রণাম করিলে মণিদা, উদ্ধবদা, মণিচৈতন্য, বিজয়দা প্রভৃতিকে নিকটে বসিতে আজ্ঞা করিলেন ও সাধু পরমহংসদিগের কি লক্ষণ, তাঁহারা কি করেন, এই সব বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। বাবা বলিলেন—"ঠাকুরের সঙ্গ ও কৃপালাভ করে কি আমাদের দুটো শিং বা লেজ বেরিয়েছে? তা নয়, এই অনুভূতি হয়েছে যে, আমি একা নই, আমি সবার মধ্যে, একের মধ্যে এক গুণ, দশের মধ্যে আমি দশ গুণ, দশের সুখ দুঃখে আমার সুখ দুঃখ দশ গুণ।

"যদি তোমরা কোন নির্জন স্থানে গিয়ে তাঁর স্মরণ মনন কর, তাহলে এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন নেই। নিজের জপ ধ্যান নিয়ে থাকলেই যথেষ্ট। এই রকম কোন Public Institution-এ থাকলে দেখতে হবে কি করে আমি অন্যকে সুখী করতে পারি।

"একবার আলমবাজার মঠে রয়েছি। সকলেই কৌপীন পরা, ভীষণ গরমে আমার ঘুম হচ্ছে না। এদিকে যে গুরুভাইদের ও অন্যান্য সাধুদের সবে ঘুম ধরেছে, তাদেরও ভাল ঘুম হচ্ছে না। তখন কি আর স্থির থাকতে পারি? আলমবাজার মঠে একখানা বড় পাখা ছিল। তাই দিয়ে সকলকে বাতাস করতে লাগলাম। সাধুরা বেশ ঘুমুতে লাগল। তাতেই আমার শরীর যে কি ঠাণ্ডা ও মন কি তৃপ্ত হয়েছিল তা আর কি বলব। সেদিন আমার অনুভূতি হয়েছিল যে দশের সুখ আমার সুখ।

"এই কেদারমাটিতে শুধু চা খেয়ে উৎসবের জন্য খেটেছি। উৎসবশেষে দরিদ্রনারায়ণ সেবার পর প্রসাদী খিচুড়ি দু-এক দানা মুখে দিয়ে আমার পেট ভরে গিছল।"

১৬ই এপ্রিল ১৯৩০; ৩রা বৈশাখ ১৩৩৭, বুধবার

ভগবানগোলা হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যায় বাবাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি বলিলেন, "দেখ, সোনা রাত্রে কাশে, আর আমার যে কি কষ্ট হয় কি করে বুঝাব? আমার বুকের ভেতরটা কি রকম করে ওঠে। দুপুরবেলা (আশ্রমের গোয়ালে) গরুগুলো বাঁ বাঁ করে উঠলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ি। আমার মতো feeling তোমাদের কারো হবে না, তা না হলে কি প্রভু আমাকে দিয়ে এই কাজ করাতেন।

তারপর কর্মপ্রসঙ্গে বলিলেন, "কর্মযোগ অতি কঠিন, নিঃস্বার্থ কর্ম কি চারটিখানি কথা?" আশ্রমের ভূতপূর্ব কর্মী কার্তিকবাবু ও গঙ্গা চৈতন্যের কথা পাড়িয়া বলিলেন, "যারা নিঃস্বার্থ

কর্ম করে তারা বসে থাকতে পারে না। যারা গা আড়াল দিয়ে থাকতে চায় তাদের কিছু হয় না। লোক ঠকিয়ে খাওয়া ছাড়া আর কি হবে!

"ঠাকুর এসে ধর্মের বন্যা বইয়ে গেছেন। বন্যায় বাহাদুরি কাঠও ভেসে আসে, জঙ্গলও ভেসে আসে। সবই কি বাহাদুরি কাঠ—ভেসে আসবে?"

১৭ এপ্রিল ১৯৩০, ৪ বৈশাখ ১৩৩৭, বৃহস্পতিবার

বাবা বলিলেন, "যতই উৎসব আসছে, ততই আমার ভেতরটা কি রকম করে উঠছে। দিন দিন শরীর অথর্ব হয়ে পড়ছে। গত বৎসর আমি যা ছিলাম, এ বৎসর আমি তা নেই। ঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে। প্রভু আমার সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। আমি এক গুণ চেয়েছি, তিনি বিশ গুণ দিয়েছেন। ৩ মাস relief করতে চেয়েছিলাম, আজ ৩৩ বছর ধরে গলা টিপে—প্রভু আমাকে এই কাজ করাচ্ছেন। তিনি যদি আমাকে এই কাজ না করাতেন—তাহলে আজ এই revolution হতো না।"

তারপর ভাণ্ডারঘর গোছানোর নির্দেশ ও উপদেশ প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন, "আমি একজন পাকা গিন্নি, father and mother combined (একাধারে পিতা ও মাতা)।

"আমরা তাঁকে ছুঁয়ে সোনা হয়ে গেছি। আমাদের চেয়ে তোমাদের আপনার আর কে আছে? শুধু পেটে ধরলেই কি মা হয়? বাপ-মাকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম ; আমাদের এত feelings (অসহায় মানুষের জন্য তীব্র অনুভূতি) এল কোথা থেকে?

"আমাকে দেখেই তোমরা এসেছ। আর আমার কাছ থেকে গা আড়াল দিয়ে থাকতে চাও যেখানে ফষ্টি-নষ্টি হচ্ছে সেখানে। আমার কাছে বসবে। আমার আর কতদিন!" জনৈক সেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন —"আমার সেবা তোমার সকল কাজের চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় মনে করবে—নচেৎ বিসমিল্লায় গলদ।"

১৯ এপ্রিল ১৯৩০, ৬ বৈশাখ ১৩৩৭, শনিবার

বৈকালে উপস্থিত দুইজন ব্রহ্মচারীকে বাবা বলিতেছিলেন—"দেখ দুপুরবেলা চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। কে যেন বারে বারে আমাকে খুঁচিয়ে তুলে দিল। ঠাকুরের কাজ —শরীর অথর্ব হলেও কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? আমরা সে তন্ত্রের লোক নই, work is worship, even unto death। আমাদের এই ideal। কর্মযোগ বড় শক্ত! আমাদের কাছে থেকেও যদি না শেখ তো কবে শিখবে? আমরা আর কদিন! ideal দেখে নাও। তোমরা ব্রহ্মচারী, কর্মঠ সহিষ্ণু হতে হবে।

"আমরা সাক্ষাৎ ঠাকুরের সন্তান। তাঁকে দেখেছি—স্পর্শ করেছি—তাঁর প্রসাদ খেয়েছি। তোমাদের ঘুমটা আমাকে দাও—তার বিনিময়ে তাঁর কাছে যা পেয়েছি দিচ্ছি।"

সন্ধ্যার পর তাঁকে প্রণাম করিলে বাবা কাছে বসিতে বলিয়া বলিলেন, "আজ দুপুরবেলা আমার মনে এই হচ্ছিল যে, দেহরক্ষা করি—না হলে কোন নিরিবিলি জায়গায় চলে যাই। এই সব সবুজ তরুণের দল আমাদের বুঝতে পারবে না। আমাদের কথা বোঝা শক্ত। নির্জনে এই সব চিন্তা করবে ; ঝট করে উত্তর দিও না। অনেক ভেবে চিন্তে আমরা কিছু বলে থাকি। তোমাদের কোন মতে বোঝাতে পারলাম না।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরাগ, ত্যাগ, তপস্যা ভালবাসার লক্ষাংশের একাংশও আমাদের কারো নেই। তিনি ভগবান, তাঁর কথা আলাদা। তিনি মোটামুটি যেসব কথা বলতেন তা-ও এত করে বলার পর তোমরা পালন করতে চাও না। তিনি বলতেন, 'দাঁড়িয়ে জল খাবে না, গালে হাত দিয়ে বসবে না, হাত পা নাড়াবে না, দিনের বেলা ঘুমুবে না। ভোর ভোর উঠে গুরুমূর্তি স্মরণ মনন করবে।'

"তোমরা কথায় কথায় temper lose করে ফেল। কি আর বলব? শরীর ছাড়বার আগে আরো কত শুনবো। তোমরা আমায় ভালবাস। মনে করি সব overlook করব, কিন্তু তোমাদের ভালবাসি বলেই, না বলে থাকতে পারি না। কেষ্টা সনন্দকে কেন এত ভালবাসি? এরা বালক, পাপ-পুণ্যের কোন ধার ধারে না—নেংটা বেলায় ভগবানের দরবারে—এদের সাত খুন মাপ। ১২ বছর পর্যন্ত এদের কোন পাপ নেই। তা বলে তুমি যদি একটি ফড়িং মারো, তাহলে তোমার দোষ হবে, কারণ তোমার বুদ্ধি হয়েছে। তোমার বেলায় আলাদা বিচার।

"এরা আমাকে কত ভালবাসে, সেবা করে, তোমরাও প্রভুর কাজ, ভগবানের কাজ দিল দিয়ে করবে।"

২০ এপ্রিল ১৯৩০, ৭ বৈশাখ ১৩৩৭, রবিবার

সান্ধ্যভজনান্তে বাবাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। উৎসবের আয়োজন সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠিল। বাবা জনৈক ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "মিনমিনে পিনপিনে স্বভাব ছেড়ে দাও। প্রভুর কাজে অগ্রসর হও। মাথা ধরে ছিল, গরমে ছটফট করেছি, তা বলে কি বসে থাকতে পারি! আমাদের principle হচ্ছে work even unto death —তবেই না work is worship। প্রভুর কাজ—হাতে কাজ করছি—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মরণ মনন করাও চলেছে—এমন করতে করতে মরলেও সে সুখের মরণ। জীবনের অর্ধেকটা তো এখানেই কাটিয়ে দিলাম।"

নানান কথার পর তাঁর বই পড়ার কথায় বলিলেন, "উদয়পুরে রাজার লাইব্রেরিতে ও নাথদ্বারে শালগ্রাম ব্যাসজীর লাইব্রেরিতে কত বই পড়েছি—Sir Alexander

Cunningham-এর Historical works, Theodore parker-এর works, Buddhistic literature যা পেয়েছি প্রায় সব, তাছাড়া Megasthenes, Fa-hien, Hiuen-Tsang ইত্যাদির সম্বন্ধে এবং Sir Monier-Williams-এর গ্রন্থাবলী ও আরও অনেক গ্রন্থ পড়ি।"

এই সব বলিয়া বলিলেন, "শিখতে ইচ্ছা করলে কতদিন লাগে?

"জয়পুরে ১৮৯৬ সালে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বলেন—'ভাই, তোমাকে সেই তিব্বত-ফেরৎ বরফানী বাবারূপে দেখেছিলাম—ভগবানের স্মরণ মনন ও কঠোর তপস্যার প্রতিমূর্তি। আর এই পাঁচ বছরের মধ্যে তোমার কি পরিবর্তন হয়েছে! এখন তুমি একজন patriot, statesman, philanthropist ; কি অদ্ভুত পরিবর্তন না হয়েছে!' আমি বললাম—'তিব্বতে থাকার সময় বাংলাভাষা একপ্রকার ভুলে গেছলাম। বাংলা বলতে দু-এক মিনিট ভেবে নিতে হতো। স্বামীজী 'নর' শব্দের রূপ করতে বলেন। ভুল হয়েছিল। তারপর কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি পড়েছি। সমস্ত অমরকোষ মুখস্থ করেছি। এটাওয়ায় মহাভারত পড়ি। ইন্দোরে একাসনে বসে একুশ দিনে সমগ্র রামায়ণ গান করে পড়ি।' "

১৩ মে ১৯৩০, ৩০ বৈশাখ ১৩৩৭

এইদিন বাবা চোবেজী প্রসঙ্গে আরও বলিলেন, "আমি মুসাহারদের বসন্তরোগাক্রান্ত একটি অনাথ ছেলেকে এনে যখন সেবা করতে লাগলাম, তখন চোবেজী বলছে—'স্বামীজী এ কি আপনার শোভা পায়?' আমি তখন রাস্তার নোংরা ছেলে দেখতে পেলে তাকে ধরে এনে, তেল মাখিয়ে, গরম জল [আর] সাবান দিয়ে স্নান করাতাম আর 'সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ...' এই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতাম। সচ্চিদানন্দ স্বামী তাই দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ও 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ঐ-সম্বন্ধে article (প্রবন্ধ) লিখেছিলেন। কিছুদিনের পর চোবেজী দুহাত দিয়ে এই সব ছেলেদের বমি পরিষ্কার করেছিল।

"স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন এখানে ছিলেন, সেই সময়ে চোবেজীকে সন্ধ্যা গায়ত্রী শিখাবার জন্য বই কিনে দিয়েছিলেন। দু-একদিন পড়েছিল; তারপর [আমাকে] বললে, 'দেখুন স্বামীজী! আপনি, ত্রিগুণাতীত স্বামী—সকলেই পণ্ডিত। সবাই পণ্ডিত হলে শোভা পাবে না। আমি একটা মুখ্যু রয়ে যাই।' স্বামী ত্রিগুণাতীত এই কথা শুনে ভারি মুগ্ধ হয়েছিলেন ও আমায় বলেছিলেন, 'চোবেজী তোর একটা acquisition, তোর প্রভাবে তার কি পরিবর্তনটাই না হয়ে গেল! ও মহাপুরুষ! কি হৃদয়! দশজন B.A. M.A. পাশ কর্মীর চেয়েও ঢের বেশি!'

"পল ডয়সন (Paul Deussen), জার্মানীর একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক, একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন, 'আমি বেদান্তের পক্ষপাতী এই

জন্যে যে—বাইবেল বলে, 'Love thy neighbour', আর বেদান্ত বলে, 'Love thy self' —

'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।।'

* * *

স্বামীজীর দেহরক্ষার পর খোকা মহারাজ তাঁর কয়েকটি পশুপক্ষী বাবাকে দিয়েছিলেন। একটি বেড়াল স্বামীজীর পায়রাটিকে লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) সেই সময়ে আশ্রমে ছিলেন। তিনি বেড়ালটাকে এমন ঘুষি মেরেছিলেন যে, তাঁর হাত থেঁতলে গিয়েছিল। বাবা তাঁকে কর্ণের সঙ্গে তুলনা করেন।

(উদ্বোধন ঃ ৮১ বর্ষ ৬, ৭, ৮, ১১, ও ৮২ বর্ষ ১, ৩, ৪ সংখ্যা)

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতিকথা

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

গঙ্গাধর মহারাজের ছিল বালকস্বভাব। আমরা তাঁর সঙ্গে খেলার সাথীর মতো মিশতাম। মহাপুরুষরা লোকের সঙ্গে ব্যবহারের সময় তাঁদের নিজের ভাবটা অন্যের ভিতর জাগিয়ে তুলতে পারেন। শুকদেব আর ব্যাসদেবের কাহিনীতে এটি বেশ বোঝা যায়।

এক জায়গায় কতকগুলি মেয়ে স্নান করছে। এমন সময় শুকদেব—যিনি পূর্ণ যুবা—একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় তাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তখন মেয়েরা জল থেকে উঠে ওপরে এসে শুকদেবকে দেখার জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়াল, কোন সঙ্কোচ বোধ করল না। কিছুক্ষণ পরেই শুকদেবের পিতা ব্যাসদেব সেদিকে আসছেন। দূর থেকে তাঁকে দেখে মেয়েরা খুব লজ্জিত হয়ে কাপড় চোপড় পরল। ব্যাসদেব যখন তাদের কাছে এলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমার ছেলে যুবক; তাকে দেখে তোমরা লজ্জিত হলে না, আর আমার মতো এই বৃদ্ধকে দেখে তোমরা এত লজ্জিত হলে কেন?" মেয়েরা বলল, "আপনার পুত্রের দেহ-জ্ঞান নেই, তাই আমাদের মন থেকেও দেহ-জ্ঞান চলে গিয়েছিল। কিন্তু আপনার দেহ-জ্ঞান আছে বলে আমরা এত সঙ্কুচিত হয়েছি।"

শ্রীশ্রীমা যখন জয়রামবাটী থেকে আসছেন তখন একবার ডাকাতের হাতে পড়েন। মা তাকে এমনভাবে 'বাবা' বলে ডাকলেন যে, সেই ডাকাতের মধ্যে পিতৃস্নেহ জাগিয়ে তুললেন। মহাপুরুষরা এইভাবে নিজেদের ভাব অন্যের মধ্যে জাগিয়ে দেন।

গঙ্গাধর মহারাজ একদিন উদ্বোধনে এসেছেন। সবাই তাঁকে ধরে বসল, "মহারাজ, আমাদের রসগোল্লা খাওয়ান।" উনি বললেন, "আমার কাছে টাকা পয়সা কোথায়? তোমাদের কি করে রসগোল্লা খাওয়াব?" তখন একজন তাঁর ট্যাঁকে টাকা আছে দেখে সেখানে হাত দিয়েছে। তাতে উনি সেই ছেলেটিকে টেনে নিয়ে পাশের ঘরে শরৎ মহারাজের সামনে গিয়ে বললেন, "দেখ দেখি, কি রকম ছেলে তৈরি করেছ—ওরা জোর-জবরদস্তি করে আমার কাছে রসগোল্লা খেতে চায়!" শরৎ মহারাজ উত্তরে বললেন, "ওরা যখন খেতে চাচ্ছে, বেশ তো, ওদের খাওয়াও না!" তখন গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, "বাঃ! তুমিও দেখছি ওদের কথায় সায় দিলে!" আসলে তিনি খাওয়াবার জন্যই টাকা নিয়ে এসেছিলেন। শুধু আমাদের সঙ্গে একটু রগড় করার জন্য ওরকম করছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে এভাবে আচরণ করায় তিনি বেশ আনন্দ পেয়েছিলেন।

স্বামীজীর প্রতি তাঁর কি রকম শ্রদ্ধাভক্তি ছিল তার উদাহরণস্বরূপ দু-একটি ঘটনা বলছি। আমি তখন অদ্বৈত আশ্রমে থাকি। গঙ্গাধর মহারাজ কলকাতার পুঁটিয়ার রানীর বাড়িতে ছিলেন; তাঁর নাতিরা শরৎ মহারাজের শিষ্য। সেই সময় একদিন জনৈক ভক্ত, যিনি অদ্বৈত আশ্রমে দু-এক দিন ছিলেন, খাবার সময় সাধুদের মিষ্টি (রসগোল্লা) ও ডাব খাইয়েছিলেন—সামান্য খরচ করে। আমাদের খাওয়ার পরেই উদ্বোধন থেকে একজন সাধু অদ্বৈত আশ্রমে গিয়ে হাজির। তিনিও মিষ্টি এবং ডাব খেলেন। পরে তিনি গঙ্গাধর মহারাজকে বলেছেন, "মহারাজ! আজ অদ্বৈত আশ্রমে প্রকাণ্ড ভাণ্ডারা হয়ে গেল। রসগোল্লার গড়াগড়ি, আর ডাবের তো কথাই নেই।" এইটি বলে বললেন, "মহারাজ! আপনি এখানে থাকতে অদ্বৈত আশ্রমে এত বড় ভাণ্ডারা হলো, আর আপনাকে নিমন্ত্রণ করল না?" শুনে বালকের মতো উনিও বললেন, "তাই তো, আমি এখানে আছি, প্রভু আমাকে নেমন্তন্ন করল না? দাঁড়াও, ও আসুক!" সাধুটি ফিরে এসে আমাকে বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে মহারাজের কাছে খুব লাগিয়েছি। এবার গেলে দেখবে মজা।"

কিছুদিন বাদে আমি গঙ্গাধর মহারাজের কাছে গেছি। আমি প্রণাম করে বসতেই পুঁটিয়ার রানীর নাতিরা এবং দু-একজন সাধু যাঁরা সেখানে ছিলেন (তার মধ্যে যিনি আমার বিরুদ্ধে লাগিয়েছিলেন, তিনিও ছিলেন), সবাই সেখানে বসলেন, কি হয় দেখবার জন্য।

গঙ্গাধর মহারাজ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন, কোন কথাই বললেন না। আমিও চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর উনি গম্ভীরভাবে তর্জনী নেড়ে আমাকে বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার আছে!"

আমি— আমারও আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলবার আছে।

গঙ্গাধর মহারাজ— তোমার কি বলবার আছে আমার বিরুদ্ধে?

আমি— আপনার কি বলবার আছে, আগে বলুন। আপনার চার্জ-শীট দেখে তারপর আমার যা বলবার আছে বলব।

তখন উনি ছেলেমানুষের মতো বললেন, "জজ ঠিক কর তাহলে।"

আমি— আপনিই জজ হবেন।

গঙ্গাধর মহারাজ— আমি তোমায় accuse (আসামী) করে নিজেই জজ হব?

আমি— আপনার ওপরই আমার বিশ্বাস আছে, এদের কারো ওপর নেই।

গঙ্গাধর মহারাজ— আচ্ছা, তাই হবে।

তারপর বললেন, "তোমার ওখানে অতবড় ভাণ্ডারা হয়ে গেল, আর আমি এখানে আছি—আমাকে বললে না তুমি!" তখন আমি বললাম, "সেরকম ভাণ্ডারা কিছু হয়নি,

মহারাজ!” তারপর আসল ব্যাপারটা সব খুলে বললাম। শেষে বললাম, “এই সাধুটি আপনার কাছে এসে শুধু শুধু এটা লাগিয়েছে; আর আপনিও কি হয়েছে আমাকে তা না জিজ্ঞেস করে আমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্বামীজী বলেছেন, 'যদি কেউ দোষ করে থাকে, তাকে ডেকে বলবে; অপরের কাছে কিছু বলবে না।' আপনি কিন্তু এর অন্যরকম করলেন।” যেই স্বামীজীর কথা বলা, তক্ষুণি উনি বললেন, “তুমি ঠিক বলেছ। আমার ভুল হয়েছে।”

এই কথা বলেই, যে সাধুটি লাগিয়েছিলেন তাকে দেখিয়ে বললেন, “এই ব্যাটাই যত গোলমাল করেছে।” তখন সবাই হাসতে আরম্ভ করল।

এর ভেতর দুটো জিনিস দেখবার আছে। একটি হলো, স্বামীজীর প্রতি কি রকম শ্রদ্ধা-ভক্তি। অন্যটি হলো, তাঁর মহাপুরুষের লক্ষণ—আমার মতো লোকের কাছে তাঁর ভুল স্বীকার করা। আমরা হলে তো এভাবে স্বীকার করতাম না।

আমি তখন বললাম, “মহারাজ, আমি মোকদ্দমায় জিতেছি। এরপর এখন আপনার কাছে damages (ক্ষতিপূরণ) আদায় করব।”

গঙ্গাধর মহারাজ— বেশ, কি চাও বল।

আমি— আপনাকে একদিন অদ্বৈত আশ্রমে যেতে হবে। ওখানে দুপুর বেলা খাবেন, বিশ্রাম করবেন, বিকেল চারটেয় চা খেয়ে সন্ধ্যার আগে ফিরে আসবেন।

গঙ্গাধর মহারাজ— বেশ তাই হবে।

পরে একদিন সকালে গিয়ে থাকলেন। কিন্তু দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরই বললেন, “এবার যাব।” তখন গরমের দিন। এখনকার মতো তখন ট্যাক্সি ছিল না। ঘোড়ার গাড়িতে তাঁকে যেতে হতো—ওয়েলিংটন লেন থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত। সেই রোদে এভাবে যেতে ওঁর কষ্ট হবে দেখে আমি বললাম, “কথা ছিল, বিকেল চারটের সময় চা খেয়ে সন্ধ্যার দিকে আপনি যাবেন। এখন তো যাওয়া হবে না!” গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, “না, না, এক্ষুণি যাব।” তখন ওঁকে আটকাবার জন্য আমি অগত্যা বললাম, “আপনি থাকুন, তাহলে আপনাকে একটা নতুন জিনিস খাওয়াব, যা আপনি কোনদিন খাননি।”

গঙ্গাধর মহারাজ— তুমি আর আমাকে নতুন জিনিস কি খাওয়াবে? আমি কত রাজাদের বাড়িতে, ধনীদের বাড়িতে ছিলাম, আমি কত দেশ ঘুরেছি, কত রকমের জিনিস খেয়েছি। তুমি আমাকে নতুন জিনিস কি খাওয়াবে?

আমি— আপনি যাই বলুন, আমি যে জিনিস আপনাকে খাওয়াব বললাম, সে জিনিস আপনি কোনদিন খাননি।

গঙ্গাধর মহারাজ— আচ্ছা, দেখি তুমি কি খাওয়াও। তাহলে রইলাম।

আমি আশ্বস্ত হলাম—যে ভাবেই হোক, এই গরমের মধ্যে তাঁর যাওয়াটা তো বন্ধ করা গেল।

চারটে বাজতেই আমাকে ডেকে বললেন, "কই কি নতুন জিনিস খাওয়াবে বলেছিলে, নিয়ে এস।"

উনি শোবার পরই আমি কফি তৈরি করে বরফে রেখে দিয়েছিলাম, ঠাণ্ডা করবার জন্য। সে-সময় কলকাতায় কফি-হাউসও ছিল না, আর রেফ্রিজারেটারও ছিল না। আমি সেই ঠাণ্ডা কফি গ্লাস ভরতি করে ওঁকে দিলাম। উনি খেয়ে খুব খুশি হলেন। বললেন, "সত্যিই, এমন জিনিস কখনো খাইনি।"

আর একটি ঘটনা। সারগাছি থেকে কলকাতায় এসে গঙ্গাধর মহারাজ একবার এক ভক্তের বাড়িতে রয়েছেন। তাঁরা খুব ভাল ভাল আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো একটি ঘরে খুব যত্নের সঙ্গে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা সেখানে ওঁর কাছে গেছি। উনি ছেলেমানুষের মতো বললেন, "দেখ, এরা আমাকে কত যত্নে রেখেছে! তোমরা মঠে আমাকে এরকম রাখতে পারবে?"

আমি বললাম, "এই বাড়ির সঙ্গে মঠের তুলনা হয়? এটা একটা বড়লোকের বাড়ি, আর মঠ হলো ফকিরের জায়গা। ওখানে আমরা আপনাকে এরকম রাখব কি করে? তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে—মঠ হলো স্বামীজীর বাড়ি, স্বামীজী সেখানে থাকতেন।"

এই কথা বলতেই উনি বলে উঠলেন, "ঠিক বলেছ তুমি! কাল সকালেই মঠে যাব।" এবং সেই ভক্তকে ডেকে বললেন, "কাল সকালে মঠে যাবার ব্যবস্থা কর।"

ভক্তটি ও আমরা সবাই অবাক! ভক্ত খুব অনুরোধ করতে লাগল আরও দু-একদিন থেকে যেতে; আমরাও তাতে যোগ দিলাম; কিন্তু তিনি কোন কথা শুনলেন না, পরদিন সকালে মঠে চলে গেলেন।

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার ওপর গঙ্গাধর মহারাজের খুব টান ছিল। বাংলার মাঝে মাঝে ইংরেজী বলা পছন্দ করতেন না। অদ্বৈত আশ্রম (প্রকাশন বিভাগ) তখন কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উপর তলায় একটি ঘরে ছিল। উনি সেখানে এসে বললেন, "চল, খাদিভাণ্ডার দেখতে যাব।" খাদিভাণ্ডার তখন অ্যালবার্ট হল-এর নিচের তলায় একটি ঘরে ছিল। গেলাম তাঁর সঙ্গে। সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন। স্যার পি. সি. রায়-ও তখন সেখানে এসে হাজির। তিনি তখন কংগ্রেসের তরফ থেকে খাদির প্রচার করছিলেন। ডঃ পি. সি. রায় খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলবার সময় মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ খাদি প্রতিষ্ঠানের জিনিসগুলি দেখার সময় ডঃ রায়ের কথাও শুনছিলেন। কিছুক্ষণ এভাবে শোনার পর ডঃ রায়কে খুব বিনীতভাবে বললেন, "রায় মশায়, আপনার ভাষাটাকে একটু খদ্দর করে

ফেলুন!" ডঃ রায় একথা শুনে বিরক্ত না হয়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "স্বামীজী, আপনি যা বলছেন তা ঠিকই। আমাদের কিন্তু ছেলেদের ইংরেজীতে পড়িয়ে পড়িয়ে মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করার এই অভ্যাসটি হয়ে গেছে।"

গঙ্গাধর মহারাজ আমাদের সঙ্গে বালকের মতো মিশতেন বলেই আমরা তাঁর সঙ্গে খেলার সাথীর মতো ব্যবহার করতে পারতাম। জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব যখন পড়ে, তখন মাছেরা সেই চাঁদের প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, আর মনে করে, চাঁদও ওদের মধ্যে একজন। তারা জানে না চাঁদের বাস্তবিক স্থান কোথায়।

পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ যখন প্রথম ঠাকুরের কাছে যান তখন তিনি খুব গোঁড়া নৈষ্ঠিক (ব্রাহ্মণ সন্তান) ছিলেন। স্বপাকে হবিষ্যি করতেন। নিরামিষ খেতেন। ঠাকুর-দেবতার প্রসাদ হলেও আমিষ খেতেন না। পান খেতেন না। ঠাকুর তাঁকে মার প্রসাদ খেতে বলায় খেলেন। প্রসাদ খাবার পর তাঁকে একটি পানও খেতে বললেন। ইতস্তত করে গঙ্গাধর মহারাজ পানও খেলেন। তখন ঠাকুর তাঁকে বললেন—"দেখ, নরেন একশটি পান খায় মাছ মাংস সবই খায়। কিন্তু পথ দিয়ে যখন চলে তখন সবই ব্রহ্মময় দেখে। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই আসল ধর্ম।"

ঠাকুর গঙ্গাধর মহারাজকে এই প্রত্যক্ষ উপদেশ দিয়ে যথার্থ ধর্ম কাকে বলে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই আসল ধর্ম; উপবাস করা, নিরামিষ খাওয়া, গঙ্গাস্নান করা, মন্দিরে যাওয়া—এসব ধর্ম নয়। সাধারণ মানুষ বাইরের এই সকল আচার-অনুষ্ঠানমাত্রকেই ধর্ম বলে ভুল করে। তাই মাঝে মাঝে মহাপুরুষরা এসে তাঁদের জীবনের আচরণ এবং উপদেশ দিয়ে ঠিক ঠিক ধর্ম কি তা বুঝিয়ে দিয়ে যান। তাঁদের দৃষ্টান্ত দেখেই আমরা ঠিক ঠিক ধর্মপথে চলতে পারি। ভগবানকে লাভ করাই আসল ধর্ম। নিজের ভিতরকার পূর্ণতার বিকাশ করার নামই ধর্ম। স্বামীজী রাজযোগে এই কথাই বলেছেন। ভগবানকে দর্শন করা—ভালবাসাই আসল ধর্ম। শুধু আচার-অনুষ্ঠানকে ধর্ম বলে মনে করলে আমাদের ধর্ম-সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি এসে যায়।

ঠাকুরের দেহ যাবার পর তাঁর কয়েকজন ত্যাগী সন্তান বাড়িঘর ছেড়ে বরানগর মঠে এসে যোগ দিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ কিন্তু মঠে এলেন না। তিনি তপস্যা এবং তীর্থ-ভ্রমণের জন্য চলে গেলেন উত্তরাখণ্ডে, হিমালয়ে। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থে তীর্থে এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবার প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা ছিল হিমালয় পার হয়ে পায়ে হেঁটে তিব্বত ও মধ্য-এশিয়ার ভেতর দিয়ে বেরিং প্রণালীতে গিয়ে সমুদ্রস্নান করবেন।

পরিব্রাজক-সন্ন্যাসী-জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বামীজীর আদেশে নিচে নেমে এসে সঙ্ঘের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বামীজীর প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসার

জন্য তিনি নিজের রুচি-পছন্দকে বিসর্জন দেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁর প্রীতি ও ভালবাসা ছিল অপরিসীম। পরিব্রাজক-জীবনে তিনি সুযোগ পেলেই স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দুজনে আনন্দে ভ্রমণ করতেন। পরে স্বামীজী তাঁকে একা একা চলতে বলে নিজে আলাদা হয়ে গেলেন। কিন্তু গঙ্গাধর মহারাজ ঠিক একসঙ্গে না হলেও স্বামীজীর পিছু পিছুই ভ্রমণ করতে লাগলেন। স্বামীজীর প্রতি ভালবাসার জন্যই তিনি স্বামীজীকে খুঁজে খুঁজে বের করতেন। স্বামীজীর প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ তাঁর জীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

পরিব্রাজক-জীবনে স্বামীজীর মতো গঙ্গাধর মহারাজও বহু দেশীয় রাজার রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। সেখানকার গরীব-দুঃখীদের দুঃখে কাতর হন। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার জন্য রাজা ও রাজকর্মচারীদের উপদেশ দেন। নিজেও তাঁদের মধ্যে নারায়ণজ্ঞানে সেবাকার্য আরম্ভ করেন।

শিক্ষাবিস্তারের প্রতি গঙ্গাধর মহারাজের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। যথাযথ সুর ও ছন্দে উচ্চারণসহ ভারতের বেদ-বিদ্যার চর্চা হয়, এ ইচ্ছা তাঁর ছিল। জামনগরে তিনি একটি বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নিজে তিনি বেদপাঠ শুনতেন। ভাল স্তোত্র আবৃত্তি করতেন। পরবর্তিকালেও তিনি সকলকে সংস্কৃত ভাষার ও বেদ-বিদ্যার চর্চা করতে উৎসাহ দিতেন।

খেতড়ি রাজ্যে সাধারণ লোকের অভাব ও দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি খুবই কাতর হন। ভাবলেন, এদের জন্য কিছু করতে হবে। স্বামীজীকে চিঠি লিখলেন। স্বামীজী তাঁর শিক্ষা-বিস্তারের ও নরনারায়ণসেবার ইচ্ছাকে খুবই উৎসাহ দিলেন। স্বামীজীর আদেশ পেয়ে তিনি খেতড়িতে ৫০ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয় আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে সেই বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা হলো ২৫০। সেখানে বেদবিদ্যালয়ও স্থাপন করলেন। এইভাবে তিনি উদয়পুর রাজ্যেও গরীব-দুঃখীর জন্য অনেক সেবামূলক কাজ করেন। নরনারায়ণসেবার ভাবটি তাঁর মনে সহজেই স্থান করে নিয়েছিল।

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর স্বামীজী যখন মিশনের আদর্শে জনসেবার কাজ করতে ইচ্ছা করেছিলেন—তখন অনেকেই তাঁর ভাবের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। এমনকি তাঁর গুরুভাইদেরও অনেকের মনে দ্বিধা এবং সংশয় ছিল। গঙ্গাধর মহারাজ কিন্তু অতি সহজেই স্বামীজীর নরনারায়ণসেবার মাধ্যমে 'নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ'-এর আদর্শটি ধরে নিতে পেরেছিলেন।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজেরও স্বামীজীর কর্মযোগের নতুন সাধনার প্রতি সংশয় ছিল। স্বামীজীকে বাবুরাম মহারাজ সরাসরি প্রশ্নই করে বসেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, শিবজ্ঞানে জীবসেবার মাধ্যমে নিজের মুক্তি (ব্রহ্মজ্ঞান) এবং জগতের কল্যাণ দুই-ই হয়। ইহাই বর্তমান জগতে স্বামীজীর নতুন অবদান। বাবুরাম মহারাজজীও কাশীতে থাকাকালে

স্বামীজীর লেখা ভাল করে পড়ে তাঁর নরনারায়ণ সেবার মাধুর্য বুঝতে পারলেন। তিনি শেষে আমাদের সকলকে স্বামীজীর এই সেবার কথা বিশেষভাবে জোর দিয়ে বোঝাতেন ঃ "স্বামীজী বলে গেছেন, 'কর্মযোগই—নরনারায়ণ-সেবার ভাবই আমার নতুন দান।'" পূজনীয় রাজা মহারাজও স্বামীজীর এই আদর্শে আমাদের অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি বলতেন—"অনেক জীবন-ই তো বৃথা গেছে। আর একটা জীবন না হয় যাবে স্বামীজীর ভাবে কাজ করতে গিয়ে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি—স্বামীজী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর আদেশমতো তোমরা যদি কাজ কর, তোমরা ধন্য হয়ে যাবে, মুক্ত হয়ে যাবে।"

আসলে স্বামীজীর এই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ভাব ঠাকুরেরই দান। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—এই হলো স্বামীজীর মতে সন্ন্যাসীর আদর্শ। প্রাচীনকালের সাধু-সন্ন্যাসীরা সমাজে থাকতেন না। পর্বতের গুহায় নির্জনে তপস্যাদি করে নিজের মুক্তি লাভ করতেন। তাঁদের সমাজ-সেবার কোন কাজ করতে হতো না।

স্বামীজীই প্রথম সন্ন্যাসীদের সমাজসেবার মাধ্যমে নিজের মুক্তিসাধনা করবার নির্দেশ দিলেন। আগে ধারণা ছিল কাজকর্মের মাধ্যমে ভগবানলাভ সম্ভব নয়। কারণ ভগবানলাভের জন্য 'নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা'র মতো, বা 'অবিচ্ছিন্ন তৈলধারা'র মতো—মনকে একাগ্র করে ভগবানে লাগিয়ে রাখতে হয়। কাজকর্ম করতে গেলে মনের বিক্ষেপ হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্য আগে সন্ন্যাসীরা কর্ম ত্যাগ করতেন। তাই কাজে নেমে আধ্যাত্মিক ভাবটি যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য স্বামীজী 'উপাসনা' হিসাবে, 'সেবা-পূজা' হিসাবে কাজ করবার নির্দেশ দিলেন। পাথরের প্রতিমায় পূজা করে যদি ভগবদ্দর্শন হয়—তাহলে জীবন্ত মানুষের প্রতিমায় ভগবানের পূজা করছি—এই ভাব নিয়ে সেবা করলে কেন ভগবানলাভ হবে না? ভারতে সাধারণ মানুষের অন্নবস্ত্র ও শিক্ষার অভাব দেখে স্বামীজী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘকে নরনারায়ণ-সেবার আদর্শে, নতুন ধারায় সাধনা করবার ও সাধারণ মানুষের সেবা করবার নতুন পথ দেখিয়ে গেলেন।

বর্তমানে আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে 'সোস্যালিজম্'-এর কথা খুবই বলি। ধর্মভাব এবং জীবের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি না থাকলে যথার্থ সোস্যালিজম্ করা যায় না। মানুষমাত্রেই স্বার্থপর। "পরের জন্য কাজ করে আমার কি লাভ?" এই সহজ প্রশ্নটি তার মনে স্বাভাবিক ভাবেই আসে। সমস্ত জীবের মধ্যেই যদি 'আত্মদর্শন' করতে পারা যায়, তাহলে তখনই যথার্থ সোস্যালিজম্ বা নিঃস্বার্থ সেবা করা সম্ভব হয়।

স্বামীজীর এই নরনারায়ণ-সেবার ভাবটি গঙ্গাধর মহারাজের জীবনে বিশেষভাবে মূর্ত দেখা যায়। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় এই দেশে সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। অনাথ বালকদের নিয়ে সারগাছিতে আশ্রম স্থাপন করলেন। শিক্ষা-প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন

করলেন। তাঁর তপস্যার ফলে এখন এখানে কত বড় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। ঠিক এমনি মাদ্রাজে পূজনীয় শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের) উৎসাহে সাধারণ একটি বিদ্যালয় থেকে কত বড় বড় বিদ্যালয় ও কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

রাজনৈতিক নেতারা বলেন, ধর্ম মানুষের দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন থাকে। এটা কিন্তু ঠিক নয়। মহাপুরুষরা কখনও লোকের দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন হন না। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজের কাছে শুনেছি, একদিন রাত দুটোর সময় স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গিয়েছে, বারান্দায় পায়চারি করছেন। বিজ্ঞান মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি স্বামীজী! আপনার ঘুম হচ্ছে না?" স্বামীজী তার উত্তরে বললেন, "দেখ পেসন, আমি বেশ ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগল, আর আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হয় কোন জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং অনেক লোক তাতে দুঃখকষ্ট পেয়েছে।"

বিজ্ঞান মহারাজ আমাদের বললেন, "স্বামীজীর এই কথা শুনে আমি ভাবলাম, কোথায় কি দুর্ঘটনা হলো আর স্বামীজীর এখানে ঘুম ভেঙে গেল—এটা কি সম্ভব! এরকম চিন্তা করে মনে মনে একটু হাসলাম। কিন্তু আশ্চর্য—পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখি, ঠিক সেই সময় ফিজির কাছে কোন একটা দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে অনেক লোক মারা গেছে। খবরটি পড়েই আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। দেখলাম সিসমোগ্রাফের (পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কম্পন মাপার যন্ত্রের) চেয়েও স্বামীজীর nervous system (স্নায়ুজাল) more responsive to human miseries (মানুষের দুঃখকষ্টে অধিকতর সংবেদনশীল)।"

এতেই বোঝা যায়, ধার্মিক পুরুষ কখনো মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন হতে পারেন না। উচ্চ হৃদয় হলে বেশি কষ্ট পেতে হয়। মানুষের ভিতর ভগবানকে দেখলে উদাসীন থাকা যায় না। গঙ্গাধর মহারাজ তাঁর জীবনে এটা বিশেষভাবে দেখিয়েছেন।

এক সময় (April, 1927) 'প্রবুদ্ধ ভারতে' একটা Neo-Hinduism নামে প্রবন্ধ বেরিয়ে ছিল। সেই প্রবন্ধে এই শ্লোকটি ছিল—

"ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্।।"

গঙ্গাধর মহারাজের এই শ্লোকটি খুব ভাল লেগেছিল, কারণ এর ভাবটি তাঁর ভাবের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। বহুদিন পরে তিনি আমাকে চিঠি লিখে এই শ্লোকের reference চেয়ে পাঠান। আমি তখন অদ্বৈত আশ্রমের চার্জ-এ ছিলাম। উনি reference-টি পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলেন।

(উদ্বোধন : ৭৫ বর্ষ ৯ ও ১১ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দ

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য যে সকল পার্ষদগণের সহিত আমাদের কথঞ্চিৎ মিশিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী তাঁহাদের অন্যতম। আমরা যখন মঠে প্রবেশ করি তখন তিনি সারগাছিতে (মুর্শিদাবাদে) তাঁহার ক্ষুদ্র অনাথাশ্রম লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার হৃদয়বত্তা ও কর্মতৎপরতার কথা আমরা তখনই শুনিতে পাইতাম ও শুনিতাম যে, তিনি একরূপ দৈবাদিষ্ট হইয়াই মুর্শিদাবাদ সারগাছিতে ঐ ক্ষুদ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে কতকগুলি অনাথ বালক থাকে। তিনি সেখানে একাধারে তাহাদের পিতা-মাতা, বন্ধু ও সাথী এবং ঐ আশ্রমটি শ্রীশ্রীস্বামীজীর কর্মযোগের আদর্শের প্রথম প্রবর্তনা। তিনি (গঙ্গাধর মহারাজ বা অখণ্ডানন্দ স্বামী) পরিব্রাজক অবস্থায় ভারতের, এমন কি তিব্বতের অনেক স্থান ঘুরিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই দরিদ্রদিগের অসহায় অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত মর্মবেদনা অনুভব করিতেন ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে উহাদের দুঃখকষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘবের জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার সরলতার পরিচয় আমরা মঠে বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি যখন মঠে আসিতেন, সেখানে দুই-চারিদিন থাকিবার পরই সারগাছি আশ্রমে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। তিনি মঠে আসিলে শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) তাঁহাকে লইয়া নানারূপ কৌতুক করিতেন ও যখনই সারগাছির জন্য তাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতা দেখিতেন তখনই বলিতেন, "কি হবে গঙ্গা সেখানে গিয়ে? সেখানে তো কয়েকটি বাপ-মা খেদানো ন্যাংটা ছেলেদের নিয়ে আছ। এখানে কত সাধু ব্রহ্মচারী আসছে। তাদের নিয়ে থাক ও তাদের শিক্ষাদি দাও না কেন?" ইহা যে শ্রীশ্রীমহারাজের অন্তরের কথা নহে তাহা গঙ্গাধর মহারাজ বুঝিতে পারিতেন না এবং আরও ব্যাকুল হইয়া বলিতেন, "না, না, মহারাজ তুমি বুঝছ না, আমি না গেলে ঐ-সব ছেলেদের অত্যন্ত কষ্ট হবে।" শ্রীশ্রীমহারাজও তাঁহার সেই পূর্বকথা পুনরায় আবৃত্তি করিতেন ও গঙ্গাধর মহারাজও ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর হইতেন ও অবশেষে মঠে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে স্বীকৃত হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন।

তাঁহার সরলতা লইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ ও তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ কত না কৌতুক করিতেন ও আমরা তাঁহার সেই দেবদুর্লভ সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। তাঁহার কোথাও যাইবার প্রাক্কালে তাঁহার সে যাত্রাটি ভঙ্গ করিবার কৌশল আমরা অনেকেই জানিতাম। শুধু তাঁহাকে তখন বলিলেই হইত, "মহারাজ, আপনার 'তিব্বতের ভ্রমণ কাহিনী' যদি আমাদিগকে

আরেকবার বলেন তাহলে খুব ভাল হয়।" অমনি দেবদুর্লভ সরল বৃদ্ধ বসিয়া পড়িতেন ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া উহার সেই রোমাঞ্চকর ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিতেন। এদিকে যে তাঁহার ট্রেন ছাড়িবার সময় আগাইয়া আসিয়াছে ও তাঁহাকে স্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার গাড়িও উপস্থিত তাহা তিনি সব ভুলিয়া যাইতেন। সেই ভ্রমণ কাহিনী শেষ করিয়া যখন তিনি স্টেশনে পৌঁছাইতেন তখন প্রায়ই দেখা যাইত যে, সেদিনের ট্রেন অন্তত আধঘণ্টা পূর্বে ছাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ হয়ত পরপর কয়দিনই তাঁহার গাড়ি ফেল করিতে হইত ও ভক্তেরা তাঁহাকে পুনঃ পাইয়া খুবই আনন্দ করিতেন।

তাঁহার এই সরল ব্যবহারের পরিচয় আমার সৌভাগ্যেও কিছু ঘটিয়াছিল। তাহা এখানে বর্ণনা করিতেছি। খুব সম্ভব তখন ১৯২১ বা ১৯২২ সাল হইবে। পূজনীয় অভেদানন্দজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েকদিনের জন্য বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়িতে (বলরাম মন্দিরে) বাস করিতেছেন। আমিও তাঁহার সেবক হিসাবে সেখানে আছি। এমন সময় একদিন পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজও সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেই সময় কোনও কার্য উপলক্ষে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী (জিতেন মহারাজ) ও স্বামী নির্বাণানন্দজী সেখানে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহারা ধরিয়া বসিলেন—আজ অনেকদিন পরে আপনাকে পাইয়াছি। আজ আপনার আমাদের সহিত একটু তাস খেলিতে হইবে। অনেকদিন তো আপনি আমাদের সহিত তাস খেলেন নাই। তিনি প্রথমে না, না করিলেন, পরে রাজি হইলেন। কিন্তু আরেকজন খেলার সাথী কোথায় পাইবেন? আমাকে সামনে দেখিয়াই তিনি সস্নেহে ডাকিয়া বলিলেন, "এস, এস তুমি আমার দিকেই খেলবে ও ওরা দুজন অপরদিকে খেলবে।" ইহাতে আমি তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম, "মহারাজ, আমি তো বিন্তি খেলা বাল্যকালে খেলেছিলাম মাত্র, এতোদিনে তা একেবারে ভুলে গেছি।" কিন্তু বৃদ্ধ নাছোড়বান্দা, বলিলেন, "ওতেই হবে, তুমি আমার দিকে বসে পড়।" ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। আমরা ক্রমাগত হারিতে লাগিলাম। ও বৃদ্ধ প্রতিবারই বলিতে লাগিলেন, "এঃ, এ দেখছি কিছুই জানে না।" আমি তদুত্তরে প্রতিবারই সবিনয়ে বলিতে লাগিলাম, "মহারাজ, আমি তো ইহা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু তবুও বৃদ্ধ ছাড়িবার নন। অবশেষে ছক্কা-পাঞ্জা উভয়েই আমাদের উপরে পড়িল। এমন সময় আরেকটি ভক্ত আসিয়া পড়ায় মহারাজ বলিলেন, "এবার তুমি ওঠ, ওই আমার দিকে বসবে।" আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু দরজার নিকট যাইতে না যাইতেই বৃদ্ধ আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "চলে যেও না, তুমি বরং আমার পেছনে বসে আমাকে কখন কি তাস ফেলতে হবে দেখিয়ে দাও।" ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। আমরা একেবারেই হারিয়ে গেলাম। আমার বৃদ্ধের মুখে সেই কথা, "দেখছি ছেলেটি কিছুই জানে না।" আমিও মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, "মহারাজ তাতো বহুবার বলেছি।" এইরূপই ছিল তাঁহার বালসুলভ সরলতা—যাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম।

আর একদিনের কথা ঃ তখন শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ অত্যন্ত অসুস্থ। হাঁপানিতে খুবই কষ্ট

পাইতেছেন। তাঁহার এই অসুস্থতার কথা মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে জানানো হইয়াছে। খবর পাইয়াই পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ মঠে আসিয়া উপস্থিত ও শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়া একেবারে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিতে লাগিলেন, "দাদা, দাদা, আপনি আপনার শরীরকে এরূপ করলেন কি করে? আপনি চলে গেলে আমরা কাকে নিয়ে থাকব?" ইত্যাদি। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার বালক-স্বভাবের কথা জানিতেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন, "বোস বোস, তোর ওখানের কি খবর বল।" বলিতেই তিনি সেখানের তাঁহার কৃষি প্রভৃতির কথা বলিতে শুরু করিলেন ও বলিলেন, "দাদা, কি আর বলবো, এবার ওখানে যে পটল হয়েছিল তার পরিমাণ কয়েক মণ হবে। কিন্তু পাছে কেউ ওগুলি চুরি করে নিয়ে যায়, তাই ক্ষেতের মাঝখানে একটা চালাঘর করে দিয়েছিলাম কিন্তু দাদা, বুকের ওপরে ঘর, তা তারা সহ্য করবে কেন? অমনি দেখতে দেখতে সব পটল গাছ শুকিয়ে গেল। বুকের উপরে ঘর ছিল কিনা।" দাদাও বলিলেন, "তা বলেছিস ঠিকই।" আমরাও এই স্বর্গীয় দুই ভ্রাতার আলাপন শুনিয়া মনে মনে খুবই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

এইরূপই ছিল তাঁহার বালসুলভ সরলতা! কিন্তু তাঁহার এই অদ্ভুত সরলতার সহিত দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার যে ঐকান্তিক কামনা ও অদ্ভুত দূরদৃষ্টির পরিচয়ও আমরা পাইয়াছিলাম তাহা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁহার অনেক কথাই আমরা তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই কিন্তু পরে উহাদের পরিণতি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই সরল বৃদ্ধের দূরদৃষ্টি ও দেশের ঐকান্তিক মঙ্গল কামনা কতদূর সুদূর প্রসারিত।

একদিন তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে মঠে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের নিকট বলিলেন যে, "দেখ, আজ হেঁটে হেঁটে ব্যারাকপুরে সুরেনবাবুর (স্যার সুরেন ব্যানার্জীর) বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে অতি কষ্টে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। তখন তাঁকে বললাম, 'আপনারা এ কি ভাবে কংগ্রেস পরিচালনা করছেন। দেশের মঙ্গল চাইলে গ্রামে যেতে হয়। সেখানে সহস্র সহস্র গ্রামবাসী রয়েছে, যারা আপনাদের কোনও কথাই জানে না। আপনারা এখন শুধু শহরে বসেই কংগ্রেসের কথাবার্তা আলোচনা করছেন। এতে ঐ-সব নিরক্ষর দেশবাসীর কি উপকার হচ্ছে? আপনারা গ্রামে গিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন করেন না কেন? কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টকেই বা আপনারা ঐরূপ সাজ-সজ্জা করিয়ে বড় বড় গাড়িতে চড়িয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন মঞ্চে নিয়ে আসেন কেন? গ্রামের দরিদ্রদিগের সহিত এক হয়ে যান। গ্রামেই কংগ্রেসের অধিবেশন করুন ও কংগ্রেসের সভাপতিকে গরুর গাড়িতে করে নিয়ে যান, যাতে গ্রামবাসিগণ এই অধিবেশনটি তাদেরই ও কংগ্রেসের সভাপতি তাদেরই লোক বলে বুঝতে পারবে'।" ইহার উত্তরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মহাশয় কি বলিয়াছিলেন, আমাদের জানা নেই, তবে উহার কয়েক বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন শুরু হইলে যে উহার অধিবেশন এক গ্রামেই হইয়াছিল ও সেখানে প্রেসিডেন্টকে ঐরূপ গরুর গাড়িতে করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল উহা দেখিয়া আমরা ঐ বৃদ্ধের কথার সারবত্তা ও তাঁহার দূরদৃষ্টির কথা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

আর একদিন তিনি এরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে মঠে আসিয়া বলিলেন, "দেখ, আজ কলকাতায় আশুবাবুর (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম তাঁর ঘর ভর্তি বই, থাকে থাকে সাজানো। এগুলির অধিকাংশই দেখলাম ইংরাজী ভাষায় লেখা পুস্তক। (তিনি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।) বহুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করবার পর তাঁর সহিত দেখা হলে তাঁকে বললাম, 'আপনি তো এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। আপনি এতে সংস্কৃত ভাষার বহু প্রচলন করেন না কেন? সংস্কৃতই তো আমাদের জাতির মেরুদণ্ড।' "

তখন আশুবাবু তাঁহার এই কথার সারবত্তা কি বুঝিয়াছিলেন জানি না কিন্তু কয়েক বৎসর পরে Lord Ronaldshay -র 'Heart of Aryavarta' নামক পুস্তকটি বাহির হইলে উহা পড়িয়া আমরা আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম যে এতদিনে সেই বৃদ্ধের বাণী সফল হইতে চলিতেছে। উহাতে Ronaldshay লিখিতেছেন যে, "আজ যদি মেকলে কলকাতায় আসতেন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতেন তা হলে বুঝতে পারতেন যে, যে ভাষাকে (সংস্কৃত) তিনি অবজ্ঞাভরে এক সময়ে মৃত ভাষা বলে উল্লেখ করেছিলেন ও বলেছিলেন যে উহার (সংস্কৃত ভাষার) যতগুলি বই আছে তা আমাদের যে কোন লাইব্রেরির একটি আলমারিতে রাখলেই যথেষ্ট হবে," আজ সেই ভাষাতেই ১২টি বিভিন্ন বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হইতেছে।

উহা পড়িয়া আমাদের মনে হইয়াছিল যে সেই ভাবপ্রবণ সরল বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটি সেদিন আশুবাবুর সহিত যে কথা বলিয়াছিলেন আজ দেখিতেছি তাহাই বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী এইরূপেই তাঁহার শিষ্যগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কতরূপে কতদিকে প্রচার করিয়াছিলেন তাহা কে বলিতে পারে? আমরা শুধু তাঁহাদের বাহিরটিই দেখিয়াছি। ভিতরে ঢুকিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়? শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের উহা যথার্থরূপে বুঝিবার সামর্থ্য দিন, ইহাই প্রার্থনা।

(পুণ্যস্মৃতি—উদ্বোধন কার্যালয়)

স্বামী অখণ্ডানন্দের কথা

স্বামী অকুণ্ঠানন্দ

(রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অকুণ্ঠানন্দ ছিলেন ভক্ত প্রবর বলরাম বসুর দৌহিত্র। তাঁর মা কৃষ্ণময়ী ছিলেন বলরাম বসুর কন্যা। বাবা বিপিনবিহারী রায়চৌধুরী ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের জমিদার। সঙ্গে তিনি 'বিপিন জামাই' নামে সুপরিচিত ছিলেন। স্বামীজী, রাজা মহারাজ প্রমুখের সঙ্গে ছিল তাঁর সখ্যতার সম্পর্ক। ছোটবেলা থেকে বাড়িতে ও মামার বাড়িতে স্বামী অকুণ্ঠানন্দ বহু সাধুর সমাগম দেখেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের পার্ষদবৃন্দ। স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, ৮৪ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন')

আমি তখন খুব ছোট। বয়স বোধহয় ৭।৮ বছর হবে। গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) আমাদের বাড়িতে খুব আসতেন এবং থাকতেন। বলরাম-মন্দিরের কাছাকাছি কম্বুলিটোলায় ১৩ নং হেম কর লেনে (কলকাতা-৭০০ ০০৫) ছিল আমাদের বাড়ি। দুপুরে প্রায়ই আমরা ওঁর পাকা চুল তুলে দিতাম। উনি ডেকে বসাতেন। ওঁর আকর্ষণ ছিল গল্প। আমি থেকে বাবা পর্যন্ত সবাই চুপ করে শুনতাম। উনি প্রায়ই কোন খবর না দিয়ে খুব বেলায় আমাদের বাড়িতে এসে বলতেন ঃ "ভাত খাব।" উদ্দেশ্য ছিল মাকে মুশকিলে ফেলে মজা করা।

একদিন খেয়ে চলে যাওয়ার সময় তিনি আমায় চেঁচিয়ে ডাকলেন। আমি উত্তর দিলাম ঃ "কি?" উনি বললেন ঃ "এদিকে শোন্।" কাছে যেতেই বললেন ঃ "বাবা, মা বা অন্য কোন গুরুজন যদি ডাকেন তাহলে 'আজ্ঞে' বলে সাড়া দিতে হয়। আমি ডাকলুম তা তুই 'কি' বলে উত্তর দিলি কেন? এটা অসভ্যতা। 'কি' বলতে নেই।"

১৯২৫ সালের আগের কথা। স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন পুঁটিয়ার শচীন সান্যালদের বাড়িতে (১নং মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলকাতা-৪) থাকতেন। আমাদের বাড়িতে একদিন এসেছেন, বলছেন ঃ "সেদিন কালীঘাটে গিয়েছিলাম। দর্শন করে ফেরবার পথে আমরা ট্রামরাস্তায় কাছ বরাবর গেছি। এমন সময় দেখি ট্রামটা চলে যাচ্ছে। ট্রামটা চলে যেতে দেখে দৌড়ে ধরব মনে করে দৌড়তে আরম্ভ করলাম। আরম্ভ করেই মনে হলো—দৌড়ে তো ঠিক করছি না; সাধুদের তো দৌড়তে নেই—যম যদি তাড়া করে তবু দৌড়তে নেই। যেই মনে করা অমনি এক আছাড়! আছাড় খেয়েই পা-টা একটু কেটে গেল।" তখন বোধহয় ১৯৩৪ সাল। একদিন শুনলাম, স্বামী অখণ্ডানন্দ বালীগঞ্জে ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের শ্যালক ঋষিবাবুর (ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়) বাড়িতে এসেছেন। আমি বরাবর সাধুদের কাছে—বিশেষ

করে ওঁর কাছে আদর পেতাম। তাই সেদিন বালীগঞ্জে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম, উকিল বিজয়বাবুর (স্বামী বিরজানন্দের ছোট ভাই বিজয়কৃষ্ণ বসু) সঙ্গে তিনি মঠের একটি মামলা সম্বন্ধে কথা বলছেন। দেখে মনে হলো, মামলার জন্য তিনি খুব চিন্তিত। আমি অনেকক্ষণ বিজয়বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু কোন নজর নেই। বিজয়বাবু চলে যাওয়ার পর দু-তিনজন প্রণাম করলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে প্রণাম করলাম। কিন্তু তিনি একেবারে খেয়াল করলেন না। প্রণাম করে দু-তিন হাত দূরে দাঁড়ালাম। তা-ও একেবারে চিনতে পর্যন্ত পারলেন না! মহারাজের এই ব্যবহারে খুব অভিমান হলো। যেখানে অতিরিক্ত আদর সেখানে এই উপেক্ষা সহ্য হলো না। মনে মনে ভাবলাম ঃ "না, আর যাব না। আর দেখা করব না।" ভাবতে ভাবতে বাস-রাস্তায় এলাম। ওখানে শুনেছিলাম, মহারাজ তখন মঠে যাবেন। অন্যমনস্কভাবে বাসে উঠে দেখলাম, বাসটা আমার বাড়ির দিকে যাবে না, তার গন্তব্যস্থল হাওড়া। এইখানেই ঠাকুর আমায় কৃপা করলেন, আমার জীবনের মোড়টি ঘুরিয়ে দিলেন। আমি মনে দ্বন্দ্ব নিয়ে মঠের উদ্দেশে চললাম। আমি যখন বেলুড় বাজারের কাছে তখন দেখি মহারাজের গাড়ি পাশ কাটিয়ে মঠের দিকে চলে গেল।

মঠে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করতেই যেমন বরাবর করতেন তেমনিই আদর-যত্ন করে খোঁজ নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কখন এলি?" বললাম ঃ "বালিগঞ্জে গিয়েছিলাম।" শুনে তিনি বললেন ঃ "কৈ, দেখা করলি না তো?" তারপর আমার মুখে প্রকৃত ঘটনা শুনে খুব সস্নেহে বললেন ঃ "তুই বললি না কেন, 'আমি শম্ভু এসেছি?' তুই তো ভারি বোকা! আমি তখনই তো মঠে চলে এলাম। আমায় বললে তোকে আমার সঙ্গে গাড়িতে নিয়ে আসতাম। আসলে আমি তখন একটা কাজে বেজায় চিন্তিত ছিলাম।"

১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে মহাপুরুষ মহারাজ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অখণ্ডানন্দ মহারাজ সে-সময় মঠের 'সোনার বাগানে' ('লেগেট হাউস') এসে রয়েছেন। আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন বাবাকে দিয়ে। বাবা তখন রোজ মঠে যান। আমি তখন সবে বি. এসসি. পাশ করেছি। কিছুদিন আগে আমার মার শরীর গেছে। বলতে গেলে একরকম আমার জন্মের পূর্ব থেকেই সাধুসঙ্গ হলেও ম্যাট্রিক পাশ করার পর সায়েন্স পড়তে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মে অবিশ্বাস, সাধুতে অভক্তি ইত্যাদি পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে। বোধহয় সংস্কারবশত অথবা সাহসের অভাবে মুখে সাধুদের সামনে কিছু বলতে পারতাম না। আমাদের বাড়িতে একটা নিয়ম ছিল—প্রত্যেককে প্রতিদিন মালা ঘোরাতে হবে। মালাজপ না করলে যত ছোটই হই না কেন খাওয়া জুটত না। মায়ের মৃত্যুর পর মনের নাস্তিক ভাবটা একটু কমেছিল। মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন শুনে আমি কয়েকজন বন্ধুসহ তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আমি 'ল' পড়ছি শুনে তিনি বেজায় রেগে গেলেন, বললেন ঃ "শেষকালে ওকালতি! রাম রাম! ...কিচ্ছু হবে না! আর কিছু জুটল না?"

আমি তখনকার ফ্যাশনের একটা শার্ট পরে গিয়েছিলাম। কলকাতার ছাত্রদের জামার গলায় বা হাতে বোতাম দেওয়া ছিল না—কলারটাও বেশ ওল্টানো ছিল। উনি তো ঐসব

দেখেই চটে লাল! বললেন ঃ "হাতে গলায় সব বোতাম নেই কেন? এসব অসভ্যতা। অলবড্ডে! ও কি? যত্তো সব 'কেয়ারলেস্‌নেস্'—ভারি খারাপ! এলোমেলো—কোন কিছুর ঠিক নেই! ঠাকুর ভারি রাগ করতেন এরকম সব দেখলে।"

দিনকতক পরে ফের গেছি—একটু দাড়ি হয়েছে আর কাপড়টাও খুব পরিষ্কার নয়। জামার হাতের কাছে একটু ফুটো—ছিঁড়ে গিয়েছে। খুব সামান্যই। এদিনও যেতেই অভ্যর্থনা হলো মুখ খিঁচিয়ে, বকুনি দিয়ে—"ফের ঐরকম অসভ্যের মতন এসেছিস? জামাটা ছেঁড়া, ময়লা, যত্তোসব দারিদ্রের লক্ষণ। ওসব ভাল না, ঠাকুর এসব পছন্দ করতেন না। বলতেন, 'লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।' ওরকম কেন?" তারপর বললেন ঃ "তোর দোছোট (উত্তরীয়) নেই কেন?" আমার তো মাথায় বজ্রাঘাত। 'দোছোট'! বন্ধু-বান্ধব কলেজের ছেলেরা যে খেপিয়ে মারবে! আমি কল্পনাতেও আনতে পারলাম না যে, আমার মতো একটা 'youngman of modern taste'-কেও দোছোট পরে আসতে বলতে পারে কেউ! তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলাম ঃ "দোছোট আবার কি? ওসব বুড়োদের জন্য, ওসব তো সেকেলে।" যেই এই কথা বলা, আর যাই কোথায়, অমনি বকুনি আরম্ভ হলো ঃ "ভাল কিছু শেখবার নাম নেই! ভদ্র সভ্য চাল ছেড়ে যা খুশি তাই পরবে। যত্তো সব বাজে স্বভাব! আমাদের বাঙালী হিন্দুদের ঐটাই বিশেষ পোশাক। আমাদের টুপি নেই। ওটাই হলো বনেদি চাল।" এইরকম করে খানিক বকে শেষকালে বললেন ঃ "এইবার থেকে দোছোট ব্যবহার করা চাই-ই, নইলে পোশাক অসম্পূর্ণ থাকে।" সূয্যি মহারাজের (স্বামী নির্বাণানন্দ) দিকে চেয়ে বললেন ঃ "শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দের) কেমন সহবত ছিল! ধীর স্থির—সব কাজ গোছানো। ঐ উদ্বোধন থেকে বলরামবাবুর বাড়ি এত কাছে—তবু চাদরটি গোছানো—কাঁধে ফেলা।"

একবার গঙ্গাধর মহারাজ আমাকে মঠে ডেকে পাঠালেন, আমি গিয়েছি। সেবককে নানা আদেশ করছেন ঃ "শম্ভুকে এটা দে, ওটা দে।" তখন মহারাজ স্বামীজীর ঘরের পাশের ঘরটিতে থাকতেন। প্রসাদ পাওয়ার পর আমাকে ওঁর ঘরেই বিশ্রাম করতে বললেন। বিকেল হলো, আমি বাড়ি ফিরে আসবার জন্য অস্থির। কিছুক্ষণ পর পর বলছি ঃ "আমি এবার বাড়ি যাব।" মহারাজ বলছেন ঃ "যাবি এখন।" এইভাবে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি খুব চঞ্চল হয়ে উঠলাম। শেষে রাত হলে আমাকে বললেন ঃ "বাড়িতে একটা ফোন করে খবর পাঠিয়ে দে, আজ রাতে মঠে থাকবি।" আমি তাই করলাম। সেই আমার প্রথম মঠে রাত্রিবাস। তিনি আমাকে তখন থেকেই আপনার করে নিতে চাইছেন। কিন্তু আমি তখন বুঝতে পারিনি। পরদিন সকালে প্রাচীন সন্ন্যাসী গোঁসাই মহারাজ (স্বামী চিদানন্দ) আমাকে দেখে বলছেন ঃ "মহারাজ, শম্ভু এভাবে মঠে থাকলে ভাল হয়। আস্তে আস্তে ঠাকুরের ভাব গ্রহণ করতে পারবে।" গোঁসাই মহারাজের কথা শুনে গঙ্গাধর মহারাজ বললেন ঃ "দ্যাখ, ঠাকুরের ভাব-টাব হলো অনেক পরের কথা, আগে তো মানুষ হোক।"

মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) অন্তরে কি ছিলেন তা আমি বুঝতাম না, কিন্তু বাইরে ছিলেন

একেবারে শিশুসুলভ। 'শিশুসুলভ' বললে ভুল হবে, বলা উচিত 'দুষ্টুশিশুসুলভ'। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে আসুক সেটা তিনি খুব চাইতেন। সারাদিন হো-হো হবে, বেশ গোলকধাম খেলা হবে! ওঁর খেলার সাথীদের মধ্যে ছেলে-মেয়ে দু-ই ছিল। বলরাম-মন্দিরে তিনি থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যেমন দুটি খাট ব্যবহার করতেন রাজা মহারাজও সেইরকম দুটি খাট ব্যবহার করতেন। গোলকধাম খেলায় একটা মজা ছিল। খেলা অনুযায়ী জন্ম হলে সংসার, আবার স্বর্গ-নরক রয়েছে। এক দান পড়লে নরক থেকে উদ্ধার। খেলতে খেলতে কেউ যদি নরক থেকে উদ্ধার হলো তখনই রাজা মহারাজ পাশের কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে বলতেন ঃ "এই গুটি নরক থেকে উঠেছে রে, ধুয়ে নে, ধুয়ে নে!" এইভাবে তিনি মজা করতেন। আমি কখনো তাঁর সাথে গোলকধাম খেলিনি, তবে দেখেছি অনেকবার। তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম। বলরাম মন্দিরে থাকবার সময় মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজের পেছনে লাগতেন। ছোট ছেলেমেয়েদের কাউকে দিয়ে একচোখ দেখাতেন। কাউকে বলতেন ঃ "একচোখ দেখিয়ে গঙ্গাধর মহারাজকে ভোরবেলা 'সুপ্রভাত' জানিয়ে আয়।" এইরকমভাবে তিনি নানা মজা করতেন ওঁর সঙ্গে।

অখণ্ডানন্দ মহারাজের জন্মতিথি ঠিক জানা যায় না। মঠ-কর্তৃপক্ষ মহালয়ার পুণ্য তিথিটিকে তাঁর জন্মতিথি ধরে নিয়েছেন। যেহেতু তিনি সকলের 'বাবা' ছিলেন আর মহালয়া পিতৃপুরুষের তর্পণের দিন, তাই এ-দিনটিকেই তাঁর জন্মতিথি বলে ধরা হয়েছিল।

শরীর যাওয়ার আগে যেবার তিনি মঠে রয়েছেন সেবার একদিন সন্ধ্যার একটু আগে স্বামীজীর ঘরের পাশের ঘরে তিনি ইজিচেয়ারে বসে। চেয়ারের পাশেই এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁকে বলছেন ঃ "আমি খুব তেতো খেতে পারি। স্বামীজী খুব তেতো খেতে পারতেন। আমি নিমপাতা শুধুই খেতে পারি। কুইনিন শুধুই খেতে পারি। গোড়ায় গোড়ায় বুঝতে পারতাম না—এ-রকম কেন হয়। তারপর বুঝলাম, আমরা তো তেতো খেতেই এসেছি। জগতের যত দুঃখ-কষ্টরূপ তেতো ভোগ করতে হবে। ঐ-জন্যই তো আমাদের জন্ম। পরের ভোগ নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে ভোগ করার জনই আমাদের জন্ম। এই ধর, তোমার যদি কোন পাপ-টাপ থাকে—দাও আমায়, আমি তোমার হয়ে ভোগ করব। সংসারের সাধারণ লোক কেবল মিষ্টিটা খোঁজে—কেবল রসগোল্লা। শুধু সুখটুকু খোঁজে। বাবা, তা হয় কি? তা হয় না। আমাদের সেরকম নয়। পরের জন্য যারা তেতো খেতে পারছে না, তাদের হয়ে তো খেয়ে দিলাম!"

মহাপুরুষ মহারাজের শরীর যাওয়ার পর স্বামীজীর পাশের ঘরে গঙ্গাধর মহারাজ রয়েছেন। সকলের ইচ্ছা যে, উনি মঠেই থাকুন। কিন্তু তিনি মোটেই বেশিদিন সারগাছি ছেড়ে থাকতে ইচ্ছুক নন। একদিন তাঁর ঘরে গেছি। অনেক কথার মধ্যে একজনকে তিনি ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিক পাখা, টেবিল ল্যাম্প দেখিয়ে বললেন ঃ "এ-সব মতলব কি জান তো? আমায় বাঁধবার চেষ্টা। সেদিন অমূল্যকে (স্বামী শঙ্করানন্দ) বললাম, 'ওহে এসব কি বুঝছ তো?' সে

বললে, 'মহারাজ আপনাকে বাঁধবার চেষ্টা।' আমি বললাম, 'বাবা, ওতে কি আর হয়? বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) তখন কত করে বলতেন, তা-ই মঠে রইলাম না। তাঁদের ভালবাসাই এখানে বাঁধতে পারলে না, আর এরা ভেবেছে ঐসবে আমায় ভোলাবে!' "

ঠাকুরের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব আরম্ভ হওয়ার আগেই অখণ্ডানন্দ মহারাজ মঠে একদিন বলছেন ঃ " 'সেন্টিনারী'র মধ্যে একটা জিনিস করতে হবে। সব সম্প্রদায়ের সাধুরা আসবেন। কাশীতে (বোধহয় প্রয়াগের নামও করলেন) ভাণ্ডারা হবে। তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করে আনতে হবে, বিশেষত নাগাদের। তাঁদের সব পূজা করে সেবা করা হবে। পা ধুইয়ে দিতে হবে। আমি গোড়ায় কজনকে পা ধুইয়ে দেব। সব পারব না, আমার এখন শরীরের যা অবস্থা। নাগাদের মধ্যে ঠাকুরের ভাব ঢোকাতে হবে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'এদের দিয়েই হবে।' ধর্মে একটা ঐ-রকম গোঁ চাই, আর চাই জিতেন্দ্রিয় হওয়া। গেরস্তদের দিয়ে ছাই হবে। বছর বছর ছেলে হচ্ছে। তারা আবার কি ভাবে নেবে! এইসব হলেই তবে 'সেন্টিনারী', তা না হলে কলাটি! আর আমারও কোন আগ্রহ থাকবে না। ও ঐ প্রেসিডেন্ট হওয়া—ঐ পর্যন্ত!"

বোধহয় ১৯৩৪ সাল। একদিন সকালে আমি মঠে গিয়েছি। মহারাজ আমায় থাকতে বললেন সেদিন। খুব খাওয়ালেন। যখনই যা খান আমায় দেন। বলছেন ঃ "খুব খা—তোকে খাইয়ে খাইয়ে শেষ করব।"

আমি বিকেলে গোঁসাই মহারাজকে বলছি ঃ "মহারাজ এই কথা বলছেন, তা আমার তো খেয়ে খেয়ে পেটে কড়া পড়ে যাচ্ছে। স্বামীজীর ভাব-টাব তো কিছু পেলাম না। ব্যাপার কি কিছু তো বুঝছি না!" গোঁসাই মহারাজ আমার কথা ওঁকে বলে দিলেন। মহারাজ শুনে বললেন ঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খেয়ে যাক। খুব খাক। আগে তো মানুষ হোক।"

সূয্যি মহারাজ বলতেন ঃ "বড় মজার মানুষ ছিলেন গঙ্গাধর মহারাজ। একবার সারগাছি থেকে এসে মঠে রয়েছেন। তখন তিনি মঠের প্রেসিডেন্ট। মঠে স্বামীজীর ঘরের পাশের ঘরে আছেন। একদিন বলছেন, 'এই ভুঁড়ির জন্যই তো শরীরটা অকেজো হয়ে গেল। এই এতটা (ভুঁড়ির চারপাশ দেখিয়ে) যদি কেটে বাদ দিয়ে দাও তো ফের আরেকবার তিব্বত-ফিব্বত ঘুরে আসতে পারি। ভুঁড়িটা ছাড়া আর সব ঠিক আছে।' আরেকদিন বলছেন, 'দেখ, শরীরটা খারাপ। ভাবলুম আজ শনিবার, একবার ঠাকুরঘরে যাব। তা আর হলো না। এই শরীরটার জন্য। ঠাকুর বলতেন, শনিবার মধুবার। শনিবার এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) আসবি। রবিবার তাঁর কাছে অনেক লোক আসত। সেজন্য তিনি রবিবারে আমাদের যাওয়া পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন বিশেষ করে শনিবার তাঁর কাছে যেতে। অন্যদিনেও যেতে বলতেন, তবে রবিবারে ভক্তদের বেশি ভিড় হতো বলে তিনি চাইতেন আমরা যেন পারতপক্ষে রবিবারে না যাই।'

"গঙ্গাধর মহারাজ তখন সবে প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। ১৯৩৪ সালের মার্চ-এপ্রিলের কথা। তখন বিহারে ভূমিকম্প-ত্রাণ চলছে। কথা চলছে, মিশন পরিচালিত ত্রাণকেন্দ্রগুলি তিনি দেখতে

যাবেন। সেসময়ে একদিন বলছেন, 'অমুক (একজন বেশ পুরনো সাধু) সেদিন বলে গেল অমুক দিন ফিরব, কিন্তু ফিরল না—একটা চিঠিও দিল না। আমি ভাবছি—কেন ফিরল না? দেখ দেখি কী কাণ্ড! ভারি অন্যায়! তোমরা সব জেনে রাখ, ঐরকমভাবে যে অমুক দিনে আসব বলে না আসবে তার কাছে বেলুড় মঠের দরজা বন্ধ।' আমি বললাম, 'হলোই বা দরজা বন্ধ, ডিঙিয়ে আসব।' মহারাজ মুখ ভেংচে বললেন, 'ডিঙিয়ে আসব! আর আমিও ঐ দরজা দিয়ে একেবারে বেরিয়ে পড়ব। এখানে থাকুন, এখানে থাকুন করবে, আর একটা কথাও আমার শুনবে না!' ঠিক যেন একটা শিশু! সারগাছি থেকে ওঁকে মঠে আনতে আমাদের কত ফন্দি-ফিকির করতে হতো। কিছুতেই সারগাছির অনাথ ছেলেদের ছেড়ে উনি আসবেন না। কতরকম ভাবে ভুলিয়ে-ভালিয়ে—যেমন করে একজন অবুঝ অনিচ্ছুক বাচ্চাকে কোনরকমে রাজি করানো হয়—তাঁকে বেলুড় মঠে নিয়ে আসা হতো। যাহোক, আমি বললাম, 'আপনি বেরিয়ে পড়লে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যেমন আপনার সঙ্গে কোঠারে করেছিলেন সেরকম যদি হয়?' গঙ্গাধর মহারাজ গম্ভীরভাবে বললেন, 'সে-কথা আলাদা। মহারাজের কথা আলাদা। তবুও শেষ পর্যন্ত পালালুম তো! একেবারে কিছু না বলে-কয়ে সুট্ করে!' সেবারে কোঠারে মহারাজ ছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজকেও কোঠারে এনে রেখেছিলেন তিনি। দিন কয়েক থাকার পর গঙ্গাধর মহারাজ আর কিছুতেই থাকতে চাইছিলেন না—সারগাছি চলে আসতে চান। মহারাজও তাঁকে আসতে দিতে চান না। শেষে তাঁর পীড়াপীড়িতে মহারাজ রাজি হলেন। গঙ্গাধর মহারাজ পালকিতে উঠলেন স্টেশনে যাওয়ার জন্য। পালকি অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে কোঠারের বাড়িতেই এসে থামল। গঙ্গাধর মহারাজ পালকিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পালকি থামতে তিনি নেমে দেখেন, কোঠারের বাড়িতেই ফিরে এসেছেন। আসলে মহারাজ পালকিওয়ালাদের ইশারা করে দিয়েছিলেন, যাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার কোঠারের বাড়িতেই পালকি ফিরিয়ে আনা হয়। পরে একদিন মহারাজকে কিছু না বলে চলে গেলেন।

"যাই হোক, তাঁর কথায় আমি হেসে উঠলাম। এইসব কথা হওয়ার পরে মহারাজের ঘর থেকে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর একটা টেলিগ্রাম নিয়ে আবার ওঁর কাছে এসেছি। বললাম, 'কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানাচ্ছে যে, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যাঁরা বিহারে ত্রাণের কাজ করছেন তাঁদের নিয়ে গান্ধীজী একটি সভা আহ্বান করবেন। মিশন থেকে একজন প্রতিনিধিকে ঐ সভায় যোগদান করার জন্য ওঁরা অনুরোধ করেছেন। ওঁরা ত্রাণের জন্য আমাদের কিছু টাকা দিতে চান। তা এই টাকা নিতে কোন অসুবিধা আছে কি? আমার তো মনে হয়, এতে ত্রাণের কাজ আরও ভাল হতে পারবে। আমরা ওদের টাকার আলাদা হিসাব রাখব। যেখানে এত লোক কষ্ট পাচ্ছে যেখানে যদি মিলেমিশে এভাবে কাজটা করা যায় তাহলে বহু মানুষের উপকারে লাগে। তাই নয় কি মহারাজ? এখানে মিশনকে আলাদা রাখা কি ঠিক?'

মহারাজ শান্তভাবে বললেন, 'তুমি যা বলছ তা ঠিক, তবে এ বিষয়ে একটা 'প্রিসিডেন্স' (পূর্ব দৃষ্টান্ত) রয়েছে, সেটা মনে রাখতে হবে। সেই দৃষ্টান্ত বা নির্দেশিকা স্বয়ং মহারাজের

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ)। সেটা জেনে রাখ। মহারাজের ঐ নজির আর এখনকার পরিস্থিতি—দুটোকে বিচার করে যা ভাল বুঝবে তাই কোরো, আমি আর কি বলব! প্রথম যখন আমাদের মিশনের রিলিফ ওয়ার্ক শুরু হলো (মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলায়—মে ১৮৯৭) তখন কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক চারুচন্দ্র বসু মহাবোধি সোসাইটির ফেমিন রিলিফ ফাণ্ড থেকে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। এই সাহায্য না পেলে আমাদের রিলিফ চালানো কঠিন হতো। তাঁরা টাকা দিলেও রিলিফ কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের নামেই হচ্ছিল। আমাদের কাজ বেশ ভালভাবে চলছে। মাদ্রাজ থেকে শশী মহারাজের প্রেরণায় ও উৎসাহে আর্থিক সাহায্যও আসতে শুরু হয়েছে। খবরের কাগজে আমাদের কাজের সুখ্যাতি করে রিপোর্ট বেরোতে শুরু হলো এবং লোকের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। তখন মহাবোধি সোসাইটির পক্ষ থেকে বলা হলো যে, রামকৃষ্ণ মিশনের নামে কাজ হলে তাঁরা আর টাকা দেবেন না। রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফের কাজ করলেও যেহেতু তাঁরা আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন সেজন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁদের নামও রাখতে হবে। এই শর্ত শুনে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বললেন, তাই হবে। আমাদের নাম রসাতলে যাক। আমাদের উদ্দেশ্য মানুষের সেবা। নামের জন্য কিছু কিছুমাত্র ভাববে না। আমরা নাম চাই না। আমরা চাই কাজ। আমাদের লোকেরা কাজ করবে। ওরা নাম চায়, নাম ওদের হোক গে। স্বামীজী তখন আলমোড়ায়। আলমোড়া থেকে চিঠিতে স্বামীজী ঐভাবে আমাকে লিখেছিলেন।* রাজা মহারাজ কিন্তু রাজি হলেন না। তিনি বললেন, না, কাজ আমাদের চলবে, তবে রামকৃষ্ণ মিশনের নামেই কাজ হবে। ওঁরা যদি টাকা না দেন তো দেবেন না, টাকা আমরা যোগাড় করব; কিন্তু কোন শর্তাধীনে কারুর কাছ থেকে কোন সাহায্য আমরা নেব না। ঠাকুরের কাজ—নরনারায়ণের সেবা টাকার জন্য আটকাবে না। মহারাজের কথাই রইল। স্বামীজীও মহারাজের কথা মেনে নিলেন। খবরের কাগজে আমাদের আলাদা অ্যাপীল (আবেদন) বের হলো এবং টাকাও এসে গেল।' ”

আমি আর বাবা সারগাছি গিয়েছি। সেই আমার প্রথমবার সারগাছি যাওয়া। অখণ্ডানন্দ মহারাজ প্রণামের প্রসঙ্গে যেদিন বলেছিলেন ঃ “ঠাকুরকে প্রণাম সাষ্টাঙ্গে করতে হয়। অষ্ট অঙ্গ—জানু-পা-হাত সব। 'জানুভ্যাম্ চ তথা পদ্ভ্যাম্ প্যাণিভ্যাম্ উরসা ধিয়া ঈড়িতঃ।' ” শ্লোকটি সবটা বলে তার মানে বললেন।

পরের দিন সকালে খোঁজ করলেন, আমি আশ্রমের সব জায়গা দেখেছি কিনা। দেখিনি শুনে বললেন ঃ “ঘুরে আয়, দেখ সব কি রকম। আশ্রমের চারপাশ নিয়ে সবসুদ্ধু কত বিঘা জানিস?”

সারগাছিতে তিনদিন ছিলাম। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত উনি খোঁজ নিতেন আমাদের খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে। কতদূর থেকে মাছ আনিয়ে খাওয়ালেন।

*স্বামীজীর পত্রাবলীতে অন্তর্ভুক্ত ১৮৯৭ সালের ১৫ জুন তারিখের চিঠিটি সম্ভবত এই চিঠিটি।

বামুন ঠাকুরকে কাছে ডেকে কি কি রাঁধতে হবে এবং কেমনভাবে রাঁধতে হবে তা বল্লে দিতেন। তারপর জিজ্ঞেস করতেন, ঠিক পারবে কিনা। ভাল রাঁধলে বকশিশ দেবেন বললেন। খাওয়ার পর আবার রান্না ঠিক হয়েছে কিনা, কোথায় কি দোষ হয়েছে সব বুঝিয়ে বলতেন।

সারগাছি থেকে ফেরবার আগের দিন রাত্রে ১০টা থেকে প্রায় ১১টা পর্যন্ত মহারাজের সঙ্গে গল্প করলাম। ঠাকুরঘরের দিকে যেতে পথের পাশে জানালার ধারেই মাটিতে আমার বিছানা। রাত ১১টায় শোয়ার সময় জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে ভাল করে বন্ধ হলো না। দেখলাম জানলার খাঁজে একটা সাপ। সাপটাকে মারা হলো। আমরা বলাবলি করলাম যে, সাপের কথা শুনলে মহারাজ নার্ভাস হবেন। বাবা বললেন ঃ "কেউ যেন সাপের কথা ওঁকে না বলে।" পরের দিন সকালে আমি ভাবলাম, কেউ হয়তো ওঁকে বলে দিয়েছে। শুনে তিনি নিশ্চয় আমাকে ডেকে বিশেষভাবে খোঁজখবর নেবেন—ভয় পেয়েছি কিনা ইত্যাদি। না রাম না গঙ্গা! তিনি কিছু উচ্চবাচ্য করলেন না। কিছু শোনেননি, মনে হলো। আমি তাই একটু উল্লেখ করলাম। ইচ্ছা যে, ঘটনাটা ওকে বিস্তৃতভাবে ওকে শোনাই। উল্লেখ করা মাত্রই উনি খুব ক্যাজুয়ালি বললেন ঃ "হ্যাঁ শুনলাম। ও কিছুই নয়। ওসব বাজে সাপ। বলে—'চাটলে, চিতি, কামড়ালে বোড়া'। এতে ঘা-টা হয়। আমি ঐ বাড়িতে যখন ছিলাম তখন আমার ঐরকম (আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) খাটের পাশে আসত। ওসব কি এত গ্রাহ্য করলে চলে? ঠাকুর বলতেন, 'আমার কাছে যারা আসবে তারা চার হাত-পা ছেড়ে দিয়ে তালগাছের ওপর থেকে সোজা লাফিয়ে পড়বে। এইরকম সাহস থাকা চাই।' আমাদেরও সব ঐরকম।"

"একবার কাশীপুর বাগানে দোলের সময় ঠাকুর রয়েছেন। আমরা হোলি খেলে চান করতে যাব পুকুরে। শশী মহারাজ এবং অন্যান্য দু-একজন ঘাট দিয়ে নেমেছেন চান করতে। আমি আঘাটা দিয়ে নেমে যেমন ঝাঁপ মেরেছি অমনি একটা ভাঙা বোতলে পা কেটে ভয়ানক রক্ত বেরুতে লাগল। সেখানকার জল রাঙা হয়ে গেল। আমি তখন সেখান থেকেই মহা আনন্দে 'একদম লালে লাল হোগিয়া' বলে চেঁচাতে লাগলাম। একে হোলির দিন, চারদিকে আবিরে লাল আর আমার রক্তে পুকুরের জল লাল হয়ে গেল। কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।"

গঙ্গাধর মহারাজ বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলতে পছন্দ করতেন। আমরা যেদিন সারগাছি থেকে ফিরলাম তার আগের দিন ছিল আশ্বিন সংক্রান্তি এবং আকাশপ্রদীপ জ্বালাবার দিন। ওঁর সেটা খেয়াল নেই। তবু বিকেল থেকে লোক ডাকিয়ে, বাঁশ আনিয়ে নিজে বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে তদারক করে আকাশপ্রদীপ ওঠাচ্ছেন আর বলছেন ঃ "কাজটা এগিয়ে রাখা গেল। আর তো বেশি দেরি নেই—শীঘ্রই সংক্রান্তি। আলো দিতে হবে। আবার কি গোলযোগ হয়। আজ একবার আলো দিক, দেখুক ঠিক উঠছে কিনা, আবার আটকে-টাটকে যেতে পারে।" বিনোদবাবু ও মণি মহারাজ বললেন ঃ "আজই তো সংক্রান্তি।" তখন বললেন ঃ "দেখ তো! ভাগ্যিস আমি মনে করে করলাম, নইলে আরেকটু হলেই আজ হয়তো আর আলো দেওয়া হতো না।" তারপর আমায় পাঁজিটা আনতে বলে প্রদীপ তোলবার মন্ত্রটি দেখিয়ে পড়তে

বললেন। আমি আস্তে আস্তে পড়ে গেলাম। উনি রোয়াকে একটা চৌকিতে বসে হাতজোড় করে মন্ত্রটা বললেন।

আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, গঙ্গাধর মহারাজ আশ্রম পরিচালনা কেমন করতেন তাহলে আমি বলব, বিশৃঙ্খলার সাথে আশ্রম পরিচালনা হতো। কোন খাওয়ার সময়ের ঠিক ছিল না। কোনরকম খুঁটিনাটি নিয়মের মধ্যে যেতেন না। তখন জনা আষ্টেক অনাথ বালক ছিল। একদম ছোট ছোট। যেটা মনে রাখবার মতো সেটা হলো—তিনি বাবা তো বাবাই! এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার! অনাথ ছেলেদের কেউ তাঁর মাথায়, কেউ তাঁর ঘাড়ে চেপে থাকত। উনি নির্বিকার। একদম স্থির। একদিন ওদের মধ্যে কয়েকজনকে একজনের সাথে বেড়াতে যেতে দিলেন। যারা দুষ্ট তাদের বোঝাচ্ছেন ঃ "ওরা বেড়াতে যায় যাক, তোরা আমার সাথে যাবি!" ওরা তাতেই খুশি।

আমার এক ভগিনীপতি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে বড় কাজ করতেন। তিনি একসময় কৃষ্ণনগরে ছিলেন। তখন তো সারগাছি গরিব আশ্রম। তিনি কিছু কাঠ যোগাড় করে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের পর তিনি পাহাড়ের দিকে বদলি হন। গঙ্গাধর মহারাজ তখন তাঁকে বলেছিলেন ঃ "তুমি আমাকে নেপালী অনাথ ছেলে দিতে পার?" ভদ্রলোক পরে আমায় বলেছিলেন ঃ "See the fun! যে গরিব হবে সে তো নিজেই জায়গা খুঁজবে, এ যে দেখি উলটো!" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনাথ অনাথ করে স্বামী অখণ্ডানন্দ এত ব্যাকুল হতেন যে, একবার স্বয়ং স্বামীজী তাঁকে মজা করে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ "তোর দেখছি অনাথ ছেলের জন্য লাল গড়াচ্ছে!"

সারগাছিতে থাকার সময় একদিন বিকেলে আমি ও বাবা ওঁর কাছে গেছি, উনি বলছেন ঃ"আজ দুপুরে স্বপ্ন দেখেছি, যেন পুরনো বাড়িতে রয়েছি। কী বৃষ্টি! শরৎ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ আর নিরঞ্জন মহারাজ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) এসেছেন। আমরা ঘরের মধ্যে রয়েছি। এত যে বাইরে বৃষ্টি কিছুই টের পাইনি। খানিক পরে বাইরে বেরিয়ে দেখি ঐরকম বৃষ্টি। তখন আমি শরৎ মহারাজকে বললাম, 'ভাই, আমাদের কি বুদ্ধদেবের মতো অবস্থা হয়েছিল নাকি, কিছু টের পাইনি!' তারপর বাবুরাম মহারাজকে বললাম, 'ভাই, তোমার জন্য এই পেঁপেটি রেখেছি। খাও।' তিনি খেলেন।"

আরেকদিন ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী সম্বন্ধে মহারাজ বাবাকে বলছেন ঃ "এইসব হলো ইংরেজী চাল। ও আমাদের কখনো ছিল না। এক ঐ জন্মাষ্টমী আর রামনবমী। আর দোলপূর্ণিমা। তাছাড়া আর নেই। ওসব ওদেশ থেকে এসেছে। অবশ্য বুদ্ধপূর্ণিমা ছিল। এখন সব একধার থেকে জন্মোৎসব! আমি বলেছি, 'আমার কাছে ওসব চলবে না।' আমি শরৎ মহারাজকে একবার এই কথা বলেছিলাম, তাতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, ওরা এইরকম করে। শোনে না' আমি বললাম, 'ধমক দিলেই শুনবে।' সাতুকে (স্বামী অসিতানন্দ) বললাম—তা সে 'হ্যাঁ

হ্যাঁ করতে লাগল। সেবার হাজার টাকা খরচ করলে। আমাদের বলরাম-মন্দিরে একটা মিটিং-এ ঠিক হয়েছিল যে, শুধু ঠাকুর, মা আর স্বামীজীর জন্মোৎসব হবে। শুদ্ধানন্দ আবার এক কাঠি ওপরে যায়। সে বলে, 'এক ঠাকুরের থাক, আর সব তুলে দিন।' "

যখন বিহারে ভূমিকম্প-ত্রাণ চলছে তখন ঠাকুরের মন্দির সম্বন্ধে মহারাজ একদিন বলেছিলেন ঃ "এই দেখ না, সবাই বলে মন্দির করতে হবে। কী ভয়ানক কষ্ট লোকের দেখে এলাম! আমি তো ঐ দেখে খাওয়া ছেড়ে দিলাম। খেতে পারতাম না। মঠে এসেও খেতে পারিনি। আমি বললাম, 'সেন্টিনারী'তে একটা কাজ কর। যা টাকা পাবে একটা 'পার্মানেন্ট রিলিফ ফাণ্ড' কর।"

একদিন তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে খুব 'সিরিয়াস'ভাবে বললেন ঃ "বলরাম-মন্দিরে শুয়ে আছি। রাত্রে হঠাৎ দেখি—ঠাকুর! আমি তো তখনই বসে গেলুম (বাবু হয়ে বসেছিলেন—কোলে হাত-দুটো রেখে ধ্যানস্থ ভাব দেখালেন)।"

আরেকদিন বলছেন ঃ "আজকাল (মঠে) হয়েছে সব এইরকম করে (নিজে দেখিয়ে) গালে হাত দিয়ে বসা। তারপর পা নাচানো (পা নাচিয়ে)। ভারি খারাপ! গালে হাত দিলে বলে সব দুশ্চিন্তা আসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল খাবে, হয়তো চটিটা পায়ে রয়েছে—কোন খেয়াল নেই। ঠাকুর বলতেন, 'গালে হাত দিয়ে বসবি না, আর দাঁড়িয়ে জল খাবি না।' যেটা যেরকমভাবে করবার সেটা ঠিক সেরকমভাবে করতে হয়। বাব্-বাঃ! ঠাকুরের ওরকম দেখলে কী বকুনি! আরম্ভ হলো তো শেষ হবার নামটি নেই! আমি তো বাবা ঠাকুরের ঐগুলোই দেখি। সমাধি-টমাধি অনেক দূর। 'দিল্লী দূর হ্যায়!' দিল্লী এখনো অনেক দূর। একজন বলছে, 'দিল্লী কতদূর?' উত্তর এল—বাবা, এই তো সবে এখানে—দিল্লী এখনো অনেক দূর।' আগে এইসব সামলাও। এইসব ছোট কাজ আগে মন দিয়ে কর। ঠাকুরের কি রকম! দাঁতনকাঠি দেখেছেন অমনি মহারাজকে ডেকে বলছেন, 'রাখাল, রাখাল, কেমন সুন্দর দাঁতনকাঠি দেখ।' শশী মহারাজকে ঠাকুর বলেছিলেন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল খেলে কোষবৃদ্ধি হয়। দাঁড়িয়ে জল খাবি না। চটি পরে খাবি না। চটি খুলে বসে তারপর জল খাবি।' "

গঙ্গাধর মহারাজ একদিন নিজের দাড়ি রাখা সম্বন্ধে বললেন ঃ "আগে বাবা, আমাদের এত সব কোথায়? বেলুড়েই কাপড় জুটত না! বরানগর, আলমবাজারের কথা তো ছেড়ে দাও। বাইরে যেতে গেলে কাপড় পরা হতো। সবাই দাড়ি রাখত। নাপিতকে দেবার পয়সা কোথায়? ঠাকুরের দাড়ি ছিল। স্বামীজী বিলেত থেকে ফিরে সব বন্দোবস্ত করলেন। দাড়ি কামানোর জন্য বললেন। নইলে সাধুর তো চুল-দাড়ি থাকবেই। পশ্চিমাঞ্চলে দেখেছি, অনেক জায়গায় সাধুদের ভুরু, হাতের লোম সব সব কামানো। উদ্দেশ্য—বিশ্রী দেখাবে। তারপর আবার ছাই মাখবে।"

একবার বাবা অযোধ্যা যাবেন বলায় মহারাজ বলে দিলেন কোন্ কোন্ জায়গা আছে

দেখবার সেখানে। বললেন ঃ "একবার স্বামীজী বললেন, 'ভাই, তোমার হিমালয়ের সব জানা, চল তোমার সঙ্গে যাব।' আমার ইচ্ছা, ওঁকে একবার অযোধ্যা নিয়ে গিয়ে ঐসব জায়গা ও ওখানকার মঠ-টঠ দেখাই। ওঁকে বলায় উনি মোটেই রাজি হলেন না, বললেন, 'এখন না।' আমরা কাশী থেকে রওনা হলাম—আমি একেবারে অযোধ্যার টিকিট কিনে নিয়ে এলাম। স্বামীজী দেখেই একেবারে চটে লাল! সে যা রাগ! সারা পথে একটি কথা নেই। একেবারে গুম হয়ে বসে! তারপর ওখানে নেমে একটা এক্কায় যাচ্ছি—তখনো বেজায় রেগে আছেন। ওঁকে তামাক দেব বলে সঙ্গে হুঁকো নিয়েছিলাম। সেটাকে সামনে দেখে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে। ঐসব দেখে আমার তো মুখে কথাটা নেই। তারপর জানকীবর শরণের মঠে গিয়ে আমরা খেলাম। প্রকাণ্ড মঠ! অনেক সাধু রয়েছে। আমাদের সঙ্গেই খেলেন সবাই। স্বামীজী দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, 'দেখ, কি নিরভিমান! এরা ইচ্ছে করলে সোনার থালায় খেতে পারে।' সাধু দেখে তাঁর রাগ পড়ল। তারপর খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ ভাই, বেশ হয়েছে। এখানে তুমি আনলে বলে এঁদের দর্শন পেলাম।' "

একবার সারগাছি থেকে ফিরে আসবার আগের দিন বিকেলে মহারাজ বললেন ঃ"ঠাকুরের ভাব নিয়ে সব শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠবে—এইরকম মনে ছিল। স্বামীজীর যেমন ইচ্ছা ছিল university করা। একদিন ভাবলুম—কৈ ঠাকুর, এসব তো কিছু হচ্ছে না! তখন দেখিয়ে দিলেন—হচ্ছে। স্বামীজী বিলেত থেকে ফিরে বললেন, 'ভাই, ওদেশে কতকগুলো ছেলে দেখে এলাম। চমৎকার। খুব কাজের।' বললেন, 'ছেলেকয়টি একটি গ্রুপ করেছিল। ওরা এককালে অনেক কাজ করবে।' আমার তো মনে হয়, স্বামীজী কামাল পাশাদের কথা বলেছিলেন। তাঁদের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়েছিল।"

আমরা সারগাছি যাওয়ার কিছুদিন আগেই মহারাজ খুব হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। সে-কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ "ভয়ানক কষ্ট, প্রাণ বুঝি যায়! ভাবছি, কখন হার্ট বন্ধ হবে, আর ব্যস! আমি বলছি, 'ঠাকুর, তুমি ঠিক থেকো। আর সব যাক'।" (বাবু হয়ে বসে ডানহাতের তর্জনিটা সামনে দেখিয়ে।) একদিন শরীর সম্বন্ধে বললেন ঃ "আর গেলেই হয়। এখন আর কিছু ভাল লাগে না। ভায়েরা সব একে একে চলে গেল, আমরা জনা-তিনেক পড়ে রয়েছি।"

আরেকদিন মহারাজ বললেন ঃ "পরিব্রাজক অবস্থায় একজায়গায় গেছি। একটি সাধু পাহাড়ের গুহায় রয়েছেন। যেতেই হাতজোড় করে বললেন, 'আইয়ে মহাত্মা বিরাজিয়ে।' নিজের সরবৎটুকু খেতে দিলে। আমি ভাবলাম, এরা বেদান্তী নয়—কিন্তু কী চমৎকার ভাব! কোন সাম্প্রদায়িক ভাব নেই। সাধু দেখেছে আর অমনি অভ্যর্থনা, সেবা!"

অযোধ্যার একটি জায়গার নাম করে মহারাজ বললেন ঃ "গেছি। সেখানে জয় দেয়—'জয় রামকৃষ্ণ' বলে। 'রাম' মানে বলরাম আর কৃষ্ণ। আমার তো শুনে খুব আনন্দ হলো। বললাম, প্রভু, এমন নাম নিয়ে এসেছ যে, সবাই একধার থেকে ঐ নাম নিচ্ছে!"

(সংগ্রহ ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ) (উদ্বোধন ঃ ৯৯ বর্ষ ৫ সংখ্যা)

স্বামী অখণ্ডানন্দ

জনৈক ভক্ত

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ—জীবনব্যাপী সেবাব্রতী গঙ্গাধর মহারাজ গত ২৫ মাঘ শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে লীন হইয়াছেন। তাঁহার অবর্তমানে আজ অনেক কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়ে, প্রথম দর্শনের দিন তাঁহার ভাবগম্ভীর মুখখানি। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। কয়েক দিন পূর্বেই বিহারের ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। প্রলয়ঙ্করের প্রলয়নৃত্যে ক্ষণিকের মধ্যে হিমালয়ের পাদদেশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। অযুত নরনারী গৃহহারা—স্বজনহারা হইয়া হাহাকার করিতেছে। মনে হইল, মহাপ্রাণ মহারাজের হৃদয়ে তাহাদের সকল দুঃখ যেন আসিয়া জড় হইয়াছিল। সারাদিন তিনি আনমনা হইয়া থাকিতেন, বিষম দুঃখে তাঁহার প্রেমিক হৃদয় হাহাকার করিত।

তারপর ঐ বৎসর পূজার সময় গঙ্গাধর মহারাজের পুণ্য সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সেবার সারগাছিতে একে একে সকলে অসুখে পড়িতেছিলেন, কাজেই আনন্দময়ীর আগমনে আশ্রমে আনন্দের সাড়া পড়িল না। আশ্রমের নিরানন্দভাব দেখিয়া তিনি খুবই ব্যথিত হইলেন। শুধু আশ্রমের আভ্যন্তরীণ অশান্তি তাঁহাকে ব্যথিত করে নাই, দূরদূরান্তের দুর্ভিক্ষপীড়িত দুর্গতদের হাহাকার, তাঁহার কর্ণে অহরহ ধ্বনিত হইত। ঠাকুর যেন তাঁহাকে বলিতেন, যেমন তিনি বলিয়াছিলেন—

"ওরে তুই যে কাঙালের বন্ধু! দুর্ভিক্ষপীড়িত মহামারী পীড়িতদের সেবার জন্য তোকে এখানে রেখেছি। এ বছর চারদিকে দুঃখ দৈন্য হাহাকার অথচ তোর এমন সামর্থ্য নাই যে কিছু সাহায্য করিস। তুই কোন্ মুখে সকলের দুঃখের মধ্যে নিজের আনন্দ চাস? এ আনন্দ যে তোর সইবে না—সাজবে না।" সত্যই "কাঙালের বন্ধু" ইহাই গঙ্গাধর মহারাজের প্রধান পরিচয়।

পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ঘটক। জন্মস্থান আহিরীটোলা, কলিকাতা। বাল্যকাল হইতে খুব নিষ্ঠার সহিত গঙ্গাস্নান, গায়ত্রী জপ ও শাস্ত্রাভ্যাস করিতেন। বৈরাগ্যের প্রতি তাঁহার একটি প্রকৃতিগত অনুরাগ ছিল। পাঠ্যাবস্থায়ই কোন সাধুর সহিত কিছুকালের জন্য তিনি তাঁহাদের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যান। পরে ফিরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গলাভে দ্বিগুণ উৎসাহে ধর্মজীবন গঠনে মনোযোগ দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার আগ্রহ, নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং আপনার হাতে তাঁহাকে গড়িতে থাকেন।

১৮৮৬ সালে ঠাকুরের অন্তর্ধানে গঙ্গাধর মহারাজ খুবই বিচলিত হইলেন। ঠাকুরকে হারাইয়া সে সময় তাঁহার ও স্বামীজি প্রমুখ সকলের মনে অপূর্ব বৈরাগ্য দেখা দিয়াছিল। বরাহনগরের জীর্ণ কুটীরে দিনের পর দিন ধ্যান জপ চলিতে লাগিল। সে কি কঠোর তপস্যা! কিন্তু গঙ্গাধর মহারাজের তাহাতেও মন ভরিল না। ঠাকুরকে তখনই সাক্ষাৎ করিতে হইবে, প্রাণের একান্ত আকুলতায় তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। হিমালয়ের দুর্গম তীর্থগুলি, হরিদ্বার, কেদার ও পঞ্চপ্রয়াগ পার হইয়া ১৭/১৮ বৎসরের বাঙালী বালক হিমালয়ের পরপারে চলিয়া গেলেন—কঠোর তপস্যার জন্য। ভগবানের জন্য কতখানি আগ্রহ জন্মিলে, বুকে কতখানি সাহস থাকিলে এ কাজ সম্ভব তাহা ভাবিবার বিষয়! মানস সরোবর দর্শন করিয়া তিব্বতের দিকে তিনি চলিয়া যান। হিমালয় ও তিব্বত ভ্রমণের নানা কাহিনী 'তিব্বতে তিন বৎসর' প্রবন্ধে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তিব্বত হইতে তিনি ফিরিলেন। মনে অপূর্ব আনন্দ। ধ্যান-জপ, নির্জন সাধনা, শাস্ত্রপাঠে দিন কাটিতে লাগিল। মোক্ষ লাভের প্রবল বাসনা এতদিন তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছিল কিন্তু এবার ধীরে ধীরে লোককল্যাণের মহান্ ভাব আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল। রাজপুতানার জনসাধারণের মধ্যে অজ্ঞতা দেখিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বাসনা তাঁহার মনে জাগিল। ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনিও এবিষয়ে তাঁহার আগ্রহ এবং অনুজ্ঞা জানাইলেন। কাজ আরম্ভ হইল। উদয়পুরে ভীলগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, খেতড়িরাজ্যে বেদ বিদ্যালয় স্থাপন এবং প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচলনের জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পরে বরাহনগর ও আলমবাজার অবস্থান কালেও জনসেবার দিকে তিনি আকৃষ্ট হন। স্থানীয় বহু কলেরা রোগী তাঁহার সেবা পাইয়া পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিল। এইরূপ এক রোগীর (সর্পদষ্ট) ঔষধ আনিতে গিয়া তিনি আর ফিরিলেন না। ঔষধ লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া তিনি গঙ্গার তীর ধরিয়া উত্তর মুখে চলিলেন। বোধ করি, নিঃসঙ্গ ভ্রমণের বাসনা তাঁহার মনে আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। কাটোয়া নবদ্বীপ প্রভৃতি পার হইয়া মুর্শিদাবাদের মহুলা অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার নিকট একদল বুভুক্ষু বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে খাদ্যের জন্য জড়াইয়া ধরিল। কাছে যাহা ছিল (তিন আনা বোধ হয়) তাহা দ্বারা তিনি মুড়িমুড়কি কিনিয়া তাহাদিগকে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার সম্মুখে কয়েকটি শব দাহ করা হইল। বুঝিতে বাকি রহিল না যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীই ইহার কারণ।

মহাপ্রাণ সাধকের আর যাওয়া হইল না। স্বামীজীকে সাহায্যের জন্য পত্র লিখিয়া নিজেই দুস্থ রোগীদের সেবা আরম্ভ করিয়া দিলেন, ক্রমে ভালোভাবে সেবাকার্য আরম্ভ হইল। আজ যে বিশাল মহীরুহের ছায়ায় আসিয়া সমগ্র ভারত দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারীর রুদ্র-তাপ দূর করিতেছে,

তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইল এইরূপে। ইহার পর অর্ধশতাব্দী ধরিয়া এই সেবাকার্যে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। এই জনমানবের সেবাতেই তিলে তিলে তিনি জীবনপাত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের "শিব জ্ঞানে জীব সেবা" উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের মহুলা ও পাঁচদা প্রভৃতিতে বন্যায়, ভাবদার প্লেগে, ভাগলপুরের প্লাবনে তাঁহার অক্লান্ত সেবা, সারগাছি অনাথ আশ্রমের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমের কথা ভাবিলে এ-কথার সত্যতা কতকটা উপলব্ধি করা যায়।

শরীরের দিকে তাঁহার মোটেই লক্ষ্য ছিল না। মুখে বলিতেন, "শরীর খারাপ—সাবধান হয়ে থাকব" কিন্তু কাজের সময় সারগাছির ক্ষুদ্র ঘরোয়া ব্যাপারও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ তিনি, ইচ্ছা করিলে মঠে আসিয়া থাকিতে পারিতেন এবং সেজন্য বারবার তাঁহাকে অনুরোধও করা হইয়াছিল। তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইলে সন্ন্যাসী গৃহস্থ অনেকেই আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন, কিন্তু পল্লীর অবজ্ঞাত, অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি তাঁহার এমন দরদ ছিল যে, তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলেন না। তিনি প্রস্তুত ছিলেন পল্লীর দুর্গতদের জন্য তাঁহার জীবন বলি দিতে। জীবনের পূর্বাহ্ণে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

"যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়েও জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র। যে এই মহাসন্ধিক্ষণের সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বহন করবে সেই আমার ভাই—সেই তাঁর ছেলে। এই পরীক্ষা—যে রামকৃষ্ণের ছেলে সে আপনার ভাল চায় না। প্রাণত্যাগ হ'লেও পরের কল্যাণকাঙ্ক্ষী তারা।" বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একথা তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল। দেশের দুঃখ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা তাঁহাকে বিষম ব্যথিত করিত। তাই তিনি তাঁহার ভক্তদের মধ্যে বিলাসিতা, আরামপ্রিয়তা দেখিতে পারিতেন না। সকলেই দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় অনুপ্রাণিত হয়, এই তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা ছিল। জীবন-গঠনের জন্য কঠোরতার দরকার আছে, একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন এবং সারাজীবন কার্যত তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। যাঁহাদিগকে তিনি ভালবাসিতেন, নানা কঠোরতার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে গড়িবার প্রয়াস তিনি সর্বদা করিতেন। এজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে খুবই কঠোর হইতে দেখা যাইত।

কিন্তু একটা অতুলনীয় কোমলতা ও সরলতা তাঁহার হৃদয়-মনকে মধুময় করিয়া রাখিত। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি"—কথাটির সার্থকতা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি। শিষ্যের চরিত্রগঠনে, শিক্ষাদানে তাঁহাকে যেমন কঠোর দেখা যাইত, ভক্তের আকুলতার নিকট, দীনদুঃখীর ব্যথার নিকট তিনি তেমনি কোমল হইয়া পড়িতেন। ভক্তের জীবন গঠন উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—"আশীর্বাদে কি চিঁড়ে ভিজে বাপ, পরিশ্রম করতে হবে। ক্ষমা টমা আমার

কাছে কিছু নাই, দোষ করলে শাস্তি!" আবার একান্ত আকুল, ভীত বালককে অভয় দিয়া বলিতেন—"আমার কাছে যখন এসেছিস তখন ভয় কি?"

বালকভাব শেষ পর্যন্ত তাঁহার মধ্যে দেখা গিয়াছে। অভিমান অহঙ্কারের লেশমাত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া বালকের মতো জেদ, স্বাস্থ্য-প্রতিকূল আহারবিশেষের প্রতি আগ্রহ এবং পাছে সেবক জানিতে পারেন সেজন্য ভয়, এই কয়েকদিন আগেও দেখা যাইত। সকলের সঙ্গে বালকের মতো প্রাণখোলা হাসি তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। গম্ভীর হইয়া শাসন করিতেছেন, এমন সময় হাসির কথা উঠিল, তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ব্যস্, হাসিই চলিল। সারগাছি আশ্রমে তাঁহার কত ছেলেখেলা চলিত! এই ১৩৪৩ সালের নববর্ষের দিন তিনি "তিব্বতী বাবা" সাজিলেন। পরিধানে কৌপীন, হাতে লাঠি, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষমালা। আশ্রমসুদ্ধ সকলের সহিত দেখা করিতেছেন আর বলিতেছেন, "হাম বহুদূরসে আয়া—তিব্বত সে", আরও কত কি!

ঠাকুর এই আপনভোলা বালককে যে কি চক্ষে দেখিতেন, ভক্তি বিশ্বাসহীন আমি তাহা কি করিয়া বলিব? নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে যেন ঠাকুরের দয়া তিনি অনুভব করিতেন! ঠাকুরের কথা প্রায়ই বলিতেন না কিন্তু যখন বলিতেন, তখন ভাবের ফোয়ারা ছুটিত। মন্দির হইবে শুনিয়া কত আনন্দ! শ্রদ্ধেয়া অন্নপূর্ণা, ভক্তি প্রভৃতিকে (আমেরিকার মহিলা ভক্ত) লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"ঠাকুরের আশিস্ যেন শ্রাবণের ধারার মতো ওদের কথায় ঝরছে।" তাঁহার গুরু ভক্তির তুলনা ছিল না। বর্তমান শিষ্যদের গুরুভক্তি-প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—"ঠাকুর যদি আমাদের বলতেন, হাঁ-কর বাঘ্যে করব, আমরা হাঁ করতাম।" গুরুর প্রতি এমন শ্রদ্ধা তাঁহার ছিল! ঠাকুরের ছবি বাজে বই বা কাগজের উপরে দেখিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। বলিতেন—"ঠাকুরের ছবি ওসবে না ছাপালে কি চলে না? কোথায় যে গিয়ে পড়বে।" ছবির মধ্যে তিনি সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখিতেন, তাই ইহার অসদ্ব্যবহার আশঙ্কায় ঐরূপ কথা বলিতেন।

স্বামীজি যেন তাঁহার অন্তরের ধন ছিলেন। স্বামীজির কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ্ঞা বলিয়া তিনি সারাজীবন পালন করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজীর কথা বলিতে তিনি খুবই আনন্দ পাইতেন। স্বামীজিও তাঁহাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। গঙ্গা, Ganges প্রভৃতি আদরের নাম তাঁহারই দেওয়া। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ অন্যান্য সকল গুরুভায়ের প্রতি তাঁহার অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধনে তাঁহারা আবদ্ধ ছিলেন তাহা এ জগতে দুর্লভ।

বালক ও ছাত্রগণ ছিল তাঁহার পরম আত্মীয়। ঠাকুরের কথায় তিনি বলিতেন, "আমি বালকদের ভালবাসি কেন জান?" আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও দিতেন। সরল, অনাড়ম্বর দেখিলে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইতেন। আশ্রমের ছেলেরা তাঁহার প্রাণ ছিল। তিনি শুধু ধর্ম-উপদেশ দিতেন

না, সাধারণ অনেক বিষয়ও তিনি বলিতেন। আয়নাটি কেমন করিয়া রাখিতে হয়, কথার সঙ্গে 'যে আজ্ঞা' কেমন করিয়া বলিতে হয়, এসকল কথাও তিনি শিখাইতেন। পড়াশুনার জন্য তাঁহার নিকট খুবই উৎসাহ পাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে পরীক্ষাও দিতে হইত। ইতিহাস, স্বামীজীর গ্রন্থাবলী, দেবদেবীর স্তোত্র আয়ত্ত করিতে তিনি প্রায়ই আদেশ করিতেন।

মেয়েরাও তাঁহার অনেক ভালবাসা ও স্নেহ পাইয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, "মেয়েরা খুব ভক্তিমতী হয়।"

অসংখ্য ভক্তের হৃদয়ের ধন গঙ্গাধর মহারাজ আজ স্থূলচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। বড়ই দুঃখ ও ব্যথায় হৃদয় গুমরিয়া উঠিতেছে। সেই স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ, আশিস ও অভয়বাণী আর স্থূল কর্ণে শুনিব না। সে সৌম্য বরবপুখানি আর এ চক্ষে দেখিব না। কিন্তু সেজন্য শোক করিলে চলিবে না। আজ ভাল করিয়া মনে করিতে হইবে—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীস্তত্র ন মুহ্যতি।।" (গীতা, ২।১৩)

দেহের বিভিন্ন অবস্থার মতো মৃত্যুও আর এক অবস্থা। যে কাজের জন্য তিনি আসিয়াছিলেন তাহা শেষ করিয়া আবার ঠাকুরের নিকট চলিয়া গিয়াছেন। কাজেই দুঃখ করিবার কিছুই নাই। তবে অকস্মাৎ বিরহে অজ্ঞান মন অস্থির হয় সত্য কিন্তু শুধু অশ্রু বিসর্জন যেন ভক্তি ও আন্তরিকতায় শেষ না হয়। তাঁহার প্রাণের বাসনা ছিল, আমরা মানুষ হই—দেবত্ব লাভ করি। আজ যদি আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত হয় সত্য জীবন গঠনে, তাঁহারই আদর্শকে জীবনে রূপ দিতে যদি আমরা আগ্রহান্বিত হই, তবেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—আমাদের মধ্যে তিনি আবার দেখা দিবেন। তাঁহার আদর্শ "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়" আজ আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে এবং যেন বলিতেছে—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

আসুন, আমরা শিববোধে-জীবসেবা ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাকে সার্থক করিয়া তুলি।

(উদ্বোধন ঃ ৩৯ বর্ষ ৩ সংখ্যা)

মধুর স্মৃতি

শ্রী—

পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের নিকট মঠে শুনেছি, "আমাদের ঠাকুরের উপর কি রকম ভক্তি ছিল জান? যদি তিনি বলতেন, হাঁ কর, আমি হাগ্‌বো, তো আমরা মুখ হাঁ করে দিতে পাত্তাম।"

দাদার শিষ্য বলে তিনি কত স্নেহই না করতেন! একদিন তিনি এক গল্প বলেছিলেন—"সারগাছি আশ্রমে স্বামীজির জন্মতিথি পূজা। ধারণা আছে বাক্সে নিশ্চয়ই আস্ত নতুন কাপড় আছে, তাই পরে পূজা করবো। স্নান করে বাক্স খুলে দেখি কাপড় নেই। আধখানা কাপড় পরে কি করে পূজা করি ভাবছি ও স্বামীজীকে বলছি—একখানা কাপড়ও নেই যে তাই পরে তোমায় পূজা করি। যাক্ কাপড়ের দরকার নেই, আমরা তো সাধু, উলঙ্গ হয়েই পূজা করবো। এই ভেবে যেমন উলঙ্গ হতে যাচ্ছি, অমনি একজন এসে বললে—একটা পার্শেল এসেছে। পার্শেল খুলে দেখি একখানা নতুন গেরুয়া কাপড় ও চাদর। গঙ্গাজল দিয়ে নিয়ে তাই পরে তো পূজা করলুম। এমন সময় স্বামীজীর বাণী শুনতে পেলুম, তিনি বলছেন—"দেখ, আমি এমন বিরাট, সর্বব্যাপক ও সর্বজ্ঞ, তোর এই অবস্থা হবে জেনে আমি আগে থাকতেই তোর কাপড়ের ব্যবস্থা করে রেখেছি। আজ যদি আমি বেলুড় মঠে থাকতুম, ও তোর কাপড়ের দরকার হলে তুই আমাকে চিঠি লিখতিস, তারপর যদি আমি খোসমেজাজে থাকতুম তো তোকে কাপড় পাঠাতুম, আর না হয় তো পাঠাতুম না।" আর একবার স্বামীজীর এক vision দেখা সম্বন্ধে বলেছিলেন, "স্বামীজীকে মুসলমান দরবেশের বেশে দেখলুম ও সঙ্গে কয়েকজন মুসলমান চেলা। আমি জিজ্ঞেস কল্লুম—"এ কি রকম ব্যাপার?" তিনি বললেন, "মুসলমানদের দেশে কাজ করা হয় নি, আমি এখন সূক্ষ্মদেহে মুসলমানদের দেশে কাজ কচ্ছি। এদের ভক্তির তুলনা হয় না, এদের দৃঢ়তাও সকলের চেয়ে বেশি। এই দেখ, এত দূর থেকে এরা গঙ্গাস্নান করতে এসেছে। এদের গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা করে দিতে পারিস?" আমি ত ব্যবস্থা করে দিলুম। কিন্তু তাদের এত ভক্তি যে গঙ্গার ধারে গিয়ে সব সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে লাগল ও বলতে লাগল—এ পবিত্র জলে কি করে পা দেব? তারপর স্বামিজীর আদেশে তাদিগকে প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করলুম।

(উদ্বোধন ঃ ৪৮ বর্ষ ৫ সংখ্যা)

পুণ্য স্মৃতি

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ-স্বামীকে আমি প্রথম দর্শন করি ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে, আলমবাজার মঠে। তাঁর সরল বালকের মতো ব্যবহার ও কথাবার্তা—তাহাকে লইয়া গুরুভ্রাতাদের হাসি ও আনন্দ করা, এবং সেই আনন্দে তাঁহার সানন্দচিত্তে যোগদান দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম; বিশেষ মুগ্ধ করিত তার অপূর্ব সরলতা—সাধারণ মানুষে যা দুলর্ভ। তিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন, লামার মতন পোশাক-পরা দেখিয়া ইংরেজ রাজপুরুষেরা গুপ্তচর মনে করিয়া কাশ্মীরে তাঁহাকে আটক বন্দী রাখে—এই সকল কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, পরে কথাবার্তায় আলাপ আলোচনায় তাহার কিছু কিছু আমাদের কাছে তিনি আরও বলিতেন।

তাঁহার ভ্রমণকাহিনী যখন তিনি বর্ণনা করিতেন তখন তাহার ছবি শ্রোতার হৃদয়ে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইত—তাঁহার কথা বলার এইটি ছিল বৈশিষ্ট্য। কখনও কখনও তাঁহার নিকট উপনিষদের আবৃত্তি শুনিতাম, বাংলাদেশে বেদ-প্রচারের জন্য তিনি আগ্রহশীল ও উৎসাহী ছিলেন। কি আলমবাজার মঠে, কি বলরাম মন্দিরে সেই সময় পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ও শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইত। তাঁহার মুখে স্বামীজীর জীবনকাহিনী, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার কি অপূর্ব অনুরাগ ও আকর্ষণ এবং ঠাকুরও স্বামীজীকে কিরূপ অনির্বচনীয় প্রেমে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, সেই সব কথা এবং তাহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা ও গভীর ভাবপূর্ণ আচরণের কথা আমরা তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনিতাম।

মুর্শিদাবাদে মহুলা গ্রামে স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন দুর্ভিক্ষমোচন-কার্যে ব্যাপৃত হন, তাহার কয়েকদিন পূর্বে—১ মে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীজী দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় আসিয়াই বলরাম-মন্দিরে এতদুদ্দেশ্যে সভা আহ্বান করেন। ১৫ মে মহুলায় স্বামীজীর প্রদত্ত ১৫০্ টাকা ও তাঁহার প্রেরিত দুইজন সেবক লইয়া দুর্ভিক্ষ-মোচন-কার্য আরম্ভ হয়। গোড়া হইতেই আমি মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে যোগ দিতাম। স্বর্গীয় চারুচন্দ্র বসু মহাশয় স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, অনাগারিক ধর্মপাল মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিলে তিনি তাহার সদস্য হন; এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। মিশনের অধিবেশন শেষ হইলে আমরা পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ মহারাজদ্বয়ের নিকট বসিয়া তাঁহাদের আলাপ আলোচনা ও উপদেশ শুনিতাম। একদিন অর্থাৎ তিন চারটি অধিবেশনের পরেই শ্রীশ্রীমহারাজ মুর্শিদাবাদের

দুর্ভিক্ষ ও অখণ্ডানন্দ মহারাজের কথা উত্থাপন করিলে চারুবাবু বলিয়া উঠিলেন যে, তিনি ধর্মপালকে বলিয়া মহাবোধি সোসাইটি হইতে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ চারুবাবুকে এই বিষয়ে অবিলম্বে চেষ্টা করিতে বলিলেন। মিশনের অন্যান্য সভ্যেরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া যদি এই বিষয়ে সাহায্য করেন তবে ইহা মিশনের উত্তম কার্য হইবে বলিয়া মহারাজ মত প্রকাশ করিলেন। সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম এবং চারুবাবুর সঙ্গেও আমার এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়। তাঁহার বাড়িটি আমাদের বাসভবনের সন্নিকটেই ছিল। এই কার্যে সহায়তার জন্য স্বামীজী শ্রীশ্রীমহারাজকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেন এবং কার্য সম্বন্ধে পত্রের দ্বারা তিনি সকল সংবাদ লইতেন। এই বিষয়ে স্বামীজী ও মহারাজ উভয়ে নানা উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিতেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দ-প্রবর্তিত দুর্ভিক্ষমোচন-কার্য রামকৃষ্ণ মিশনকে সরকারের এবং জনসাধারণের নিকট লোক-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচিত করে। বলিতে কি প্রথম প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যপ্রণালী দুর্ভিক্ষমোচনেই প্রধানত পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে স্বামী অখণ্ডানন্দই সর্বপ্রথম সেবাধর্মকে বাস্তবভাবে রূপায়িত করিয়াছিলেন।

একবার রামকৃষ্ণ মিশনের অধিবেশনে স্বামী অখণ্ডানন্দ সেবাধর্ম সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষণে একটি গল্প বলিয়াছিলেন, তাহা আমার আজও মনে আছে। একজন রাজা—মন্ত্রী এবং সেনাপতির ষড়যন্ত্রে রাজ্যহারা হন। রাজা ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেন। একদিন ভিক্ষায় তিনি কিছু পান নাই। নদীতীরে বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া নির্জনে ভগবৎচিন্তা করিতেছিলেন—কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় কিছুতেই মনকে সম্পূর্ণভাবে ভগবদ্-ধ্যানে নিমগ্ন করিতে পারেন নাই। জলপান করিয়া তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই। এমন সময় বৃক্ষ হইতে একটি সুপক্ক বেল তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইল। তিনি যেই উহা ভাঙিয়া খাইতে যাইবেন—এমন সময় একজন কুষ্ঠরোগী রাজার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। সেও কয়েকদিন উপবাসী রহিয়াছে বলিয়া রাজাকে জানাইল। ক্ষুধার কি ক্লেশ রাজা তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। তিনি অতি প্রীতির সহিত অগ্রে ঐ বেলটির অর্ধাংশ কুষ্ঠরোগীকে দিলেন। পরমানন্দে সে তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। কিন্তু বিস্মিত রাজা দেখিলেন—তাঁহার ইষ্টদেবতা সশরীরে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। রাজা অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন, এমন সময় শুনিলেন তাঁহার ইষ্টদেবতা বলিতেছেন ঃ "আমি তোমাকে রাজ্যহারা করিয়াছি—ঘোর দুর্দশায় ফেলিয়াছি এবং কুষ্ঠরোগীরূপে তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছি। যে ক্ষুধার্তকে আহার দেয়, রুগ্নকে সেবা করে—দুঃখীর দুর্দশা মোচন করিতে চেষ্টা করে সেই আমার যথার্থ সেবা করে, প্রকৃত উপাসনা করে। এইরূপ সেবা আমিই লইয়া থাকি। যাহারা আমাকে এইসব আর্ত বুভুক্ষু দুঃখীর মধ্যে দেখিতে পায় না তাহারা আমার যথার্থ সেবা জানে না। তুমি যে প্রেমভরে নিরভিমান হইয়া অনন্ত ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া কুষ্ঠরোগীকে যত্ন করিয়া নিজ খাদ্যের অর্ধাংশ

দিয়াছ—তাহাতেই আমি তুষ্ট হইয়া তোমার ইষ্টদেবতার রূপে তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছি।" এই বলিয়া শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলেন। আশ্চর্য, সেই সময় মন্ত্রী ও সেনাপতি অনুতপ্ত-হৃদয়ে রাজাকে সিংহাসনে বসাইতে আসিলেন। কিন্তু রাজা আজ যে অপূর্ব আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া আবার বিষয় গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তিনি লোক-সেবায় অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিলেন। রাজ-সিংহাসন তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইল।

পূজ্যপাদ স্বামীজী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে নীলাম্বরবাবুর বাগানে বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। একটি এক মন ওজনের প্রকাণ্ড লেডিকেনি বা পানতুয়া আর একটি প্রায় সেইরূপ ওজনের শাঁকালু লইয়া আসিয়াছিলেন। স্বামীজী এবং উপস্থিত সকলেই উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আমরাও সেদিন প্রসাদে উক্ত দুইটি দ্রব্যের অংশ পাইয়াছিলাম।

একদিন স্বামী অখণ্ডানন্দ বলরাম-মন্দির হইতে বাহির হইতেছেন, ঠিক সেই সময় আমি উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি আমাকে বলিলেন, "চল আমার সঙ্গে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ, আপনি কোথায় যাইতেছেন?" তিনি বলিলেন, "বাদুড় বাগানে অনাথ-আশ্রম দেখিতে।" আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম। স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ দত্ত উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া অনাথ বালকদের সেবা করিতেন। আশ্রমের বালকদের কিভাবে শিক্ষা দেন ও লালনপালন করেন—তাহা মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "আপনি উত্তম কাজ করিতেছেন—ইহাই যথার্থ ভগবানের সেবা। আমাদের সমাজে কত অনাথ বালক রাস্তায় রাস্তায় পড়িয়া আছে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহা কেহ একবার চক্ষু মেলিয়া দেখে না। দেখুন, খ্রীস্টান মিশনারীরা এই সব অনাথদের লইয়া আশ্রম খুলিয়াছে এবং প্রতি বৎসর তাহাদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করিতেছে। এইরূপে আমাদের সমাজ দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে।" প্রাণকৃষ্ণবাবু ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া উভয়ে যে অনাথ-আশ্রমটি গড়িয়া তুলিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। আশ্রম হইতে বাহির হইয়া তিনি আমার নিকট ইঁহাদের উদারতা এবং পরার্থপরতার কথা বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম অনাথ বালকদের জন্য তাঁহারও অন্তর কিরূপ ব্যথিত।

কয়েক বৎসর পরে আমি মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুরে যাই। তথায় দেখিলাম তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ নানা মিথ্যা কথা রটনা করিতেছে। স্থানীয় সংবাদপত্রেও কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় জঙ্গীপুরে আসেন—তাঁহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল এবং তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমি তাঁহার নিকট স্বামী অখণ্ডানন্দের কথা তুলিলাম। তিনি বলিলেন, "ভাল কাজ করিতে গেলে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা নানা মিথ্যা রটনা করে। তাহার উপর তিনি গ্রামে গিয়া কাজ করেন। দুর্ভিক্ষে তিনি কত লোককে সাহায্য করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে অনেক নিমকহারাম ব্যক্তি স্বামীজীকে গ্রাম হইতে সরাইবার চেষ্টায়

আছে। আমি তাঁর সম্বন্ধে সবই জানি—এইরূপ নিঃস্বার্থ উদার পরহিতব্রতী সন্ন্যাসী আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। আমি স্থানীয় কাগজওয়ালাদের সাবধান করিয়া দিয়াছি। স্বামীজী প্রায়ই আমার বাড়িতে আসেন। তাঁর পিছনে যারা লাগিয়াছে তারা সবাই স্বার্থপর নীচ লোক। স্বামীজীর কোন অনিষ্ট করিবার সাধ্য তাদের নাই। মুর্শিদাবাদের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহাকে ভাল করিয়াই জানে—সবাই তাহাকে ভক্তি করে।"

পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠবাবু অখণ্ডানন্দস্বামীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে বলিলেন, "দেখ—গ্রাম্য লোকেরা পুকুর-ডোবা কি রকম নোংরা রাখে। পুকুরের পাড় তো সাধারণ লোকের পায়খানা, আর পুকুরেই শৌচাদি করে। স্বামী অখণ্ডানন্দ একদিন গ্রামবাসীদের বলেন, 'এই পুকুরের জল নিয়ে তোমরা রান্নাবান্না কর—পান কর, আর সেই জলকে এই রকম নোংরা করছ।' এই কথায় কতক লোক তাঁর বিরুদ্ধে দল বাঁধে, লজ্জাশীলতার হানি করা হয়েছে বলে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানায়, আর স্থানীয় কোন কোন কাগজে নানা মিথ্যা কথা ছাপায়। ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ রাজ পুরুষেরা সকলেই তাঁকে ভক্তি করেন—তাঁরা সকলেই তাঁর সাধু চরিত্র ও নিষ্কাম সেবায় মুগ্ধ। সুতরাং ওরা অনিষ্ট তো করতেই পারেনি, পরন্তু 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী'তে-কয়েকটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁর নিঃস্বার্থ সেবা ও আদর্শ চরিত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ঐসব হীন ব্যক্তিরা আমাদের কাছেও এসেছিল—কিন্তু বকুনি খেয়ে পালিয়ে যায়।" গ্রামোন্নতির কাজে ইনিই সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।

লালগোলার স্বনামধন্য বদান্যবর স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তিনি আমাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি তথায় গিয়া তাঁহার অতিথিভবনে থাকি—সেখানে বৈকুণ্ঠবাবুও ছিলেন এবং উহার অপরাংশে কয়েকটি অনাথ বালক লইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ ছিলেন। অনাথ বালকদের মধ্যে কয়েকটি গুর্খা বালকও ছিল। দেখিলাম মহারাজই তাঁহাদের পিতামাতার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। লালগোলার মহারাজ তখন 'রাও সাহেব' ছিলেন—তাহার অনেক পরে 'মহারাজ' উপাধি সরকার হইতে পান। তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার মুখেই শুনিলাম যে লালগোলার মহারাজ এই অনাথ বালকদের অনেক সাহায্য করিয়াছেন। মহারাজ অনাথ বালকদের তথায় আনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—তাই তিনি ছেলেদের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। প্রাতঃকালে ছেলেদের মুখে স্তোত্র পাঠ শুনিয়া ও তাহাদের শান্ত স্বভাব এবং হাস্যানন দেখিয়া সকলেই আনন্দলাভ করিতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দও জাতিবর্ণধর্ম-নির্বিশেষে অনাথ বালক লইয়া আশ্রমকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি আমাকে তখন বলিয়াছিলেন—স্কুলে লেখাপড়া, কিছু কারিগরি শিল্প-শিক্ষা আর প্রাথমিক বিজ্ঞান শিখিবার জন্য কিছু সাজ-সরঞ্জাম থাকবে। আশ্রমে হিন্দু মুসলমান অনাথ বালক থাকবে—ভজন-মন্দিরে তারা নিজের নিজের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে।

অনাথআশ্রমে শিক্ষাপ্রচার, কারিগরি কাজ, কুটীর-শিল্প-শিক্ষা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও ভাব যাহাতে বাল্যকাল হইতে তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়—ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। ভাবতা মহুলায় যখন তিনি অনাথাশ্রমের প্রথম উদ্যোগ করেন তখন 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র স্তম্ভে অনাথাশ্রমের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য আবেদন প্রকাশিত হইত। মাঝে মাঝে কোন কোন দর্শক অখণ্ডানন্দ স্বামী-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র অনাথাশ্রমের কার্যপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ইংরেজী দৈনিক 'মিরর' ও বাংলা 'বসুমতী' প্রভৃতি সংবাদপত্রে শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ আদেশ পাইয়াই তিনি মুর্শিদাবাদ অঞ্চল ত্যাগ করেন নাই। কতবার দেখিয়াছি পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাকে মঠে আসিয়া থাকিতে বলিয়াছেন, কারণ কঠোর পরিশ্রমে, অস্বাস্থ্যকর ম্যালেরিয়া-প্রবণ গ্রামে একাদিক্রমে বাস করিয়া এবং আহারাদি সময়মত না করায় দিন দিন তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছিল। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ঐখানেই ছিলেন; আমাকে তিনি একদিন বলেন, "তুমি সারগাছি আশ্রমে যাওনি—কি সুন্দর স্থান—চারদিকে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর, আর সুজলা সুফলা জমি—গাছপালা ফলফুলে কি মনোরম!" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মহারাজ, গঙ্গাতীরে এই বেলুড় মঠও কত সুন্দর, চারদিকে ফলফুলের গাছ দিয়ে মহারাজ কত যত্নে সাজিয়েছেন। আমাদের তো এখানে এলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "সারগাছিতে এলে আরো প্রাণ জুড়াবে। সেখানে কলের চিমনির ধোঁয়া নেই—শহরের গোলমাল নেই—নির্জন নিস্তব্ধ। সাধনভজনের পক্ষে খুব চমৎকার স্থান। তুমি যদি যাও তো ভুলতে পারবে না।" আমি নিরুত্তর রহিলাম। তারপর তিনি বলিলেন, "এ-ও খুব ভাল স্থান—স্বামীজী এর প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজা মহারাজ এর কত যত্ন করেছেন—ফলফুলের নানাবিধ গাছ এনে সাজিয়েছেন। কলকাতা শহরের হট্টগোলের চেয়ে খুব ভাল। এতগুলি সাধু-ব্রহ্মচারী রয়েছেন, এঁদের সমবেত ধ্যান-ধারণা ও তপস্যায় জায়গাটি পবিত্র তীর্থ হয়ে গিয়েছে। তবে এখানে জল তত ভাল নয়, আমার শরীর সারগাছিতে ভাল থাকবে। সে জায়গাও কলকাতার নিকটে। কয়েক ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়। তুমি একবার যেও।"

তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসুমতীতে আমার যে লেখা বেরুচ্ছে তা পড়েছ?" আমি উত্তরে বলিলাম, "আজ্ঞে না, আপনি যে বসুমতীতে লিখছেন—তা তো আমি জানি না। উদ্বোধনে আপনার যা লেখা বেরিয়েছিল তা পড়েছি।" তিনি বলিলেন, "বসুমতীতে আমার স্মৃতিকথা লিখছি—তাতে অনেক পুরানো কথা জানতে পারবে।" আমি বলিলাম, "মহারাজ, আপনার তিব্বত ভ্রমণ অসমাপ্ত হয়ে রয়েছে। ঐটি শেষ হলে অনেক বিষয় জানা যেত। আপনার রচনা ও বলবার ধরন বেশ সুন্দর—মনে একটা সুস্পষ্ট ছবি পড়ে।" তিনি

বলিতেন, "আমার লেখা তোমার ভাল লাগে?" আমি বলিলাম, "আপনার রচনায় বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হবে। অতি প্রাঞ্জল—অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষা আর ভাব।" তিনি হাসিয়া বলিতেন, "বটে! কি জান—আমরা সেকেলে লোক—সেকেলে ভাষা। এখনকার আধুনিক ভাষা ব্যাকরণের বালাই নেই। শুদ্ধাশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ নেই। আমাদের কাছে তা ভাল লাগে না। শুদ্ধ শব্দ হলে না ভাষা! দেখনা আজকাল ছেলেমেয়েদের গান ঃ 'প্রলয়-নাচন নাচলে যখন!' এই সব গান প্রলয়কে ডেকে আনছে। আমি যখন শুনি—তখন মনে হয় এইসব ছেলেমেয়ের কণ্ঠে এই প্রলয়ভাবের গান সত্যি সমাজে প্রলয়কে—বিপ্লবকে ডেকে আনবে। এ তো ভক্তির আবাহন নয়।"

পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ মহারাজের এই বাণী আজ সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। সমাজে সর্বত্র আজ প্রলয় উপস্থিত। গঠনের চেয়ে ভাঙাই আজ প্রবল। যুদ্ধ, মহামারী, ভূমিকম্প, সমাজ বিপ্লব জগৎকে তোলপাড় করিতেছে। তাই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জগতের দুর্দশার ভাবছবি দেখিয়াই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "প্রলয় তাণ্ডবকে আবাহন করা হচ্ছে—এতে ভক্তির আবাহন নাই।"

* * *

ধ্যানজপ তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল। একদিন বেলুড় মঠে তিনি সহজভাবেই বসিয়া আছেন, আমি তাঁর পাদবন্দনা করিয়া প্রণাম করিতেছি—তিনি যেন চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমি জপ করছি, এমন সময়ে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে নেই।" এই বলিয়া তিনি অনেকক্ষণ নীরবে সেইভাবে বসিয়া রহিলেন। বাহ্যভাবে কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না যে তিনি ধ্যানজপ করিতেছেন। খুব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান লোক বুঝিতে পারিত যে তিনি ধীর স্থির গম্ভীর প্রশান্তভাবে বসিয়া কোন ভাবরাজ্যে রহিয়াছেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন, "সাধুকে দেখলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হয়। সহসা পাদস্পর্শ করতে নেই। কেননা সাধু কোন্ সময়ে কোন্ ভাবে থাকেন তা বাইরে থেকে সব সময় বোঝা যায় না। mood (ভাব) দেখে প্রণাম করতে হয়। যখন আলাপ-আলোচনা বা বাইরে আনন্দ করছেন তখন পাদস্পর্শ করে সাধুকে প্রণাম করতে হয়। চুপ করে সাধু বসে আছেন দেখেই সাধারণ লোকের মতো আলাপ করতে নেই। যখন সাধু কুশলাদি প্রশ্ন করেন—তখন কথাবার্তা প্রণামাদি সব করতে পারা যায়।" পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ মহারাজের এই কথাগুলি আজও হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

(উদ্বোধন ঃ ৬০ বর্ষ ৯ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীগঙ্গাধর মহারাজের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) স্মৃতিকথা

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

১৯২৩ খ্রীঃ মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ। পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ বলরাম-মন্দিরে দ্বিতলের পূর্বদিকের ঘরে বসিয়া আছেন। আরও কয়েকজন সাধু ছিলেন—তাঁহাদের সহিতই তিনি সদালাপ করিতেছিলেন, এইরূপ পরিবেশেই সকাল ৭টায় মহারাজের প্রথম দর্শন পাই। আমার মন তখন চঞ্চল ছিল। অফিসে চাকরি করি, মাকে দেখিবার জন্য কাশীধাম যাওয়ার একান্ত ইচ্ছা—বাদ সাধিলেন অফিসের উপরওয়ালা সাহেব। তিনি কিছুতেই 'ছুটি' দিবেন না। এইজন্য ভাবিতেছিলাম যে, চাকরিতে ইস্তফা দিয়াই চলিয়া যাইব। গঙ্গাধর মহারাজ কি করিয়া যেন আমার মনের ভাব জানিতে পারিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন—"নাগপুরের একজন ভক্ত তাঁর উপরওয়ালার সহিত ক্ষণিক মতানৈক্য হতেই হঠাৎ চাকরি ত্যাগ করে তারপর তাঁকে অশেষ কষ্ট পেতে হয়। হঠাৎ চাকরি ত্যাগ করা উচিত নয়। একটু সহ্য করে থাকলে আর গোল হয় না। আমাদের ঠাকুরও সহ্য করতে আমাদের পুনঃ পুনঃ বলতেন, 'যে সয়, সে রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়।'" আমি তাঁহার মুখে এই সাবধান-বাণী শুনিয়া মনকে সংযত করিলাম। সাধুসঙ্গের ফল বৃথা যায় না। ঐদিনই আমি অফিসে গেলে সাহেব আমাকে নিজেই ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার মাকে এবার দেখতে যেতে পার, কাজ এখন কম আছে।" আমি তো অবাক!

তারপর প্রায়ই বলরাম-মন্দিরে গঙ্গাধর মহারাজকে দেখিতে যাইতাম। একদিন তিনি বলিলেন, "আমি কিছুদিনের জন্য পুঁটিয়ার জমিদার শচীনবাবুদের শ্যামবাজারের বাড়িতে থাকিব।"

আমি বলিলাম, "মহারাজ! ওখানে আর আমাদের যাওয়া সম্ভব নয়; একে তো জমিদার বাড়ি, দারোয়ান প্রভৃতি আছে—অন্দরমহলে আমাদের যাইতে দিবে কেন?" পূজনীয় মহারাজ বলিলেন, "আমার সঙ্গে শচীনের কথা হয়েছে, যে-সব ভক্ত আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, তাদের যদি তুমি উপরে যেতে বাধা না দাও, তবেই আমি তোমার বাড়িতে থাকতে পারি। শচীন তাতে রাজি হয়েছে।"

এইভাবে শচীনবাবুর বাড়িতেও মহারাজের দর্শন আমরা পাইয়াছি। এখানেই একদিন তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনের কাহিনী তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই। ভীষণ দুর্ভিক্ষ, লোক অনাহারে মরছে। আমি রাণাঘাট হতে বহরমপুর যাচ্ছিলাম, সারগাছির নিকট দেখলাম অনেক লোক ও শিশুসন্তান অনাহারে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। আমি তখন পায়ে হেঁটে চলি, পয়সা নেই যে ট্রেনে যাব। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটা বড় গাছের তলায় বসে আছি। কিছুক্ষণ পর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কতকগুলি লোক আমার সামনে এল এবং সাহায্য প্রার্থনা করলে। আমি তাদের বললাম—আমি সাধু ফকির লোক, ভিক্ষা করে খাই, আমি তোমাদের কি করে সাহায্য করব? তারা বিমুখ হয়ে চলে গেল। আমিও তাদের কঙ্কালসার চেহারা ভাবতে ভাবতে নিতান্ত দুঃখিত মনে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়লুম। এমনি সময়ে দেখি ঠাকুর এসে আমাকে বলছেন, 'গঙ্গাধর, তুই এখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সেবা কর।' তারপরই আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার তখন কেবলই মাথায় এই চিন্তা আসতে লাগলো—কি করে এই লোকদের বাঁচানো যায়। এরপরই আমি স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং আরও অনেকের নিকট গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ওখানে relief work (সেবাকাজ) শুরু করে দিলাম। মনে হয়, ইহাই এই মিশনের প্রথম relief work (সেবাকাজ)। ক্রমে সারগাছি অনাথ আশ্রম হলো, যে-সব ছেলেদের বাপ-মা এই করাল দুর্ভিক্ষে মারা গেছে, তাদেরই নিয়ে।"

আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আমি সারগাছি আশ্রমে সামান্য জমি নিয়েছি, টাকার অভাবে বেশি নিতে পারি নাই। একদিন রাত্রিতে স্বামীজীকে দেখলাম হাতে ত্রিশূল নিয়ে উত্তর দিকের জমিতে ত্রিশূল পুঁতে বললেন, 'গঙ্গাধর, এই পর্যন্ত জমি নিতে হবে।' বাস্তবিকই তাঁহার আশীর্বাদে ঐ পর্যন্ত জমিই পরে নেওয়া হয়েছিল।"

আর একদিনের কথা—আমার বন্ধু শ্রীমনোমোহন বাবুর স্ত্রী দীক্ষার উদ্দেশ্যে মঠে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর বই 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' পড়েছ কি?" মহিলাটি বলিলেন যে, এখনও তাঁহার পড়ার সুযোগ হয় নাই। মহারাজ তখন বলিলেন, "তা হলে তোমাকে আমি কি করে দীক্ষা দেই? তোমাকে এক সপ্তাহ সময় দিলুম, তুমি কোথাও যোগাড় করে 'লীলাপ্রসঙ্গ'পড়ে এস। ঠাকুর সম্বন্ধে তোমার কিছু জানা নেই, ঠাকুরের বিষয় জানা না থাকলে আমি দীক্ষা দেই না। তাঁর সম্বন্ধে আগে জানো, তবে তো তাঁর উপর ভক্তি-বিশ্বাস আসবে। তখন দীক্ষা নিলে কাজ হবে। তা না হলে কেবল দীক্ষা নিয়ে কি হবে?" আমরা জানি, পরে এই ভদ্রমহিলার দীক্ষা হয়েছিল। দীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে তিনি একটু কঠোরই ছিলেন।

আমাদের জনৈক বন্ধু কোন স্কুলের Asstt. Head Master (সহকারী প্রধান শিক্ষক)

ছিলেন। এক সময় বৈরাগ্যের প্রেরণায় সন্ন্যাস জীবনযাপনের উদ্দেশ্যেই তিনি সারগাছি আশ্রমে আসিয়াছিলেন এবং আশ্রমের ছেলেদের লেখাপড়ার ভার লইয়াছিলেন। তখন সেখানে ম্যালেরিয়ার বড় প্রকোপ, অচিরেই তিনি রোগাক্রান্ত হইলেন; ফলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সারগাছি আশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইল। পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের সহিত দেখা হইলেই তিনি আমাকে এই বন্ধুটির কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং অনুরোধ করিতেন তিনি যেন পুনরায় সারগাছি যান। একদিন বলিলেনও, "দেখ, তোমার বন্ধুকে তুমি বুঝিয়ে একখানা চিঠি দাও, যাতে সে পুনরায় সারগাছি আশ্রমে যোগদান করে এই অনাথ ছেলেদের ভার নেয়।" আমি মহারাজের অনুরোধে বন্ধুকে চিঠি দিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশই হইলাম। অনাথ ছেলেদের জন্য মহারাজের এই অহেতুক ভালবাসা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি।

সময় হারাইয়া স—বাবু এখন প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলেন, "কেন তখন মহারাজের কথায় সারগাছি আশ্রমে গেলাম না।"

আর একদিনের ঘটনা। এইদিন গঙ্গাধর মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর ভালবাসার কথা তুলিলেন। স্বামীজী বিলাত হইতে আসিয়া গঙ্গাধর মহারাজকে তাঁহার ব্যবহৃত একটি ভাল ঘড়ি দিয়াছিলেন, তিনি নিজ হাতে সেই ঘড়িতে দম দিতেন। একবার মঠে আসিলে স্বামীজী-প্রদত্ত সেই ঘড়িটি চুরি হইয়া যায়। ইহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর দেওয়া জিনিসটা এইভাবে গেল—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।" তিনি ঐদিন স্বামীজীর বিষয়ে একটি সত্য ঘটনা বলিয়াছিলেন ঃ "দেখ, অমূল্য, আমি এবং স্বামীজী তখন পরিব্রাজক-অবস্থায় পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়াই। একদিন উত্তর প্রদেশে দুই জনেই পায়ে হেঁটে চলেছি, কিছুক্ষণ পরেই একটা ছোট বন দেখা দিল, সেই বন ভিন্ন অন্য দিক দিয়েও যাবার রাস্তা ছিল। স্বামীজী আমাকে বললেন, 'গঙ্গা, তুই বনের বাইরের রাস্তায় যা, আমি বনের ভিতর দিয়ে যাই। দেখি কে আগে যেতে পারে।' আমি স্বামীজীর কথা শিরোধার্য করে বাইরের রাস্তায় রওনা হলুম। স্বামীজী বনের ভিতর দিয়ে চললেন। আমি যখন বনের অপর প্রান্তে উপস্থিত হই, স্বামীজী তখনও আসিয়া পৌছাননি। মনে ভয় ও ভাবনা এল—স্বামীজীকে একা একা আসতে দেওয়া আমার সঙ্গত হয়নি। অগত্যা বনের পথে বিপরীত দিক ধরে অগ্রসর হলুম, যদি স্বামীজীর দেখা পাই। কিছু দূর যেতে না যেতেই দূরে স্পষ্ট দেখতে পেলুম স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের গলা ধরে আস্তে আস্তে আসছেন। এই দৃশ্য দেখে আর না এগিয়ে আমি পিছন ফিরলাম। স্বামীজীও একটু পরেই এসে পড়লেন। তিনি বললেন, 'গঙ্গা, এই যে তুই আমার আগেই এসে পড়েছিস!' আমি তাঁকে বললাম, 'ভাই, আমি তো কারো গলা ধরে আস্তে আস্তে আসছিলাম না!' এই কথা বলতেই স্বামীজী হেসে বললেন, 'তুই বুঝি দেখেছিস!' আমি স্বামীজীর সঙ্গ করতে

ভালবাসতাম। স্বামীজী তখন পরিব্রাজকবেশে দেশে দেশে ঘুরছেন, শেষ পর্যন্ত আমাকে ত্যাগ করে একাকী বেড়াতে আরম্ভ করলেন।"

গঙ্গাধর মহারাজ পুনরায় বলিলেন, "স্বামীজীর প্রেরণাতেই সেবা শুরু করলাম। তিনি সকল সময়েই উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দিতেন, যাতে ঠিক ঠিক সেবাধর্ম করে আমরা ধন্য হই।"

আর একদিনের ঘটনা তিনি বলিলেন, "অমূল্য, তোমরা তো আমি থাকতে সারগাছি গেলে না, এবার জ্যৈষ্ঠ মাসে চল। ওখানে খুব ভাল ভাল আম হয়—বড় চমৎকার আম; আমি নিজ হাতে তোমাদের কেটে খাওয়াব।" সামান্য দুটি কথা। ইহার মধ্যে যে ভালবাসার স্পর্শ রহিয়াছে, তাহা অভাবনীয়। জীবনে যাহারাই তাঁহার দেবোপম সঙ্গ লাভ করিয়াছে, তাহারাই ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কি ইচ্ছা জানি না, ভাগ্যে আর তাঁহার শ্রীচরণদর্শন ও আম খাওয়া হইল না। তিনি ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ খ্রীঃ মহাপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহার কথা রক্ষা করিতে সারগাছি আশ্রমে পরে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তিনি তো আর তখন স্থূল শরীরে ছিলেন না। তাঁহার অহেতুক ভালবাসার কথা যখনই মনে হয়, তখনই অভিভূত হইয়া পড়ি।

[শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণের স্মৃতিকথা—রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম (বারাসাত)]

স্বামী অখণ্ডানন্দ সমীপে চার দিন

শ্রীমতী শান্তি সেন

(১)

১৯৩৪ খ্রীঃ গ্রীষ্মকালে কিছুদিন নিবেদিতা বোর্ডিং-এ ছিলাম। তখন প্রায়ই বিকেলে আমরা দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যেতাম। একদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে দর্শন ও প্রণাম করে বারান্দায় এসে দেখি একজন সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন—গেরুয়া-পরা, মাথায় একটি নামাবলী জড়ানো, সাদা চুলগুলি কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, ভাবলাম কে ইনি? —মঠের সাধুরা তো মুণ্ডিতমস্তক। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন মহিলা ছিলেন, তাঁদেরও চেহারায় বৈশিষ্ট্য ছিল। সেখান থেকে এসে আমরা বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে দর্শন ও প্রণাম শেষ করে ঠাকুরের ঘরে গেলাম। ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সন্ন্যাসী বিষ্ণুমন্দিরের সিঁড়িতে বসে আছেন; পা-দুখানি নিচের থাকে রাখা। নিবেদিতা স্কুলের অধ্যক্ষা বললেন, ইনিই ঠাকুরের শিষ্য পরমপূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ, মঠের বর্তমান প্রেসিডেন্ট। স্বামীজী-প্রবর্তিত সেবাব্রতের কাজে জীবন সমর্পণ করেছেন, ভারতের বহু স্থানে ঘুরেছেন। তখন আমরা সকলে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, "এই দেখ, এরা সব মঠে এসেছে। —পণ্ডিত জওহরলালের মা, স্ত্রী ও তাদের আত্মীয়া ক-জন মহিলা। এদের দক্ষিণেশ্বর দর্শন করাতে নিয়ে এসেছি।" এইরূপ কয়েকটি কথার পর আমরা তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। পূজনীয় মহারাজকে এই আমার প্রথম দর্শন।

(২)

প্রায় দু'বছর পরে ১৯৩৬ খ্রীঃ ফাল্গুন মাসে একদিন সকালবেলা আমি বেলুড় মঠে যাই। ওখানে গিয়ে জানতে পারি, মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজ তখন মঠেই আছেন। আমি তাঁকে দর্শন করব বলাতে পূজনীয় ভরত মহারাজ ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্বামীজীর ঘরের পাশের ঘরে ঢুকেই তাঁকে দেখতে পেলাম, একটি চেয়ারে বসে আছেন। আমি প্রণাম করতেই তিনি বসতে বললেন। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কী চাই। সে সময় খুব মানসিক সংগ্রামের মধ্যে আমার দিন কাটছিল, যার ফলে আমার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কি করব ঠিক করতে পারছিলাম না। তাঁকে আমার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা সব খুলে বলি। শুনে তিনি বললেন, "দীক্ষা নেবে?" আমি বলেছিলাম, "আমি তো দীক্ষা নেবো

বলে তৈরি হয়ে আসিনি। আপনাকে পছন্দ হয় কিনা, তাই দেখতে এসেছি।"—এই কথা শুনে তিনি খুব হেসে উঠলেন। এত জোরে হেসেছিলেন যে বারান্দা থেকে ভরত মহারাজ ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। পূজনীয় মহারাজ তখন আমাকে দেখিয়ে তাঁকে বললেন, "এ কি বলছে শোন, এ নাকি দেখতে এসেছে আমাকে ওর পছন্দ হয় কিনা।" বলেন আর খুব হাসেন। পরে আমাকে সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি আমাকে তোমার পছন্দ হয়?" আমি বললাম, "হয়।" তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?" আমি বলেছিলাম, "বাবার মতো"। শুনে উনি আমার মাথাটি ওঁর হাঁটুর ওপর রেখে চাপড়ে দিলেন। তখন ওঁকে প্রণাম করে সুবিধামত আর একদিন আসব বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। উনি বলেছিলেন, "আচ্ছা"।

বাইরে এলে ভরত মহারাজ বললেন, "প্রসাদ নিয়ে যেও।" আমি তখন মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের সামনে ছোট বারান্দাটিতে গিয়ে বসে রইলাম। একজন ব্রহ্মচারী এসে ফলমিষ্টি প্রসাদ দিয়ে গেলেন। প্রসাদ পাওয়ার পরে ভরত মহারাজ এসে আমাকে বললেন, "মহারাজ ডাকছেন, এখনই তোমাকে দীক্ষা দেবেন। উনি পুজো করতে বসেছিলেন, পুজো করতে করতে তাঁর মনে হয়েছে, এখনই তোমাকে দীক্ষা দেবেন। তাড়াতাড়ি যাও, উনি পুজোর আসনে বসে আছেন।" আমি বলেছিলাম, "আমি যে খেয়ে এসেছি।" "তাতে কিছু হবে না।" তখন আমি বললাম, "আমি তো স্নান করিনি।" "তাতেও কিছু হবে না।" শেষে বলেছিলাম, "আমি যে আজ দীক্ষা নেব বলে ঠিক করে আসিনি।" এবারে ভরত মহারাজ একটু ধমক দিয়ে বললেন, "তোমার বহু ভাগ্য যে পূজার আসন থেকে উনি নিজে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন দীক্ষার জন্য। আর দেরি করো না, শিগগির যাও।"

আমি তখন ধীরে ধীরে পূজনীয় মহারাজের ঘরে গিয়ে দেখি, উনি পুজো শেষ করে আসনে বসে আছেন। পুষ্পপাত্রে কিছু ফুল-বেলপাতা রয়েছে। পাশে একখানি আসন পাতা। সেখানে আমাকে বসতে বললেন। কোশাকুশি থেকে গঙ্গাজল নিয়ে আমার মাথায় গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর দীক্ষা দিলেন। শেষে দুই হাত অঞ্জলি করে আমার সামনে রেখে বললেন, "পুষ্পপাত্র থেকে ফুল তুলে নিয়ে তিন বার অঞ্জলি দাও আমার হাতে।" আমি দিলাম। তখন আমাকে দেখিয়ে দিলেন, কি করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। ছোট ছেলের মতো পা ছড়িয়ে বসে, হাত জোড় করে বলতে লাগলেন, "ঠাকুর আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, আমার সাধন নেই, ভজন নেই, আমায় তুমি দেখা দাও, আমার শুদ্ধা ভক্তি দাও।" এই কথাগুলি এত করুণভাবে বললেন যে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। শুনে আমারও কান্না পেয়ে গেল। আরও বললেন যে ঠাকুর ওঁকে এইভাবেই প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন। তারপর আমি প্রণাম করে বাইরে গেলাম এবং প্রসাদ পাওয়ার ঘণ্টা পড়লে সকলের সঙ্গে প্রসাদ পেতে গেলাম। ঠাকুরের এবং মহারাজের প্রসাদ আমাকে দেওয়া হলো।

খাওয়ার পরে আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি ঘরের একপাশে একখানি ছোট তক্তপোশে বিছানার ওপরে একটি বাঘছাল বিছানো রয়েছে, তার ওপরে উনি বসে আছেন। আর নিচে সারা ঘরটি ঢেকে একটি কার্পেট পাতা আছে। ওঁর পায়ের কাছে কার্পেটের ওপরে আমাকে বসতে বললেন। আমি বসলে আমার ডান হাতখানি নিয়ে একটু ওজন করে দেখলেন। তারপরে বললেন, "হবে। অমুকের মতো।" কার মতো বলেছিলেন, সে-কথা আমি ভুলে গিয়েছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি ভগবান দর্শন করেছেন কিনা। তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, যখন হিমালয়ে ছিলাম—প্রত্যক্ষ দর্শন হয়েছিল।"

তারপরে কিছুক্ষণ ধরে ঠাকুরের কথা বলতে লাগলেন। ঠাকুর ওঁদের কত ভালবাসতেন, সেইসব কথা বললেন ঃ

"ঠাকুরের কাছে যে আমরা যেতুম, সে কি অমনি যেতুম? তাঁর ভালবাসার টানে যেতুম। তাঁর ভালবাসার কাছে মা-বাপের ভালবাসা আলুনি বোধ হতো। একদিন সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তিনি তাঁর ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় মাদুরের ওপরে শুয়ে আছেন। আমি প্রণাম করলে পাশে বসতে বললেন। তারপর উঠে বসে আমার জিভে আঙুল দিয়ে মন্ত্র লিখে দিলেন। আর বললেন, 'এই তোর দীক্ষা হয়ে গেল।' তারপর বললেন, 'পা-টা একটু টিপে দে তো।' আমি যেই টিপতে আরম্ভ করেছি, ঠাকুর অমনি বলে উঠলেন, 'ওরে থাম্, থাম্, অত জোরে নয়।' এই বলে আমার হাত নিয়ে দেখিয়ে দিলেন, কেমন করে টিপতে হবে। আমার তখন অল্প বয়স, ব্যায়াম করি। কোন ধারণাই ছিল না যে ঠাকুরের পা কত নরম। তাঁর পা ঠিক মাখনের মতো নরম ছিল। আর একদিন রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। সকালবেলা গঙ্গাস্নান করে ঠাকুরের কাছে গিয়েছি। একজন ভিখিরী এসেছিল, ঠাকুর বললেন, 'ঐ কোণের তাকে চারটে পয়সা আছে, দিয়ে আয় ভিখিরীকে।' আমি দিয়ে এলে বললেন, 'গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে ফ্যাল্।' আমার হাত ধোয়া হলে 'হরি বোল, হরি বোল' বলে হাত ঝাড়াতে লাগলেন, অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুর নিজেও হাত ঝাড়লেন, আমাকে দিয়েও হাত ঝাড়ালেন।"

মহারাজ আমাকে বলেছিলেন যে, সেই থেকে টাকাকড়ির ওপর ওঁর এমন একটা বিতৃষ্ণা হয়ে গেল যে বহুকাল পর্যন্ত উনি টাকাকড়ি স্পর্শই করতে পারতেন না। পরে অনাথ-আশ্রমের প্রয়োজনে যতটা সম্ভব কম স্পর্শ করতেন।

দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে রাত্রি কাটাতেন। একদিন ঐরূপ রাত্রে ওখানে থাকার পর সকালবেলা গঙ্গাস্নান করে ঠাকুরের ঘরে এসেছেন; ঠাকুর ওঁকে নিয়ে মা কালীর মন্দিরে গেলেন। একেবারে চৌকাঠ পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে মায়ের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইতিপূর্বে মন্দিরের চৌকাঠের বাইরে থেকেই তিনি মাকে এবং শিবকে দর্শন

করতেন। সেদিন ঠাকুর ওঁকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "দ্যাখ্, চৈতন্যময় শিব দ্যাখ্।" উনি সত্যই চৈতন্যময় শিব দর্শন করলেন। সেদিন আমাকে বলেছিলেন, "দেখলাম জীবন্ত শিব, নিঃশ্বাস পড়ছে। দেখে আমি আনন্দে ডুবে গেলাম, আর ঠাকুর যখন বেরিয়ে এলেন, মনে হলো নেশা করেছেন। পা টলছে, হেথায় ফেলতে হোথায় পড়ছে।" এইসব কথার পরে আমাকে বললেন, "শনি-মঙ্গলবারে বেশি করে জপ করো। ঠাকুর বলতেন, শনিবার মধুবার।" একটু পরে তিনি বাঘছালটির ওপরে একটু শুলেন এবং আমাকেও কার্পেটের ওপরে একটু বিশ্রাম করে নিতে বললেন। বিকেল হয়ে গেল। ভরত মহারাজ এসে জানালেন, ভক্তেরা দর্শন করতে এসেছেন। মহারাজ তাদের ভেতরে আনতে বললেন। সকলে প্রণাম করে একে একে বাইরে যেতে লাগলেন। আমিও প্রণাম করে চলে গেলাম। মহারাজ বলে দিলেন, "আবার এসো।"

(৩)

কয়েকদিন পরে আমার দিদি ও ভগ্নীপতিকে নিয়ে সকালবেলা মঠে গেলাম। মহারাজকে দর্শন করে বললাম, "এঁরাও দীক্ষা নিতে চান।" মহারাজ হেসে বললেন, "আচ্ছা।" দিদিরা তৈরি হয়েই এসেছিলেন। ওঁদের দীক্ষা হয়ে গেল। সেদিন খুব ভিড় ছিল, তাই বেশি কথা হলো না। প্রসাদ পাওয়ার পর আমরা বাড়ি চলে এলাম। দিন দুই পরে একদিন বিকেলে, আবার আমি আমার দাদাকে সঙ্গে নিয়ে মঠে যাই। দাদা মহারাজকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন।

আমরা গেলেই ভরত মহারাজ আমাদের মহারাজের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। মহারাজ আমাদের বসতে বললেন, আর খুব খুশি হয়ে বলতে লাগলেন, "আনন্দ, আনন্দ, দুঃখ কিসের? মন খারাপ কিসের? ঠাকুর আছেন। সব ভার তিনি নিয়েছেন।" তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গুড়গুড়িটি কোথায়? তাকে আনোনি?" আমি বললাম, "দিদি আর একদিন আসবে, আজ কাজের জন্য আসতে পারেনি।" আমার দিদি দেখতে ছোটখাট ছিপছিপে ছিলেন, তাই মহারাজ ওই কথা বলেছিলেন। সেদিনও ঠাকুরের কথা হলো।

(৪)

দুদিন পরে বিকেলের একটু আগে, দিদিদের নিয়ে আবার মঠে যাই, মহারাজ আমাদের নাম শুনে ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠালেন। সেদিন খুবই ভিড় ছিল। উনি চলে যাবেন বলে অনবরত ভক্তেরা সব আসছিলেন। তখন ওঁর শরীর অসুস্থ, তা-সত্ত্বেও তিনি বিশ্রাম না করে অনবরত লোকের সঙ্গে দেখা করছিলেন। একজন ভক্ত মহিলা ও ভদ্রলোক এসে ওঁকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য খুব ধরেছেন। তাঁদের বাড়ি ভবানীপুরে, তাঁরা ঠাকুরের ভক্ত। এই ভদ্রলোকের বাবা ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। মহারাজ যতই বলছেন, ওঁর দেহ সুস্থ নেই, উনি

যেতে পারবেন না, ভদ্রলোক কিছুতেই সেকথা মেনে নিচ্ছেন না। তখন মহারাজ করুণসুরে মহিলাটিকে বলছেন, "তোমরা হলে মা, কোথায় বলবে, মহারাজ আপনার শরীর খারাপ, এখন নড়াচড়া করে কাজ নেই, বিশ্রাম করুন, তা নয়—তোমরাই জোর করছ, এই অসুস্থ দেহ নিয়ে ভবানীপুরে যেতে বলছ।' 'এই কথা শুনে মহিলাটি আর কিছু বলতে পারলেন না। তাদের নিরস্ত হতে হলো। আমরা কিছুক্ষণ ঘরে থেকে, মহারাজের কথা শুনে সন্ধ্যা হলে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। উনি বার বার করে বলে দিলেন, "সারগাছি আশ্রমে বেড়াতে যেও, আর নিয়ম-মত চিঠি দিও।" আমার সঙ্গে এই ওঁর শেষ কথা বলা।

সারগাছিতে আমি চিঠি দিতাম, মহারাজও আমাকে চিঠি দিতেন। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তখন আর আমার সারগাছি যাওয়া হয়ে ওঠেনি, অনেক পরে গিয়েছি। শায়িত অবস্থায় মহারাজকে বেলুড় মঠে আনা হয়, সেখানেই তাকে শেষ দর্শন করি। আজ তিনি দেহে নেই, কিন্তু তাঁর সীমাহীন কৃপা ও স্নেহই জীবনের পাথেয় হয়ে রয়েছে।

(উদ্বোধন ঃ ৬২ বর্ষ ৮ সংখ্যা)

মহাসমাধি

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম মন্ত্রশিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ গত ২৫ মাঘ* রবিবার অপরাহ্ণ ৩টা ৭মিনিটের সময় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরমধামে চলিয়া গিয়াছেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম ও কঠোরতায় তাঁহার শরীর বহুকাল পূর্ব হইতেই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি গত কয়েক বৎসর যাবৎ বহুমূত্র ও ব্লাডপ্রেসার রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। ইদানীং কিছুকাল হইতে তাঁহার অসুস্থতা খুবই বাড়িয়াছিল।

গত শুক্রবার ২৩শে মাঘ, হঠাৎ তাঁহার প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, প্রায় ১৪ ঘণ্টা প্রস্রাব বন্ধ থাকে। ইহাতে তিনি অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ তারযোগে বেলুড় মঠে জানানো হয়। ইতিমধ্যে রাত্রেই বহরমপুরের বিখ্যাত ডাক্তারগণ আসিয়া পড়েন। তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবার জন্য বেলুড় মঠ হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসী অবিলম্বে সারগাছি রওনা হন। সেখানে গিয়া তাঁহারা তাঁহাকে কতকটা সুস্থ দেখিতে পান। পরদিন তিনি পুনরায় অসুস্থ বোধ করেন। বহরমপুরের ডাক্তার পাঠক ও ডাক্তার বাগচি তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন। তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতা স্থানান্তরিত করা উচিত বিবেচনা করিয়া তাঁহারা সকলে স্বামীজীকে লইয়া ট্রেনযোগে কলিকাতা যাত্রা করেন। রাণাঘাট স্টেশনের নিকট আসিতেই তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। রাত্রি ১০টা ৩ মিনিটে ট্রেন কলিকাতা পৌছে। তখন তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা ছিল না।

পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী স্টেশনে এম্বুলেন্স উপস্থিত ছিল। ডাক্তার অজিতনাথ রায় চৌধুরী, ডাক্তার জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ, স্বামী ওঁকারানন্দ, স্বামী বিজয়ানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ এবং আরও অনেক সন্ন্যাসী ও ভক্ত স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। চিকিৎসার সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহাকে লইয়া সকলে বাগবাজার ১, মুখার্জি লেনস্থ শ্রীশ্রীমার বাড়িতে উপস্থিত হন।

সেখানে উপস্থিত হইলে ডাক্তারগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া অবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনক বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তখন মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী ও চিকিৎসকগণের মিলিত পরামর্শ অনুসারে তাঁহাকে এম্বুলেন্স করিয়াই প্রায় ১টার সময় বেলুড় মঠে লইয়া যাওয়া হয়। চিকিৎসকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে। ডাক্তার জ্যোতিষবাবু মঠেতেই রাত্রি অতিবাহিত করেন।

---

* ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭

বহুমূত্রজনিত মূর্ছা অতিশয় গুরুতর ব্যাধি, তদুপরি শেষ উপসর্গ নিউমোনিয়া দেখা দেয়, কাজেই জীবনের ক্ষীণ আশাও লোপ পায়। রবিবার ৯টার পর হইতে তাঁহার শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং অপরাহ্ণ ৩টা ৭মিঃ তাঁহার অন্তিম-শ্বাস বহির্গত হয়। সন্ন্যাসিপ্রবর মহাসমাধি মগ্ন হইলেন। মঠের সন্ন্যাসিগণ তাঁহার ঘরে সমবেত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম কীর্তন করিতে থাকেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া যায়। তাঁহার দর্শন মানসে দলে দলে ভক্ত নরনারী বেলুড়মঠে গিয়া সমবেত হইতে থাকেন।

সংবাদ পাইয়া পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ গুরুভ্রাতাকে অন্তিম দর্শনের জন্য বেলুড় মঠে গমন করেন এবং অখণ্ডানন্দ মহারাজের শয্যাপার্শ্বে বহুক্ষণ অবস্থান করেন। তিনি স্বহস্তে গুরুভ্রাতাকে পুষ্পে ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া দিলেন এবং শ্মশানের পার্শ্বেও কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া প্রিয় ভ্রাতার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। সন্ন্যাসিগণ বিভূতি, চন্দন, মাল্য প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার দেহ ভূষিত করিলেন।

তাঁহার মুখমণ্ডলে রোগবেদনার চিহ্নমাত্র ছিল না। কি এক প্রশান্ত আনন্দময় সে মূর্তি! না দেখিলে অনুভব করা কঠিন। মায়ের স্নেহের বালক মাতৃক্রোড়ে স্থান পাইলেন, শ্রীগুরুর আশ্রিত সন্তান গুরুদেবের আদিষ্ট কর্মের জন্য নিজের মন প্রাণ দেহ ক্ষয় করিয়া গুরুপাদপদ্মে বিলীন হইলেন, অরূপ সাগরের যুগলীলারূপ তরঙ্গরাজির একটি শেষ তরঙ্গ আবার অরূপ সাগরে চিরতরে মিশিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সমাধিস্থানের পার্শ্বে চন্দনকাষ্ঠের প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে তাঁহার তপস্যাপূত দেহ আহুতি প্রদান করা হয়। রাত্রি প্রায় ১১$\frac{১}{২}$ টার সময় পবিত্র দেহ ভস্মে পরিণত হয়, সন্ন্যাসিমণ্ডলি "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" মন্ত্রে সর্বতাপ শীতলকারী পবিত্র জাহ্নবী বারি দ্বারা চিতা নির্বাপিত করেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(উদ্বোধন ঃ ৩৯ বর্ষ ২ সংখ্যা)